ভারতে ভূবিদ্যার ক্রমবিকাশ

দীপংকর লাহিড়ী

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

ভারতে ভূবিদ্যার ক্রমবিকাশ

দীপংকর লাহিড়ী

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

BHARATE BHUBIDYAR KRAMABIKASH
[Evolution of Geology in India]
Dipankar Lahiri,

প্রকাশকাল :
প্রথম মুদ্রণ : জানুআরি ১৯৮৯

প্রকাশক :
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)
আর্য ম্যানসন (নবম তল)
৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার
কলিকাতা ৭০০ ০১৩

মুদ্রাকর :
রূপলেখা
২২, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট,
কলিকাতা ৭০০ ০০৯

মূল্য : এগারো টাকা

Published by Shri Sibnath Chatterjee, Chief Executive Officer, West Bengal State Book Board, under the Centrally Sponsored Scheme of Production of books and literature in regional language at the University level, launched by the Government of India, Ministry of Human Resource Development (Department of Education), New Delhi.

ভারতীয় ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের অন্যতম পথিকৃত অধ্যাপক দামোদর ধর্মানন্দ কোশাম্বী (1907-1966) এবং ভারতে আধুনিক ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার অন্যতম পথিকৃৎ আচার্য প্রমথনাথ বসুর (1855-1934) স্মৃতির উদ্দেশে—

সূচীপত্র

চিত্রসূচী

ভূমিকা

প্রাচীন ভারতে রসায়ন-, চিকিৎসা- ও গণিতবিদ্যার বিকাশ ও অনুশীলন সম্বন্ধে গবেষণা হয়েছে অনেক, কিন্তু বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা সম্বন্ধে তেমন নয়। অথচ প্রাচীন বিদেশী বিবরণে বর্ণনা আছে দক্ষিণভারত থেকে সোনা রপ্তানীর, হীরা ও নানা মণিমাণিক্যের, দামাস্কাস তরোয়াল নামে পরিচিত সুতীক্ষ্ণ তরোয়ালের উপযুক্ত ইস্পাত উৎপাদনের, আয়ুর্বেদীয় বহু ভেষজ তৈরিতে মণিকের ব্যবহারের, সেচের জন্য বিশেষ ধরনের পয়ঃপ্রণালী (aquiduct)-এর। যে সময়ে ইওরোপে অ্যারিস্টট্‌ল ভূ-কম্পনের কারণ নির্দেশ করছেন সে সময়ে ভারতে ভূ-কম্পনবিদ বা seismologist হিসাবে বেশ ক-জনের নাম পাওয়া যায়। সাধারণভাবে প্রাচীনভারতে সোনা, হীরা ও অন্যান্য রত্নের ব্যবহার সম্বন্ধে বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি প্রবন্ধ রচিত হলেও ভূবিদ্যার ক্রমবিকাশ ও তার নিয়মিত অনুশীলন সম্বন্ধে সামগ্রিকভাবে কোনো আলোচনার চেষ্টা এদেশ বা বিদেশ কোথাও হয়নি। অথচ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই শাখাটি যে প্রাচীন-ভারতে যথেষ্ট উন্নতিলাভ করেছিল তার ভুরি ভুরি প্রমাণ আছে রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ ইত্যাদির বিবরণে, মনুসংহিতা নারদসংহিতা বিষ্ণুপুরাণ ব্রহ্মপুরাণ ইত্যাদির টীকা ও উপদেশে, অথর্ববেদ, অর্থশাস্ত্র নিরুক্ত বৃহৎসংহিতা ইত্যাদি কোষগ্রন্থে, মেগাস্থিনিস, টলেমি, স্ট্রাবো, ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাঙ, ইবন রতুতা, ইত্যাদির বর্ণনায়।

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে গেলে আরো প্রাচীনযুগের দিকে তাকাতে হয়, সিন্ধুসভ্যতার ধ্বংসাবশেষ যে-অতীতে আমাদের দৃষ্টিনিক্ষেপের প্রথম জানালা। মোহেঞ্জোদারো হরপ্পার উন্নতির পরিচয় যতটা তার নগর-পরিকল্পনায় প্রকাশিত, তার চেয়ে অনেক বেশি স্পষ্ট অসংখ্য ছোট ছোট পাথরের খেলনার অস্তিত্বে। কোনো সভ্যতা উন্নতির কোন পর্যায়ে পৌছলে সমাজে শিশুদের চাহিদার দিকে নজর যায় তা ঐতিহাসিক যুগে বিভিন্ন সভ্যতার ইতিহাসে বারবার চোখে পড়ে। সুতরাং সিন্ধু অববাহিকার ধ্বংসাবশেষে চাকা-

লাগানো দড়িটানা খেলনার প্রাচুর্য আগ্রহী করে খুঁজে দেখতে ইওরোপে প্রথম এরকম খেলনার আবির্ভাবকাল।

সিন্ধুসভ্যতার লিপির পাঠোদ্ধার গবেষকদের অনুসন্ধানের বিষয়। তারা যদি কোনো গ্রন্থ রচনা করে গিয়েও থাকে উষ্ণমণ্ডলের আর্দ্র আবহাওয়ায় সে গ্রন্থের কোনো চিহ্ন পড়ে থাকার আশা বাতুলতা মাত্র। থাকতে পারে শুধু কোনো কোনো সংস্কার পরবর্তীকালে আর্যদের সমাজে ঢুকে পড়ে সামাজিক সংস্কাররূপে। তেমনি প্রাচীনতম পৌরাণিক গ্রন্থে সুপ্রাচীন কিংবা পুরাণবর্ণিত বলে বিবৃত কিছু কিছু ঘটনাও হয়তো প্রাগআর্যযুগের ঘটনা।

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র, বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতা, যাস্কর নিরুক্ত ও পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী মূলত সঙ্কলনগ্রন্থ। এগুলির প্রকৃত মূল্যায়ণ করতে গেলে মানুষের চিন্তাধারার দিকে লক্ষ্য করতে হয়। 57 কোটি বছর আগে প্রথম অঙ্গপ্রতঙ্গওয়ালা প্রাণী ট্রাইলোবাইটের আবির্ভাব। তার তুলনায় মাত্র 15 লক্ষ বছর আগে প্রথম প্রকৃত মানুষের আবির্ভাব। গত দশহাজার বছরে সভ্যতার শুরু থেকে বহির্বিশ্বে তার হাতবাড়ানোর প্রয়াস তুলনা করলে বোঝা যায় যে জৈব বিবর্তন বা মননের বিবর্তন, কোনোটাই সরলরৈখিক পথে এগোয়নি। বরং এগিয়েছে লগারিদ্‌মিক (Logarithmic) পথে। তাই উনবিংশ শতাব্দীতে কোনো যন্ত্র বা প্রযুক্তি মোটামুটি ব্যবহারযোগ্য ও সুলভ করতে যতটা সময় লেগেছে, অনুরূপ যন্ত্র ও প্রযুক্তির বেলায় বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে লেগেছে তার অর্ধেকেরও কম সময়, দ্বিতীয়ার্ধে তারও আবার সামান্য ভগ্নাংশ। ফটোগ্রাফিক ক্যামেরা, সাদাকালো ফটোগ্রাফ, রঙীন ফটোগ্রাফ, হলোগ্রাম ইত্যাদির উদ্ভব ও প্রচলন লক্ষ্য করলে প্রযুক্তির এই লগারিদ্‌মিক অগ্রগতি স্পষ্ট বোঝা যায়। একথা মনে রাখলে অর্থশাস্ত্র ও উল্লিখিত বইগুলোয় যেসব তথ্য আছে তা কত শতকের গবেষণা ও অনুশীলনের ফলাফল তা অনুমান করতে অসুবিধা হয়না।

সিন্ধু সভ্যতার প্রকৃত বয়স নিরূপণ করা যায় C^{14} তেজস্ক্রিয়মিতিক (radiometric) পদ্ধতি প্রয়োগ করে। কিন্তু এদেশে পৌরাণিক ধ্বংসাবশেষ প্রায় নেই। তাই পৌরাণিক ঘটনাগুলির বয়স এভাবে নিরূপণ করা যায়না। তাই বলে সব পৌরাণিক ঘটনাকেই প্রাগবৌদ্ধ একটা আনুমানিক কালের বলে ধরে নেওয়াও ঠিক নয়। পৌরাণিক ঘটনার প্রাচীনত্ব নিরূপণের একটা পদ্ধতি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কৃষ্ণচরিত্র-এ প্রয়োগ করেছিলেন। বর্তমান শতাব্দীতে গিরীন্দ্রশেখর বসু সেই পদ্ধতিতে পৌরাণিক পর্যায়কালের কয়েকটি সারণী তৈরি করেছেন যা পরিশিষ্ট—

ক-তে সন্নিবেশিত হলো। বসুর পদ্ধতি প্রয়োগ করলে বহু পৌরাণিক ঘটনার বয়স খ্রীস্টজন্মের চেয়ে বেশ কয়েক সহস্র বছর পিছিয়ে যায়।

C^{14} পদ্ধতিতে মোহেঞ্জোদারো হরপ্পার প্রাচীনতম কাল পাওয়া গেছে 2500 B. C. বলে। তাই আর্যদের ভারতে প্রবেশের কাল সাধারণত ধরা হয় ঐ সময়ে*। ফলে প্রাচীনতম বৈদিক রচনা ঋগ্বেদের বয়স ধরা হয় 2000 খ্রীষ্টপূর্ব। এই অনুমান যুক্তিযুক্ত বলে মানতে গেলে ধরে নিতে হয় যে উপমহাদেশের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে আর্যরা ঢুকেই সুলতান মামুদের মতো উর্দ্ধশ্বাসে ছুটেছিল মোহেঞ্জোদারো লুঠ করতে, তারপর লুঠপাট করে ধীরে ধীরে ঋগ্বেদ রচনায় মন দিল। সেই সুপ্রাচীন অতীতে যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবের কথা মাথায় রাখলে আর্যদের ভারতে অনুপ্রবেশ ও পূর্ব-দক্ষিণপূর্বে ছড়িয়ে পড়া প্রকৃতির প্রতিকূলতায় জৈবিক বিস্তার (organic dispersal) বলে মনে হয়। সেক্ষেত্রে আর্যদের উপমহাদেশে ঢোকা ও মোহেঞ্জোদারোর পতন, দুটির মধ্যে কালের ব্যবধান কয়েক শতক তো বটেই, এমনকি সহস্রকেরও হতে পারে।

দ্বিতীয়ত, ঋগ্বেদ (হয়তো আরো অনেক পৌরাণিক গ্রন্থের বিবরণ) সবটাই এদেশের মাটিতে রচিত, উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে তাও ঠিক যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। সবচেয়ে বড়কথা, এযুগের মতো সেযুগে ভারতীয় উপমহাদেশকে চিহ্নিত করার মতো কী সীমারেখা থাকতে পারে, আর তেমন একটা সীমারেখা প্রতিষ্ঠায় কারই বা আগ্রহ থাকতে পারে! বরং ভাবা স্বাভাবিক হবে যে সেযুগে যে কোনো অঞ্চলের পরিচয় দেওয়া হতো সেখানকার গাছপালা, জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি ইত্যাদি দিয়ে। স্বভাবতই সেগুলি এ যুগের থেকে আলাদা। শেষ তুষার যুগ শেষ হয়ে উষ্ণযুগ আসছে ধীরে ধীরে। তার ফলে আবহাওয়া বদলাচ্ছে, গাছপালার পরিবর্তন ঘটছে। আদি আর্য উপনিবেশ ও প্রাগ-আর্য উপনিবেশগুলির পত্তন এই পুরাভৌগলিক পটভূমিতে। তাই পুরাণবর্ণিত ঘটনাগুলির সঠিক মূল্যায়ণের জন্য চাই সেযুগের পুরাভৌগোলিক পটভূমির বিশ্লেষণ। এজন্য নির্ভর করতে হয় ভূতাত্ত্বিক নিদর্শনের উপর।

সাধারণত আমরা মহাভারতে বেশ কিছু শ্লোক ও অধ্যায় যে প্রক্ষিপ্ত সেকথা বিশেষজ্ঞদের মুখে শুনে থাকি। প্রায় সব পৌরাণিক গ্রন্থের একাংশ প্রক্ষিপ্ত,

* প্রচলিত ধারণা যে আর্য অনুপ্রবেশকারীরাই সিন্ধুসভ্যতা ধ্বংসের অন্যতম প্রধান কারণ। এই ধারনা সম্বন্ধে আলোচনার সুযোগ নেই বর্তমান নিবন্ধে। তাই এই প্রচলিত ধারণার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই এগোন গেল।

আবার প্রক্ষিপ্ত অংশের সবটা এক যুগের নয়। অতুলচন্দ্র সুর এক জায়গায় বলেছেন ঋগ্বেদে অন্তত সাতটি কালস্তর পাওয়া গেছে। এগুলি চিহ্নিত করা ঐতিহাসিকের কাজ, তবে ভূতাত্ত্বিক নিদর্শন ছাড়া করতে গেলে বিভ্রান্ত হবার সম্ভাবনা।

বর্তমান গ্রন্থে বিভিন্নদিক থেকে চেষ্টা করা হয়েছে ভারতীয় উপমহাদেশে ভূবিস্থার ক্রমবিকাশের ধারা নিরূপণ করার। বহুক্ষেত্রে বিভিন্নদিক থেকে এগিয়ে যেমন একই লক্ষ্যে পৌছন গেছে, আবার অনেকসময় মুখোমুখি হতে হয়েছে অদ্ভুত সব বিবরণের। এককথায় এসব বিবরণকে অবাস্তব বলে উড়িয়ে দেওয়া সহজ। কিন্তু এদেশের বিশালতা, বৈচিত্র্যের স্বরূপ ও রাজনৈতিক অস্থিরতার সঙ্গে একটুও পরিচয় থাকলে এসব বিবরণ কপোলকল্পিত বলে উড়িয়ে দিতে বাধে। তখন মনে প্রশ্ন জাগে যে পৌরাণিক রচনার কতটুকুই বা আমাদের হাতে এসে পৌছেছে আর তারই বা কতটুকুর ভাষ্য হয়েছে! খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম সহস্রকের মাঝামাঝি প্রয়োজন হয়েছিল একটি ভৌগলিক গেজেটিয়ার রচনার। যাস্কের নিরুক্ত এই রচনা, কিন্তু যাস্কের যুগেই হারিয়ে গেছে ঋগ্বেদের অনেক নদ নদী ও জনপদের অবস্থান। আজ আমরা জানি যে সেযুগের অনেক জনপদই কয়েক হাজার বছর ধরে মরুকবলিত, কিংবা নদীর গতিপথ পরিবর্তনে নিশ্চিহ্ন। হয়তো বর্তমান আলোচনা এসব বিষয়ে অনুসন্ধিৎসুদের নতুন কোনো চিন্তার ইঙ্গিত দেবে।

* * * *

বর্তমান গ্রন্থের ভিত্তিস্বরূপ নিদর্শনগুলি সংগৃহীত হয়েছে 1962-83 পর্যন্ত বিস্তৃত সময় ধরে। এগুলি সংগ্রহ করতে গিয়ে লেখককে বহু ভারতীয় ও বিদেশী বিশেষজ্ঞের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়েছে যাঁরা তাঁদের মূল্যবান মতামত দিয়ে লেখককে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাই। কৃতজ্ঞতা জানাই Indian Journal of History of Science এর সম্পাদক, Freiberg-এ 1970 সালে অনুষ্ঠিত International Symposium on History of Sciences-এর উদ্যোক্তাবর্গ এবং কথাশিল্পের শ্রীঅবনী রায়কে, কারণ এঁরা বিভিন্ন সময়ে তাঁদের প্রকাশনা মাধ্যম মারফৎ আমার ভাবনা-চিন্তাগুলি বৃহত্তর পণ্ডিতমণ্ডলীর কাছে পৌছে দিয়েছেন। ফলে তাঁদের সযৌক্তিক সমর্থন ও বিরূপতায় আমার প্রাচীন ভারতে ভূবিস্থা সম্বন্ধীয় অনুসন্ধানের ধারা ক্রমে পরিশীলিত হতে হতে বর্তমান রূপ লাভ করেছে।

* * * *

ছাপার ভুল থাকলে পড়তে যেমন খারাপ লাগে তেমনি অপরিচিত এবং নামবাচক শব্দের বেলায় বিভ্রান্তি ঘটে থাকে। 'ভারতে ভূবিদ্যার ক্রমবিকাশ'-এর বেলায় বহু জায়গায় য য-এ রূপান্তরিত হয়েছে। এজন্য পাঠকের কাছে ক্ষমা চাইছি। তবে কোথাও কোথাও বিভ্রান্তির অবকাশ আছে বলে গ্রন্থশেষে একটি শুদ্ধিপত্র সংযোজন করা হলো।

* * * *

প্রচ্ছদে ভ্যালেন্টাইন বল-এর পেন্সিল স্কেচ খাসি পাহাড়ে প্রচলিত হাইড্রলিক মাইনিঙ পদ্ধতির।

এক ঃ উপমহাদেশে প্রাচীনতম জনবসতির পুরাভৌগোলিক পটভূমি

সভ্যতার ইতিহাসে কাল বা সময়ের শ্রেণীবিভাগ বিভিন্নদেশে করা হয়েছে বিভিন্নভাবে। উপমহাদেশে একসময় এই বিভাগ ছিল প্রাগৈতিহাসিক যুগ, বৈদিকযুগ, বৌদ্ধযুগ ইত্যাদি রূপে। আজকাল এভাবে না করে প্রকৃত প্রাচীনত্ব বা absolute age দিয়ে ঐতিহাসিক কালকে বিভিন্ন ভাগে চিহ্নিত করা হচ্ছে। ঐতিহাসিক যুগের শুরুর আগে, মানুষের আবির্ভাবেরও অনেক আগে থেকে, বলতে গেলে ভূগোলকের সৃষ্টি থেকে ভূপৃষ্ঠে কালের স্বাক্ষর পড়তে শুরু করেছে। সেই বিপুল ভূতাত্ত্বিক কালের শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে বিভিন্ন কল্প (era), উপকল্প (·period), অবকল্প (epoch) ও যুগ (age) এ। সভ্যতার ইতিহাসের বর্তমান যুগ, অতীতের ঐতিহাসিক যুগ, তথাকথিত প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু সভ্যতার যুগ সবই পড়ে ভূতাত্ত্বিক নবজীবীয় কল্প (Cainozoic Era)-র কোয়াটার্নারি উপকল্পের হলোসিন অবকল্পে। এর অগ্রবর্তী প্লাইস্টোসিন অবকল্পের সবচেয়ে বড় প্রাকৃতিক ঘটনা বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রার হ্রাস, যার পরিণতি হিমযুগ বা Ice age-এ। সাধারণভাবে ভূতাত্ত্বিক অতীতের বেশিরভাগ সময়ে যে ভূপৃষ্ঠ ছিল তুষারের আবরণমুক্ত, ভূতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে তা জানা যায়। তবে ভূতাত্ত্বিক অতীতেও হিমযুগ বলে চিহ্নিত বিশেষ বিশেষ সময়ে ভূপৃষ্ঠের অর্ধেকেরও বেশি ঢেকে গেছে পুরু বরফের আবরণে।

হিমযুগের মধ্যে মাঝে মাঝে এসেছে কিছুটা গরমকাল। তখন হৈম আবরণের কিছুটা গলে গেলেও এখনকার মতো উচ্চ অক্ষাংশের বেশিরভাগ জায়গায় হিমবাহ থেকে গেছে, থেকে গেছে নিম্ন অক্ষাংশের উঁচু পর্বতশিখরে। আবার মাঝে মাঝে ঠাণ্ডা বেড়েছে, হিমবাহ প্রসারিত হয়েছে নিম্নতর অক্ষাংশে এযুগের নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলগুলিতে, আর নিরক্ষীয় অঞ্চলের পর্বতমালায় চিরতুষারের নিম্নসীমা বা snowline নেমে এসেছে অনেকটা। আগেরটিকে বলা হয়

আন্তর্হিমযুগ বা interglacial age আর পরেরটিকে তুষারযুগ বা glacial age।

হলোসিন অবকল্পের শুরু এমনি এক হিমযুগের শেষে, ইওরোপীয় ভূবিদরা* যার নাম দিয়েছেন W II c। কোথাও কোথাও এই হিমযুগ শেষ হয়েছে 10,000 বছর আগে, আবার কোথাও 11,500 বছর আগে, বা এ দুটির মধ্যবর্তী কোনো সময়ে[1]। সুতরাং বর্তমান হলোসিন অবকল্প একটি আন্তর্হিমযুগ হতে পারে, আবার হতে পারে বরাবরের মতো তুষারযুগের বিলুপ্তি ঘটে গিয়ে সাধারণ স্বাভাবিক অবস্থার আবির্ভাবের সূচনা। প্লাইস্টোসিন অবকল্পের তুলনায় হলোসিন অবকল্পের মেয়াদ খুবই ছোট, আবার আবহাওয়ার দিক থেকে যুগ বা age এর সমার্থকও বটে। তবে মনে রাখতে হবে যে হলোসিনের মধ্যে আমরা আছি, আর প্লাইস্টোসিন যেখানে শেষ সেখানে হলোসিন অবকল্পের পরিসমাপ্তি কবে ঘটবে তা আমাদের সম্পূর্ণ অজানা। এটুকু মনে রাখলে আর পরবর্তী আলোচনায় কোনো অসুবিধা হবেনা।

প্লাইস্টোসিন অবকল্পেও বেশ কবার আন্তর্হিমযুগ এসেছে আর সেইসব উষ্ণকালের পললের মধ্যে পাওয়া গেছে মনুষ্যদেহের অবশেষ। এইসব মানুষ ঠিক পশুর পর্যায়ের নয়। বিশেষ করে প্লাইস্টোসিন অবকল্পের শেষদিকে আসা ক্রোম্যাগ্‌নন মানুষ যে আগুনের ব্যবহার, চামড়া দিয়ে পরিধেয় আর তাঁবু বানাতে জানত তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। এদের পরিত্যক্ত নিদর্শনে মননশীলতা বা rationalityর ছাপ আছে। নৃতত্ত্ববিদরা এদের চিহ্নিত করেছেন বিভিন্ন নামের কালচার দিয়ে। এরা প্রধানত মাংসাশী ও যাযাবর বলে এদের কালচার কোথাও সভ্যতার পর্যায়ে পৌঁছেছিল বলে মনে করা হয়না। এদের কালচারকে প্রত্ন-প্রস্তরীয় (palaeolithic) কালচার বলে।

হলোসিন অবকল্পে এল মধ্যপ্রস্তরীয় (mesolithic) ও নব্যপ্রস্তরীয় (neolithic) কালচার**। ধরা হয় ধাতুর ব্যবহার ও কৃষিকার্যে কালচার প্রথম

---

* আগে প্লাইস্টোসিন তুষারযুগ ও আন্তর্হিমযুগগুলিকে যেভাবে চিহ্নিত করা হতো তাতে WIIC ছিল শেষ তুষারযুগ। এখন দেখা যাচ্ছে এই বিভাগগুলি ইওরোপীয় নিদর্শনের ভিত্তিতে চিহ্নিত হয়েছিল, ভূগোলক জুড়ে সেগুলি চালান ঠিক নয়।

** গত দশকে ও বর্তমান দশকে আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রত্নমানবের দেহা-বশেষের বেশ কিছু নিদর্শন আবিষ্কৃত হওয়ায় এখন এ অনুমানও বদলে যাচ্ছে।

রূপান্তরিত হলো সভ্যতায়। এ দুটি কারণে মানুষ প্রথম আকৃষ্ট হলো ভূপৃষ্ঠের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে, আর চিহ্নিত হতে থাকল এক একটি গোষ্ঠীর এলাকা। এরপর তাই এল সভ্যতার তাম্রযুগ (বা স্বর্ণযুগ), ব্রোঞ্জযুগ, লৌহযুগ, আর সে হিসাবে আমরা এখন চলেছি যন্ত্রযুগের মধ্য দিয়ে।

উপমহাদেশে প্লাইস্টোসিন অবকল্পের উপর গবেষণা বিশেষ না হলেও অন্যান্য দেশে অনেক গবেষণা হয়েছে। তারই ভিত্তিতে প্লাইস্টোসিন অবকল্পে ভূগোলকের বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষের বিস্তারের বয়স নিরূপণ সম্ভব হয়েছে।[2] বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষের বসতির যা বয়স পাওয়া গেছে (চিত্র 1. 1) তাতে দেখা যায় বিষুবরেখার দুধারে প্রায় 35° অক্ষাংশের মধ্যে মানুষের প্রাচীনতম বসতি 200,000 বছরের বেশি পুরানো। এর উত্তরে এসিয়া ও ইওরোপের নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল বরাবর মানুষের বিস্তার 35,000-40,000 বছরের মধ্যে। অস্ট্রেলিয়া আর আমেরিকার ভূখণ্ড দুটিতে মানুষের বিস্তার আরো পরে, হলোসিন অবকল্পে।

মানুষের জীবাশ্মের ভিত্তিতে বিভিন্নযুগে মনুষ্যবসতির এই মানচিত্র থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে তুষারযুগের বিভিন্ন সময়ে প্রধানত নিরক্ষীয় অঞ্চলে ও তার চারপাশ জুড়ে মানুষের কালচারের বিস্তার। মধ্য প্লাইস্টোসিন থেকে বিভিন্ন আন্তর্হিমযুগে সবসময়ে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা সমপরিমাণে বাড়েনি, কিংবা বারবার বায়ুপ্রবাহের গতিপথ ঠিক একইভাবে পরিবর্তিত হয়নি। মধ্য এসিয়া, ফ্রান্স ও স্পেন থেকে উত্তরে মানুষের বিস্তার ঠিক এমনি এক আন্তর্হিমযুগে, ইওরোপে যা W II a প্রতীকে চিহ্নিত। এই সময়ের মধ্যে ইওরোপের বহু অঞ্চলে মরুময় আবহাওয়ার বিস্তার ঘটে। পরে W IIa/b হিমযুগ ও W II b আন্তর্হিমযুগ, একটা ছোট হিমযুগ (11,000-12000 বছর আগে) ও শেষ W II c হিমযুগ আসে। সাধারণভাবে সময়টা প্রত্নপ্রস্তরযুগের মধ্যে পড়লেও বেশ ক-টি গুহাচিত্র বাস্তবতা (realism)-এর দিক থেকে যথেষ্ট উন্নত মননের স্বাক্ষর রেখেছে। যে কালচারে এ ধরনের ছবি আঁকা সম্ভব হয়েছিল সে কালচারে কোনো কথ্যভাষার উদ্ভব হয়নি এ কথা মেনে নিতে যুক্তিতে বাধে।

প্রত্নপ্রস্তরযুগের শেষদিকের এই সময়টায় সারা ভারতীয় উপমহাদেশে মানুষের কালচারের অভিব্যক্তি। তবে এখানে ফ্রান্স বা স্পেনের মতো গুহাচিত্র পাওয়া

---

[2] আগ্রহী পাঠক পড়ে দেখতে পারেন : K. F. Weaver-এর The Search for Our Ancestors। বেরিয়েছে November 1985-এর National Geographic-এ।

যায়নি। পাওয়া গেছে বিচিত্র আকার ও আকৃতির পাথরের অস্ত্র। এই অস্ত্রগুলির সংস্থান বা distribution-এ গতশতাব্দী থেকেই একটা মজার ব্যাপার লক্ষ্য করা গেছে। দেখা গেছে তামিলনাড়ুর বিভিন্ন অঞ্চলে পাওয়া প্রত্নপ্রস্তর-যুগের 'অস্ত্রসমূহের সহিত বঙ্গদেশের ও উড়িষ্যার···শিলানির্মিত প্রহরণের বিশেষ সাদৃশ্য আছে।···মাদ্রাজে ও বাঙ্গালায় আবিষ্কৃত প্রত্নপ্রস্তর যুগের অস্ত্রসমূহের সাদৃশ্য কেবল আকারগত নহে, অনেক সময় উভয় দেশে আবিষ্কৃত অস্ত্রের পাষাণ একই জাতীয়। যে স্থানে এই জাতীয় প্রস্তর পাওয়া যায় সেস্থান বাঙ্গালাদেশ হইতে শত শত ক্রোশ দূরে অবস্থিত।'[3]

প্লাইস্টোসিন অবকল্পের শেষে W II c হিমযুগে সমুদ্রপৃষ্ঠ নেমে গেছে এখনকার সাগরপৃষ্ঠের চেয়ে প্রায় 50 মিটার। ফলে ভারতের তটরেখা অনেকটা বিস্তৃত হয়েছে সাগরের দিকে। শ্রীলঙ্কা জুড়ে গেছে দাক্ষিণাত্যের সঙ্গে, ওদিকে ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপগুলি ব্রহ্মদেশের দক্ষিণাংশের সঙ্গে আর ভারতীয় উপদ্বীপের দক্ষিণ পশ্চিমে যেখানে লাক্ষাদ্বীপ ও আমিনদ্বীপ, সেখানে সাগরপৃষ্ঠের বাইরে বেড়িয়ে পড়েছে একটা বেশ বড় ভূখণ্ড। ওদিকে আন্দামান নিকোবরের দ্বীপগুলি জুড়ে গিয়ে একটা উত্তর-দক্ষিণ বিস্তৃত দীর্ঘ ভূভাগ প্রকাশিত হয়েছে সাগর পৃষ্ঠের উপর (চিত্র 1.2)। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙ্গলা আর মাদ্রাজের প্রত্ন-প্রস্তর যুগের অস্ত্রের যে সাদৃশ্য আলোচনা করেছেন[3] তা বোধহয় সম্ভব হয়েছিল পূর্বঘাট পর্বতমালার পূর্বদিকে একটি প্রশস্ত তটভূমি এসময়ে ছিল বলে। ভারতের পূর্বতটরেখা এখনকার মতো হলে সেই আদিমযুগে দাক্ষিণাত্যের দুই প্রান্তের মধ্যে যোগাযোগ সম্ভব হতো না, আর তটভূমি ছাড়া পশ্চিমের পার্বত্য অঞ্চল বরাবরও যোগাযোগ সম্ভব ছিলনা।

এ তো গেল পুরাভৌগলিক পরিবেশ। জলবায়ুও ছিল অনেকটা অন্যরকম। উত্তরে হিমালয়ে হিমরেখা (snowline), যার এখন উচ্চতা 5000 মিটার মতো, তা ছিল অনেক নিচে। ঠিক কতটা নিচে তা জানা না গেলেও হিমরেখা যে সিবালিক পর্বতমালাতে নেমে এসেছিল তার ভূতাত্ত্বিক নিদর্শন আছে। ভারতীয় উপদ্বীপে কোথাও হিমবাহ না থাকলেও যে নাতিশীতোষ্ণ আল্পসীয় আবহাওয়া ছিল তার প্রমাণস্বরূপ বলা হয়েছে বিহারের পরেশনাথ পাহাড়, রাজস্থানের আবু পর্বত, নীলগিরির দোদাবেতায়, শেভ্রয় পাহাড়ের উঁচু শৃঙ্গে বিশিষ্ট আল্পসীয় প্রাণী ও উদ্ভিদ (Rhodendron arboreum, Martes flavigula, Capra hylocrinus, Lygosoma sikkimense, Thynsia wallichi) ইত্যাদির

অস্তিত্ব।* অনুমান করা হয় যে তুষারযুগে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা কমে গেলে সমতল ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল এগুলি। তারপর তুষারযুগের অবসানে
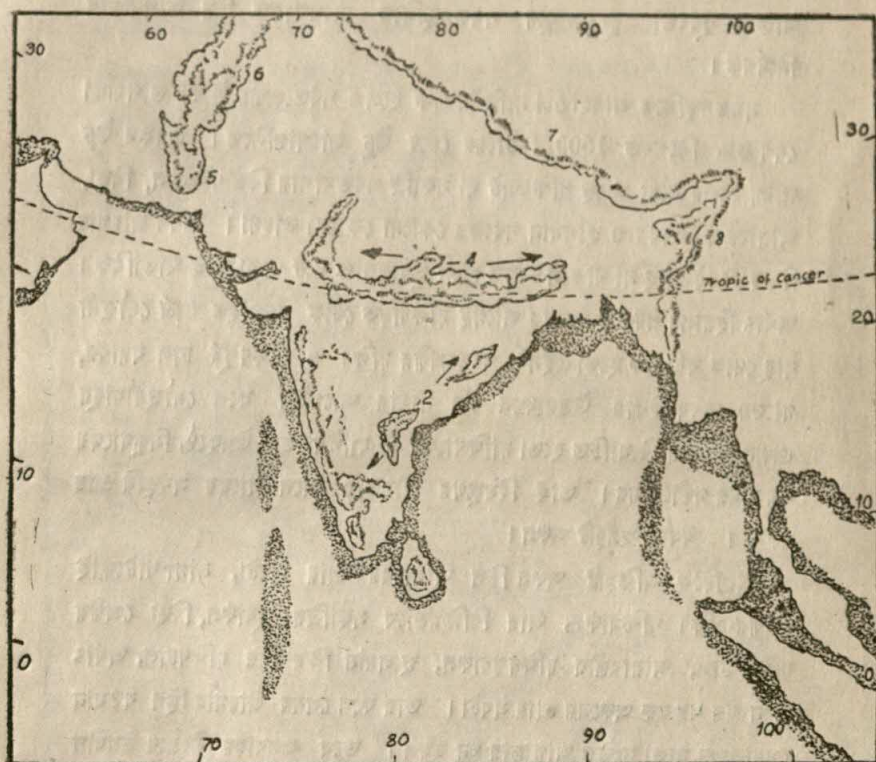
Fig. 1.2. WIIC হিমযুগে ভারতীয় ভূখণ্ডে ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে পুরাভৌগোলিক অবস্থা। সমুদ্রপৃষ্ঠ প্রায় পঞ্চাশ মিটার বর্তমানের তুলনায় নেমে গেছে ধরে নিয়ে যে অঞ্চলগুলি ভূভাগরূপে প্রকাশিত ছিল তা স্থূক্ষ্ম বিন্দু দিয়ে দেখান হয়েছে। (1 : পশ্চিমঘাট বা সহ্যাদ্রি পর্বতমালা ; 2 : পূর্বঘাট পর্বতমালা ; 3 : নীলগিরি পর্বতমালা ; 4 : বিন্ধ্য, সাতপুরা ও আরাবল্লীর পর্বতাঞ্চল ; 5 : স্থলেমান ; 6 : কিরথর ; 7 : হিমালয় ; 8 : নাগা-পাটকোই ও আরাকান-ইয়োমা পর্বতাঞ্চল)

---

* Pascoe, E. H.,, 1964, A Manual of Geology of India and Burma, Vol. 3., 3rd Edition, Govt, of India.

তাপমাত্রা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এগুলি ক্রমে সমতলভূমি থেকে উঁচু জায়গাগুলিতে এসে হাজির হয়। অর্থাৎ এইসব উঁচু জায়গায় এই অস্বাভাবিক গাছপালা ও প্রাণীর অস্তিত্ব পূর্ববর্তী তুষার যুগে সমতলভূমিতে অপেক্ষাকৃত নিম্ন তাপমাত্রার নির্দেশক।

সমতলভূমিতে আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ হলেও পর্বতশ্রেণীর উপরে তাপমাত্রা বেশ কম, বিশেষত 1500 মিটারের চেয়ে উঁচু জায়গাগুলিতে। এরকম উঁচু জায়গাগুলির মধ্যে আছে পশ্চিমঘাট বা সহ্যাদ্রি পর্বতমালার বিস্তীর্ণ অঞ্চল, বিন্ধ্য, আরাবল্লী, কিরথর ও সুলেমান পর্বতের কোনো কোনো জায়গা। এসব জায়গায় চিরস্থায়ী হিমবাহ না থাকলেও শীতকালে তুষারপাত ঘটে থাকা খুবই স্বাভাবিক। অর্থাৎ হিমালয় পর্যন্ত পৌঁছবার আগেই দক্ষিণদিক থেকে প্রবাহিত আর্দ্র মৌসুমী বায়ু থেকে বর্ষা শুরু হতো এইসব পর্বতশ্রেণীর দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব ঢাল বরাবর, গাঙ্গেয় অববাহিকার উত্তরাঞ্চলে বর্ষা নামার আগেই। ফলে মৌসুমীবায়ুর প্রধান জলভার বিমোচিত হতো দাক্ষিণাত্যে ও দাক্ষিণাত্যের উপকণ্ঠে, সিন্ধুগাঙ্গেয় সমভূমির গভীরে নয়। তাই হিমযুগের তীব্রতার কালে গাঙ্গেয় সমভূমি প্রায় মরুময়। অর্থাৎ স্বল্পবৃষ্টি অঞ্চল।

অন্যদিকে, অতিবৃষ্টি অঞ্চল ছিল আসামের প্রায় সবটা, নাগা-পাটকোই শ্রেণীর দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল, আর বিচ্ছিন্নভাবে সহ্যাদ্রির পূর্বাঞ্চল, বিন্ধ্য শ্রেণীর দক্ষিণ ঢাল, আরাবল্লীর দক্ষিণপূর্বাঞ্চল, সুলেমান কিরথরের দক্ষিণঢাল, অর্থাৎ এখনকার থর মরু অঞ্চলের প্রায় সবটা। তার ফলে সেসব জায়গায় ছিল বর্তমান মেঘালয়ের মতো দুর্ভেদ্য আগাছার ঘন জঙ্গল। তবে জলবায়ুর নিয়ন্ত্রণে উপদ্বীপ ভারতের পর্বতশ্রেণীগুলির 'প্রভাব হিমালয়ের মতো ব্যাপক নয় বলে এই দুর্ভেদ্য বনভূমি ঘিরে ছিল পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত অঞ্চল জুড়ে নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি (চিত্র 1.3)।

শ্রীলঙ্কার তৎকালীন জলবায়ু আবার মধ্যভারতের চেয়ে কিছুটা আলাদা শ্রীলঙ্কা নিরক্ষরেখার আরো কাছাকাছি বলে। তাই এখানে অতিবৃষ্টির বদলে সবটাই পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত অঞ্চল। আন্দামান-নিকোবর দ্বীপবলয়, লাক্ষা-আমিন দ্বীপপুঞ্জেও অনুরূপ জলবায়ু ছিল বলে অনুমান করা যায়।

হলোসিন অবকল্পের শুরু থেকে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা ক্রমে যত বাড়তে থাকল, হিমরেখা তত উঠে যেতে লাগল। উপহিমালয় সিবালিক শ্রেণীর হিমবাহ গলে গিয়ে সৃষ্টি হলো অসংখ্য ছোট ছোট হ্রদ ও নালার। জায়গাটা হয়ে দাঁড়ালো অনেকটা এখনকার নরওয়ে-ডেনমার্কের জলাভূমির মতো।

উপদ্বীপ ভারতেও জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটতে লাগল। সেখানে অতিবৃষ্টি অঞ্চলগুলি রূপান্তরিত হলো পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত অঞ্চলে, পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত অঞ্চলগুলি স্বল্পবৃষ্টি অঞ্চলে, স্বল্পবৃষ্টি অঞ্চলগুলি অনাবৃষ্টি বা শুষ্ক অঞ্চলে। কোয়াটার্নারি উপকল্পের একেবারে শেষপর্যায়ে কোনো এক আন্তর্হিমযুগে এইভাবে সুলেমান-কিরথরের কোল ঘেঁষে জন্ম নিল থর মরুভূমি। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল সেই মরুর বিস্তার।

মধ্য প্রস্তরযুগে উপমহাদেশে মানুষের আদি জমিভিত্তিক বাসস্থানগুলি যদি এই পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত অঞ্চলে গড়ে উঠে থাকে, তবে সেগুলির ধ্বংসাবশেষ আজ পুরু
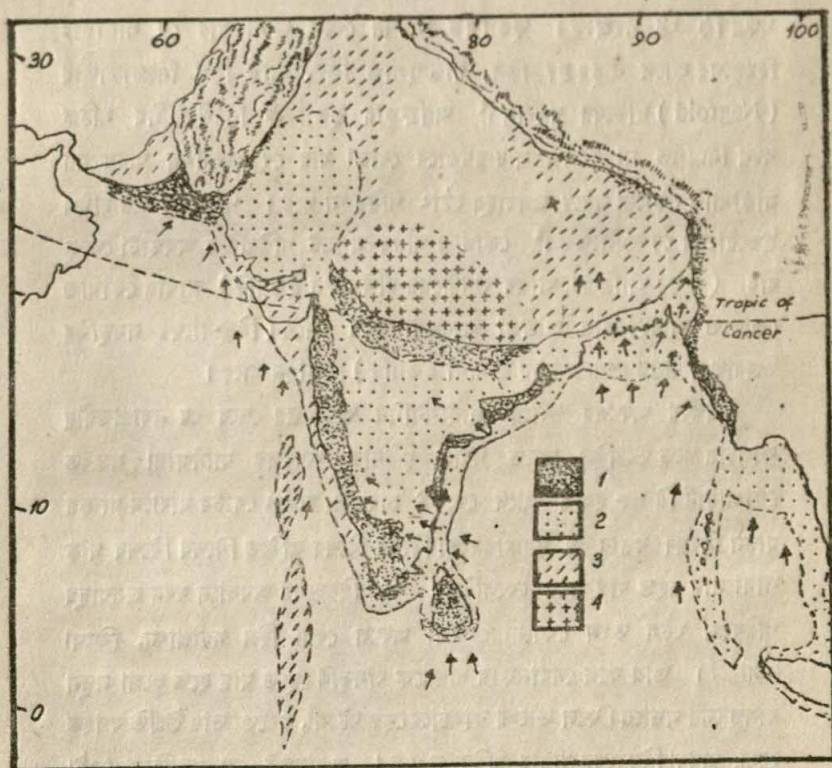
Fig. 1.3. WIIC হিমযুগে ভারতীয় ভূখণ্ডে বিভিন্ন জলবায়ু অঞ্চল (1 : অতিবৃষ্টি অঞ্চল ; 2 : পর্যাপ্ত বৃষ্টি অঞ্চল ; 3 : স্বল্পবৃষ্টি অঞ্চল ; 4 : অনার্দ্র বা প্রায়-অনার্দ্র অঞ্চল)।

বালুর আবরণে ঢাকা পড়ে থাকার কথা। সিন্ধুনদের দুধারে শুকনো মরু অঞ্চলের বহু জায়গায় সিন্ধুসভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কার এ অনুমানের স্বপক্ষে একটি মূল্যবান যুক্তি। মোহেঞ্জোদারোর অবশেষের মধ্যে পোড়াচালের অস্তিত্বও সমর্থন করে সেযুগে এ অঞ্চলে পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত।

যদিও উপমহাদেশের পুরা-ভৌগলিক পটভূমি ঠিক ঠিকভাবে আজ আর কোথাও নেই, তবু অক্ষাংশ, সাগরের সান্নিধ্য ও পাহাড় পর্বতের অবস্থান থেকে মধ্যস্পেনের সঙ্গে এই অঞ্চলের কিছুটা সাদৃশ্য পাওয়া যেতে পারে। সামান্য সাদৃশ্য আছে উত্তর আফ্রিকা আর পূর্ব আফ্রিকার সঙ্গে। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে জানা যায় যে মিশরে কৃষিকর্ম এসেছিল দক্ষিণপশ্চিম এসিয়া থেকে খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম কি ষষ্ঠ সহস্রকে। ভূতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে জানা যায় যে সাহারায় হিমযুগের কালে প্রচুর হ্রদ ছিল, গাছপালাও ছিল, আর ছিল নিগ্রোজাতীয় (Negroid) মানুষের বসবাস।[4] আফ্রিকার ভূতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলির সঠিক বয়স নিরূপিত না হলেও সাধারণভাবে বোঝা যায় যে হলোসিন অবকল্পের মাঝামাঝি কোনো সময়ে জলবায়ুর হঠাৎ পরিবর্তন ঘটে। পরিবর্তন ঘটে দক্ষিণ ইওরোপের দেশগুলিতেও।[5] কোথাও পরিবর্তন ঘটে পরিবর্তিত অবস্থাটা থেকে যায় (উত্তর আফ্রিকা, আরব উপদ্বীপের দক্ষিণাঞ্চল ইত্যাদি), আবার কোথাও কোথাও আবহাওয়ার তীব্রতা অনেকটা কমে আসে (সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমভূমির উত্তরাঞ্চল, উত্তর স্পেন, উত্তর জার্মানী ইত্যাদি) কিছুদিন বাদে।

নিরক্ষীয় অঞ্চলের দুধারে প্লাইস্টোসিন অবকল্পের শেষে যে নব্যপ্রস্তরীয় কালচার গড়ে উঠেছিল তাতে পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত অঞ্চলের বাসিন্দারা সম্ভবত কোআটার্নারি শুরু হবার আগে থেকেই চাষবাস, অর্থাৎ সেচের মাধ্যমে গাছের বাড়ন নিয়ন্ত্রণ করার ও দরকারমতো বিশেষ বিশেষ জমিতে বিশেষ বিশেষ গাছ লাগানোর রহস্য বার করে ফেলেছিল। পরে হিমযুগের অবসানে যখন জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটল তখন কোনো কোনো অঞ্চলে দেখা দিল মহাপ্লাবন, কিংবা অনাবৃষ্টি। তার ফলে সেখানকার মানুষকে বাসভূমি ছেড়ে বার হতে হলো নতুন বাসস্থানের সন্ধানে। ফলে তাদের কালচারে ছেদ ঘটলো, হয়তো তার উন্নতি ব্যাহত হলো, অথবা বিকাশের ধারায় পরিবর্তন এল। স্বভাবতই এরা প্রকৃতিকে একটা আধিদৈবিক শক্তিরূপে চিনল, শুরু হলো প্রকৃতি পূজার। পরবর্তীকালে যখন আবার তারা নতুন বাসস্থানে গিয়ে আস্তানা গাড়লো তখনো থেকে গেল প্রকৃতি উপাসনার একটা ধারা। আবার কোথাও প্রাকৃতিক পরিবর্তনের মাত্রা মানুষকে

উদ্বাস্তু করার মতো সুতীব্র হলোনা। সেখানে অপ্রতিহতভাবে কালচার এগিয়ে চলল, জমির উপর নির্ভরতা বেড়ে গেল, দরকার হলো স্থায়ী বাসস্থান গড়ার। তাই তৈরি শুরু হলো পাথরের ঘরবাড়ী, শহর। জমির উপর নির্ভরতা বাড়ার যুগে আবিষ্কার হলো ধাতু, এল ধাতুবিদ্যা আর ব্রোঞ্জ ও স্বর্ণযুগ। উপমহাদেশে সভ্যতার প্রাচীনতম ধ্বংসাবশেষ এই ব্রোঞ্জ ও স্বর্ণযুগের, তবে পুরাণের গল্পে আরও অনেক আগের নব্য প্রস্তরযুগের স্মৃতিও ছড়িয়ে আছে।

দুই : ভূবিদ্যার ক্রমবিকাশের ইতিহাসের উৎস

যে কোন ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই তার উৎস স্থির করে নেওয়া দরকার, কারণ উৎসের উপর তথ্যের ও সেই তথ্য থেকে উপনীত সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা নির্ভর করে। বর্তমান আলোচনার ভিত্তি যেহেতু প্রত্ন ইতিহাসে, সেহেতু একেবারে শুরুর দিকের নিদর্শনগুলি সম্বন্ধে আলাদা করে কিছু বলার আছে।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ের আলোচনায় কি করে স্থায়ীবসতি গড়া থেকে এসেছিল আদি বাসগৃহ ও নগরের পরিকল্পনা তা আমরা দেখেছি। আর ব্যর্থ পরিকল্পনার পরীক্ষা নিরিক্ষার মধ্য দিয়ে এল কতকগুলি সূত্র, সৃষ্টি হলো বিজ্ঞানের। আবার বাড়ী ও শহরের বিভিন্ন অংশের উপাদানরূপে প্রথমে কাঠের ব্যবহার শুরু হলেও অবিলম্বে ভঙ্গুর কাঠের জায়গা নিল শিলা। তারপর সেই শিলার অলঙ্করণের জন্য এল মণিক। সুতরাং প্রাগৈতিহাসিক বলে চিহ্নিত ধ্বংসাবশেষগুলি থেকে আর সেইসব ধ্বংসাবশেষে পাওয়া পাথরের জিনিষপত্র তৈরির কর্মশালা থেকে পাওয়া যাবে সেযুগের ভূতাত্বিক জ্ঞান ও প্রযুক্তির ইতিহাসের নিদর্শন। ধাতব বস্তুর রাসায়নিক সংযুতি, মণিকে তৈরি বস্তুতে ব্যবহৃত মণিকের ভৌত ধর্ম ইত্যাদি থেকে পাওয়া যাবে সেগুলির উৎস, অর্থাৎ খনির অবস্থান। নগরের পথঘাটের বিন্যাস, জলনিকাশের ব্যবস্থা, স্নানাগারের পরিকল্পনা ইত্যাদি থেকে মিলবে তাদের বায়ুপ্রবাহ, জলপ্রবাহের ধর্ম, আবহিক বিকার (chemical weathering) ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রযুক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গী।

পৌরাণিক ইতিহাস বা traditional history উপমহাদেশে সম্ভবত এইসব ধ্বংসাবশেষের চেয়েও প্রাচীনতর কালের খবর দেয়। এইসব গ্রন্থের মধ্যে আছে মহাকাব্যদ্বয়, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ইত্যাদি। সংস্কৃতভাষায় রচিত এইসব গ্রন্থের রূপক ও অর্থ ঠিকঠিকভাবে ভেদ করতে পারলে সেযুগের মানুষের ভৌগোলিক জ্ঞান ও ভূতাত্বিক শক্তি সম্বন্ধে কি ধারণা ছিল তার অনেকটাই জানা যাবে। বর্তমানগ্রন্থে বহু উদাহরণ আছে পৌরাণিক ইতিহাসের অর্থভেদ

করার, তবে কোনোমতেই তা সম্পূর্ণ নয়। সংস্কৃতভাষায় উপযুক্ত জ্ঞান নিয়ে কোনো অনুসন্ধিৎসু এ বিষয়ে গবেষণার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এগোলে অবশ্যই এ গ্রন্থে পড়ে থাকা বহু ফাঁক পূরণ হবে।

পৌরাণিক ইতিহাস আলোচনায় বেশ কয়েকটি কোষগ্রন্থের কথা অবধারিত-ভাবে এসে পড়ে। পাঁচটির নাম ভূমিকায় উল্লেখ করেছি—অথর্ববেদ, অষ্টাধ্যায়ী, নিরুক্ত, অর্থশাস্ত্র ও বৃহৎসংহিতা। এগুলির মধ্যে কিংবা এগুলির ভাষ্যের মধ্যে উল্লেখ আছে গর্গসংহিতা, পরাশর সংহিতা, সমাস সংহিতা ইত্যাদি গ্রন্থের। লেখকের এগুলি দেখার সুযোগ হয়নি, তবে এগুলির উল্লেখ থেকে অনুমান করা যায় যে প্রকৃতিবিষয়ক আরো বহু গ্রন্থ বিভিন্ন সময়ে প্রচলিত ছিল যা আজও অপঠিত পুঁথির মধ্যে পড়ে আছে। 1930 সালে প্রসন্নকুমার আচার্য বাস্তুবিদ্যার কোষগ্রন্থ মানসার অনুবাদ করে প্রকাশ করার আগে প্রাচীন ভারতে প্রচলিত বাস্তুবিদ্যার অনেক কথাই তো আমাদের জানা ছিলনা। কে জানত খৃস্টপূর্ব তৃতীয় চতুর্থ শতকে বহুতল প্রাসাদ তৈরির প্রযুক্তির অস্তিত্ব!

একেবারে পৌরাণিক রচনাবলী বাদ দিলেও পরবর্তীযুগের কাব্যে তথ্য কিছু কম নয়। কালিদাস, বাণভট্টের রচনায় বহু প্রাকৃতিক ঘটনার বর্ণনা আছে! বিবরণ আছে বহু দেশের।

পৌরাণিক ও অন্যান্য সংস্কৃত রচনার পাশাপাশি অতি প্রাচীনকাল থেকে পাওয়া যায় বিদেশীদের বিবরণ। এগুলিও বর্তমান ইতিহাসের মূল্যবান উৎস। তবে পৌরাণিক ঘটনামাত্রেই যেমন আক্ষরিক অর্থে সর্বত্র গ্রহণযোগ্য নয়, ঠিক তেমনি বিদেশী বিবরণগুলির সবকটিই সমভাবে গ্রহণ করা যায় না। তবে বিদেশী বিবরণ না পেলে সঠিক কাল নিরূপণের খুবই যে অসুবিধা হতো সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। ভারতীয় পুরাণের রাজাদের বংশপরম্পরার কালানুক্রমের প্রমাণীকরণ (standardization) এমনি এক পর্যটকের লিখে রাখা মহাপদ্ম নন্দের অভিষেক বর্ষ থেকে সম্ভব হয়েছে। এই সালটি না পেলে বিষ্ণুপুরাণের নির্দেশ (অধ্যায়: পাঁচ) কোনো কাজে লাগত না। ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাঙ, ইৎসিঙ, ইবনবতুতা, আল বিরুনী, মার্কো পোলো, বার্নিয়ে, তাভার্নিয়া ইত্যাদির বিবরণ, পরোক্ষভাবেই হোক আর প্রত্যক্ষভাবেই হোক, বহুক্ষেত্রে অন্য উৎস থেকে পাওয়া উপাদানের যাথার্থ্য নিরূপণে সাহায্য করে।

লিখিত বিবরণের পাশাপাশি আমাদের সামাজিক জীবনের কোনো কোনো

সংস্কার ও নিত্যব্যবহার্য বস্তুর মধ্যেও ইঙ্গিত পাওয়া যায় অতি প্রাচীন কোনো কোনো প্রক্রিয়ার।

নগরির ধ্বংসাবশেষের মতো প্রাচীন বহু খনির অবশেষ আছে উপমহাদেশের নানাজায়গায় ছড়িয়ে। এগুলির অনেক জায়গায় এ শতাব্দীতে খুঁড়তে গিয়ে বেরিয়েছে শিলালিপি কিংবা তাম্রশাসন। পাওয়া গেছে অঙ্গারভস্ম ও ধাতুমলের স্তূপ। C^{14} পদ্ধতি প্রয়োগ করে এগুলির বয়স বেরোবে, রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে বেরোবে ধাতুবিদ্যা ও খনিবিদ্যার ইতিহাস। যেসব জায়গায় ধারে কাছে খনি নেই, সেসব অঞ্চলে পাওয়া ধাতববস্তুর রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে trace elements থেকে বেরোবে ধাতুর উৎসস্থল। হয়তো বিভিন্ন অজানা বাণিজ্য-পথের সন্ধান মিলবে এভাবে।

আগেই বলেছি, এদেশে হলোসিন অবকল্পের বিভিন্ন স্তর নিয়ে গবেষণা তেমন হয়নি। বিভিন্ন অঞ্চলে নলকূপ খনন, নগর পত্তন, রাস্তাঘাট তৈরি করতে গিয়ে যতটুকু খোঁড়াখুঁড়ি করতে হয় তাতে বহু জায়গায় মাটির জিনিষপত্র, পাথরের টুকরো, অনেক সময় ধাতবপদার্থ পাওয়া গেছে, কিন্তু তা বিশেষজ্ঞের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। এগুলি সম্বন্ধে আর একটু সতর্ক হলে অনেক নতুন তথ্য পাওয়া যাবে সন্দেহ নেই।

তিন : মণিকবিদ্যা

সভ্যতার উষাকালের বিভিন্ন স্তর প্রত্নপ্রস্তর, তাম্র প্রস্তর, তাম্র ইত্যাদি যুগের বলে সূচিত করার রীতি সভ্যতার একেবারে আদিপর্ব থেকে মানুষের সঙ্গে ধাতু আর পাথরের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কের সবচেয়ে বড় প্রমাণ। স্বভাবতই শুরুতে এ-বিষয়ে মানুষের জ্ঞান ছিল পরীক্ষা-নিরিক্ষা (trial and error) লব্ধ। কিন্তু বারবার ঠেকে ঠেকে মানুষ এই পথেই শিখল ফ্লিন্ট (flint) আর সব পাথরের চেয়ে আক্রমণের উপযুক্ত ধারালো অস্ত্র তৈরির কাজে সবচেয়ে উপযুক্ত। তখন দরকার হলো নানান পাথরের ভিড়ে ফ্লিন্ট চিনে নেবার মতো ধর্মগুলি বার করা। ধীরে ধীরে উদ্ভব হলো নির্ণয়ক মণিকবিদ্যা বা Determinative Mineralogyর। তারপর যাযাবর জীবন ছেড়ে নাগরিক জীবনের তাগিদে এল আরো নানান মণিক।* এল শিল্পকর্মের জন্য রঞ্জক, ভেষজের জন্য বিশুদ্ধ রাসায়নিক যৌগ, গৃহসজ্জার জন্য আলঙ্করিক মণিক, ধাতু নিষ্কাশনের জন্য আকরিক। সেই থেকে মাত্র ক-দশক আগে পর্যন্ত এ সবেরই একমাত্র উৎস ছিল মণিক। মহাযুদ্ধের সময়ে কৃত্রিম উপায়ে রঞ্জক তৈরি হলো তো মাত্র সেদিন! এমনকি কৃত্রিম পদ্ধতিতে তৈরি করা গেল কোনো কোনো মণিকের বিকল্পও!

পরীক্ষা-নিরিক্ষা থেকে উদ্ভব হলো নানারকম থিওরির। শুধু এদেশে নয়, পৃথিবীর সর্বত্র। অবশ্য বিভিন্ন দেশে যেসব বিভিন্ন মতবাদের উৎপত্তি ঘটল, তাদের মধ্যে বৈষম্য অনেক। এর কারণ এক এক দেশের নিজস্ব প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য। পূর্বভারতের আর্দ্র আবহাওয়ায় লোহা জারিত হয়ে মরচে পড়া অতি

---

* 'মণিক' কথাটার একটা পুঁথিগত সংজ্ঞা এখানে দিয়ে নেওয়া যাক। প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন যেকোনো অজৈব কঠিন যৌগকেই মণিক বলা হয়। ক্যালসাইট, গ্রাফাইট, হীরক, হেমাটাইট, গ্যালেনা, কোআর্ট্জ ফেল্ড্স্পার ইত্যাদির সবই মণিক। ধাতব পারদ যদিও কঠিন নয়, তবু ধাতব পদার্থ বলেই তাকেও মণিক তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। যেসব মণিক থেকে সুলভে ধাতুনিষ্কাশন করা যায় সেগুলিকে বলা হয় আকরিক।

সাধারণ ঘটনা। কিন্তু জয়শল্মীর-বিকানীর-চূর্ক-এর শুকনো আবহাওয়ায় সামান্য মরচে পড়াই একটা অসাধারণ ঘটনা, অনভিজ্ঞ-মনে প্রচুর আধিদৈবিক কারণের নির্দেশক। সেক্ষেত্রে উদ্ভট সব থিওরির যে আবির্ভাব ঘটবে তা বলা বাহুল্য মাত্র। প্রধানত যোগাযোগ (communication)-এর অভাব এর জন্য দায়ী। পরবর্তীকালে যোগাযোগ বাড়লে ধীরে ধীরে সামান্যীকরণ (generalization)-এর চেষ্টা চোখে পড়ে। আর ব্যবহারযোগ্যতার কষ্টিপাথরে যাচাই হয়ে যে থিওরি টিঁকে যায় তার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে প্রাসঙ্গিক প্রযুক্তি।

আলোচনার সুবিধার জন্য ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস ভাগ করা হলো কয়েকটি পর্বে :

1. প্রাগৈতিহাসিক ধ্বংসাবশেষ
2. আনুমানিক 3000-600 খ্রীস্টপূর্ব
3. আনুমানিক 600 খ্রীস্টপূর্ব—400 খ্রীস্টাব্দ
4. 400-800 খ্রীস্টাব্দ
5. পরবর্তী যুগ

1. প্রাগৈতিহাসিক ধ্বংসাবশেষ

এই সভ্যতার সঙ্গে বর্তমানকালের কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই বলে এই সভ্যতাকে বলা হয় প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতা। সিন্ধু সভ্যতার কাল C^{14} পদ্ধতিতে নিরূপিত হয়েছে খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রকে[6]। ধ্বংসাবশেষের মধ্যে সোনার অস্তিত্ব এই সভ্যতার বৈশিষ্ট্য। আর একটি প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার নিদর্শন মেলে বালুচিস্তানের উপত্যকায়। এখানে সোনা পাওয়া যায়নি। সোনার ধাতুবিদ্যা তামার চেয়ে অনেক বেশি জটিল বলে এগুলিকে সিন্ধু সভ্যতার চেয়ে প্রাচীনতর বলে ধরা যেতে পারে। এগুলির সমকালীন জনবসতির পরিচয় আছে মির্জাপুর, হোসঙ্গাবাদ, সিঙ্গানপুরে কৈমুর বিন্ধ্য শ্রেণীর পাহাড়ের গুহায়[7]।

প্রথম অধ্যায়ে উপমহাদেশের পুরাভৌগলিক পটভূমি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখানো হয়েছে নিরক্ষীয় অঞ্চলের এক বিস্তৃত এলাকা জুড়ে কিভাবে নব্যপ্রস্তরীয় সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছিল। এ প্রসঙ্গে আনন্দ কুমারস্বামীর একটি মন্তব্য উল্লেখযোগ্য :

India in centuries and perhaps millenia B. C., was an intergal

part of an Ancient East, that extended form the Mediterranean to the Ganges Valley. In this ancient world there prevailed a common type of culture, which may well have a continuous history extending upwards from the stone age. Some of the most widely distributed decorative, or more accurately speaking, symbolic motifs, such as the cults of sun and fire, may go back to the remote past; more sophisticated motifs and technological discoveries may have originated in any part of the area; a majority perhaps in southern Mesopotamia, others in India or in Egypt (pp. 308-309)[7].

বালুচিস্তানের ধ্বংসাবশেষ ঃ

বালুচিস্তানে প্রাচীনতম যে বসতির সন্ধান পাওয়া গেছে (1950-এ W. A. Francis কর্তৃক খননের ফলে), C^{14} পদ্ধতিতে তার বয়স বেরিয়েছে 3688-3712 খ্রীষ্টপূর্ব। উত্তর বালুচিস্তানে এই জায়গাটির নাম কিলিগুল মহম্মদ[6]।

প্রাগসিন্ধুসভ্যতার প্রত্ন-অবশেষের মধ্যে পাওয়া গেছে বিভিন্ন রঙের পাথরের পাত্র, তামার কুঠার, রাজপট্ট (lapis lazuli)-র পুঁতি, অ্যাগেট ও কারনেলিয়ান, সোপস্টোনের মতো নরম পাথরে খোদিত নৌকো, কাদায় তৈরি মূর্তি ইত্যাদি। সোনার অনুপস্থিতি যদি এই সভ্যতার প্রাচীনত্বের প্রমাণ হয় তবে পরবর্তীকালে সিন্ধুসভ্যতার সঙ্গে এ সভ্যতার যে কোনো সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি তাও মানতে হয়। বোধহয় তখনি, খ্রীষ্টপূর্ব 3000-এ, কুমারস্বামী পরিকল্পিত সুপ্রাচীন প্রাচ্য পরস্পরবিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র জনপদে পুঞ্জীভূত হতে শুরু করেছে। বর্তমান আস্তহিমযুগ ততদিনে অনেকটাই এগিয়ে এসেছে। তার ফলে সুপ্রাচীন প্রাচ্যের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে আর একরকম আবহাওয়া নেই, কোথাও দেখা দিয়েছে মরু, আবার কোথাও অতিবৃষ্টি। সম্ভবত এই যুগটাতেই সবদেশের পুরাণের অভি-প্রয়াণ বা migration শুরু।

বালুচিস্তানের নাল সমাধিস্থানে একটি তামার কুঠারের রাসায়নিক সংযুতি পাওয়া গেছে এরকম ঃ তামা 93·03%, সীসক 2·14%, নিকেল 4·80% ও আরসেনিক নগণ্যপরিমাণে (in traces)[8]। সালফাইড আকরিকে বহু ধাতুর সালফাইড-মণিক মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। সুতরাং তামার আকরিক চ্যালকো-

পাইরাইটের সঙ্গে গ্যালেনা, নিকোলাইট ইত্যাদি থাকা কিছু অস্বাভাবিক নয়। তবে সর্বত্রই যে বিভিন্ন সালফাইডের অনুপাত সমান, তা নয়। বস্তুত বিভিন্ন সালফাইডের অনুপাত এক একটি ডিপোজিটের বৈশিষ্ট্য। এ বৈশিষ্ট্য আরো প্রকট সূক্ষ্ম পরিমাণে বর্তমান মৌল বা trace element-এর বেলায়। তাই সামগ্রিক রাসায়নিক বিশ্লেষণ সাহায্য করতে পারে উৎসের সন্ধানে, আর তার ফলে অজানা বাণিজ্যপথের সন্ধানও পাওয়া যেতে পারে।

প্রাগহরপ্পা সভ্যতার স্বাক্ষর আরো অনেক জায়গায় পাওয়া গেছে। যেমন সিন্ধু প্রদেশের কোটদিজি (2605-2090 খ্রীষ্টপূর্ব); রাজস্থানের কালিবঙ্গন (2370-2100 খ্রীষ্টপূর্ব)[6] ইত্যাদি। এগুলি সবই নব্যপ্রস্তর—তাম্রপ্রস্তর যুগের সভ্যতা।

সিন্ধু অববাহিকার সভ্যতা

C^{14} পদ্ধতিতে মোহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার বিভিন্ন স্তরের বয়স বেরিয়েছে 2245-1650 খ্রীষ্টপূর্ব পর্যন্ত। এই প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মহিষাদল, বাণেশ্বরডাঙা, পাণ্ডুরাজার ঢিবি প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যায়, কারণ হরপ্পার মতো এগুলিও তাম্রপ্রস্তরযুগের সভ্যতা। এগুলির C^{14} পদ্ধতিতে বয়স কত বেরিয়েছে, বা আদৌ বার করা হয়েছে কিনা তা আমার জানা নেই, আর বার করা হলেও তা যে সিন্ধু সভ্যতার সমবয়সী হবে একথা মনে করার কোনো কারণ নেই। প্রকৃত বয়স বেরোলে পরবর্তীকালের বৈদিকসভ্যতার প্রসারের সঙ্গে এগুলির সম্পর্ক চিহ্নিত করা যাবে। হয়তো আর্য উপনিবেশগুলিতে রজত, টিন ইত্যাদি ধাতুর আমদানি কোন পথে হতো তার ইঙ্গিত মিলবে।

সিন্ধু অববাহিকার ধ্বংসাবশেষে ধাতব বস্তুখণ্ড অনেক, তাদের বৈচিত্র্যও প্রচুর। সোনা, রূপা ও সীসকের নানান জিনিষ ছাড়া আছে বিচিত্র মণিকের টুকরো। রাজপট্ট ছাড়া আছে ফিরোজা (turquoise), জ্যাস্পার, চ্যালসিডনি; স্ফটিক, সোপস্টোন, অ্যালাবাস্টার জাতীয় জিপসাম, আর জতু (bitumen)। প্রাগৈতিহাসিক ধ্বংসাবশেষে ধাতুগুলির উৎস সম্বন্ধে হুইলারের বক্তব্যগুলি[9] বিচার করে দেখা যাক।

তামা: 'সম্ভবত বালুচিস্তানের রোবাট ও শাহ্ বেলাওল, অথবা রাজস্থানের ক্ষেত্রী।'

হুইলারের অনুমান যুক্তিযুক্ত মনে হয় না, কারণ পরবর্তীকালে মুঘলযুগের

আগে ক্ষেত্রীর নাম কোথাও পাওয়া যায় না। তাছাড়া, আফগানিস্তানের আকরিক মণিকশিরায় বিদ্যমান। শিরা থেকে আকরিক সংগ্রহ প্রকীর্ণক বা placer থেকে সংগ্রহের তুলনায় অনেক বেশি কষ্টসাধ্যই শুধু নয়, অনেক উন্নত প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীল। সেক্ষেত্রে মধ্যপ্রাচ্যের প্রকীর্ণকসম্ভার (placer deposits) আরো বেশি সম্ভাব্য উৎস বলে মনে হয়। নব্য প্রস্তরীয় যুগের শুরু থেকে নিরক্ষীয় অঞ্চল জুড়ে যদি সত্যিই সভ্যতার উন্মেষ হয়ে থাকে তবে মধ্যপ্রাচ্যে তামার আকরিকের উৎস মেনে নিতে বাধা থাকে না।

টিন : হাজারিবাগ অঞ্চলে টিন আকরিকের উৎস বলে হুইলার মনে করেন।

এর বিরুদ্ধে বোধহয় সবচেয়ে বড় অসুবিধা দেখা দেবে হাজারিবাগ থেকে সিন্ধু অববাহিকা পর্যন্ত সরাসরি যোগাযোগের সম্ভাব্যতা প্রমাণ করা। পুরা-ভৌগোলিক পটভূমির আলোচনা থেকে বরং মনে হয় এই দুই জায়গার মধ্যে ঘনসন্নিবিষ্ট আগাছার জঙ্গল থাকার সম্ভাবনাই বেশি। আজ থেকে প্রায় ছ-হাজার বছর আগে বনের সেই ঘনত্ব কিছুটা কমে এলেও আড়াই হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ বাণিজ্যপথ গড়ে ওঠার মতো উপযুক্ত কারণ কি থাকতে পারে তা অনুসন্ধানযোগ্য। বিকল্প হিসাবে উত্তর পশ্চিম দিক দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে যোগাযোগের সম্ভাবনা বেশি কারণ এটাই তো উপমহাদেশে ঢোকার একমাত্র পথ।

সোনা : নদীর বালুর সঙ্গে মিশ্রিত ধাতব সোনার দানা (alluvial placer) এই সোনার উৎস বলে হুইলার ভেবেছেন। কান্দাহার, আফগানিস্তান, কাবুল ইত্যাদি অঞ্চলে নদীর বালুতে সোনা এতই সাধারণ যে এ অনুমান গ্রহণযোগ্য।

রুপা : আফগানিস্তান ও পারস্য দু জায়গাতেই প্রচুর। হুইলারও কোনো ভারতীয় উৎসের কথা বলেন নি।

সিন্ধু অববাহিকার সভ্যতায় লোহার অনুপস্থিতি চোখে পড়ে। স্বভাবতই মনে হয় যে এই গোষ্ঠীর মানুষের সঙ্গে পরিচয় হয়নি কোনো লৌহময় অঞ্চলের। কারণ, যেখানে লোহা আছে সেখানে মাটির লালচে রঙ চোখে পড়বেই। সিন্ধু অববাহিকা থেকে উত্তরে ও উত্তর-পশ্চিমে এগোলে ল্যাটেরিটিক ভূমি তেমন নেই। কিন্তু দক্ষিণে কোলারের দিকে যেতে গেলে বিন্ধ্যপর্বত পেরোবার পর ল্যাটেরাইট দৃষ্টি এড়াতে পারেনা। ল্যাটেরাইট ছাড়াও দাক্ষিণাত্যের বিস্তীর্ণ লৌহ আকরিকের উদ্ভেদগুলি নজরে না পড়ে পারেনা, কারণ এগুলির মধ্যে আবার

কোনোটিতে চৌম্বকশক্তি সম্পন্ন ম্যাগনেটাইটের প্রাচুর্য। অথচ দাক্ষিণাত্যে স্বর্ণবাহী শিরা গুঁড়ো করে যে সুপ্রাচীনকাল থেকে সোনা আহরণ চলে আসছিল তার সমর্থন পাওয়া গেছে কোলার স্বর্ণখনি অঞ্চলে পাথর গুঁড়ো করার জন্য ব্যবহৃত চাটানের ফাটলে জমে-থাকা ধুলোর C^{14} বিশ্লেষণ করে। তাই মনে হয় দাক্ষিণাত্যে সমসাময়িককালে লোহা পরিচিত ছিল, কিন্তু সিন্ধু অববাহিকার সঙ্গে যোগাযোগ ছিলনা এই অঞ্চলের। বরং পূর্বভারতের সঙ্গে দাক্ষিণাত্যের যোগাযোগ ছিল সাগরপৃষ্ঠ নেমে গিয়ে বেরিয়ে-পড়া প্রশস্ত তটরেখা বরাবর। সিন্ধু সভ্যতার যুগে সাগরগর্ভে ডুবে গিয়ে এ তটরেখা ব্যাহত হলেও নৌবাণিজ্য পথের সৃষ্টি হয়েছিল সেই প্রাচীন যুগেই[3]।

অধাতব বস্তুগুলির মধ্যে জতু বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য অধাতব বস্তুর মতো এটি ঘরসাজানোর (decorative) উপকরণ নয়, একটি অবশ্যব্যবহার্য (useful) সামগ্রী। কারণ লোনা ধরা আর জল বেড়িয়ে যাওয়া রোধ করতে জতু ব্যবহার করা হয়েছিল মোহেঞ্জোদারোর প্রধান স্নানাগারে[10]। জতুর নিকটতম উৎস পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশের কতকগুলি অঞ্চল।

মণিক আর শিলার পুঁতির বৈশিষ্ট্য সেগুলির অত্যুত্তম পালিশ। পালিশ করার কারিগরির যতটা উন্নতি হয়েছিল পরবর্তী ঐতিহাসিক যুগে সেখানে পৌঁছতে লেগেছে বহু শতাব্দী।[11] পালিশ করা হতো সাধারণত গারনেট আর কোরাণ্ডামের গুঁড়ো দিয়ে। চাকার উপর এই গুঁড়ো লাক্ষা দিয়ে জমিয়ে সেই চাকা ঘুরিয়ে পালিশ করার গ্রাম্য পদ্ধতি এই প্রাচীন যুগ থেকে চলে এসেছে।[12]

বাইরে থেকে প্রতিযোগী গোষ্ঠীর আক্রমণ আর বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম চাহিদা, এই দুটি প্রধান সমস্যার সমাধান হয়ে গিয়েছিল মোহেঞ্জোদারো হরপ্পার সমাজে। তাই মানুষের নজর পড়েছিল কুটিরশিল্পের দিকে। সিন্ধু সভ্যতার উৎকর্ষ ছোটদের খেলনার মতো এই পালিশ করার কারিগরি দিয়েও সূচিত।

এখানে রঞ্জকরূপে ব্যবহৃত হয়েছে হেমাটাইট, ম্যাগনেটাইট, বক্সাইট, কুপ্রাইট ইত্যাদি। কালিবঙ্গনে পাওয়া গেছে সবুজ রঙের মাটির পাত্র। সবুজ রঙও কোনো মণিকের গুঁড়ো, তবে অক্সাইড নয়, সালফাইডের।

পরবর্তীযুগের সঙ্গে ধারাবাহিকতা বজায় না থাকায় সেযুগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির সঠিক চিত্র পাওয়া না গেলেও উন্নতি যে হয়েছিল তাও অস্বীকার করা যায়না।

আর্যদের চেয়ে অনেক প্রাচীন সুপ্রাচীন-প্রাচ্যের ধ্বংসাবশেষ পূর্বভারতে

বিশেষ করে বিহার পশ্চিমবাঙলা উড়িষ্যার নানা জায়গায় পাওয়া গেছে। বহুদিন আগে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এগুলি দ্রাবিড় সভ্যতার অন্তর্গত বলে অনুমান করেছিলেন।[3] যতদূর জানি, বিক্ষিপ্তভাবে ছাড়া এগুলি সম্বন্ধে কোনো রীতিবদ্ধ অনুসন্ধান এখনো হয়নি। অতিপ্রাচীনকাল থেকে আসাম-ব্রহ্মদেশের সঙ্গে পশ্চিম (বিশেষ করে পাঞ্জাব সিন্ধু অঞ্চলের) ভারতের যোগাযোগ ছিল কিনা তা অনুমান করার মতো কোনো তথ্য এখন আমাদের হাতে নেই। কিন্তু যোগাযোগ প্রমাণ করতে পারলে পৌরাণিক বহু বর্ণনার সুষ্ঠু ব্যাখ্যা সম্ভব হতো।

2. আনুমানিক 3000-600 খ্রীষ্টপূর্ব

ঋগ্বেদের বয়স ধরা হয়েছে খ্রীষ্টপূর্ব 2500 বছর[13]। তবে ঋগ্বেদের মধ্যে বিভিন্ন কালস্তর আছে, এবং একটি মত[6] অনুযায়ী অন্তত সাতটি কালস্তর আছে। 600 খ্রীষ্টপূর্ব পর্যন্ত আমরা triditional history বলে ধরতে পারি, কারণ প্রথম বয়স আমরা পাই বুদ্ধের। তার আগের যা যা বয়স সবই আপেক্ষিক বয়স, আর মহাপদ্ম নন্দের অভিষেককাল বিদেশী বিবরণে পাওয়া না গেলে কোনো পৌরাণিক ঘটনার বয়সই নিরূপণ করা যেতনা। এ যুগের সবগ্রন্থই প্রধানত সংহিতারূপে পরিচিত, তাই যুগটাকে বৈদিকযুগ বলে চিহ্নিত করা বোধহয় ভুল হবেনা।

বৈদিকযুগের একেবারে শুরুতে বর্ণাশ্রম দুর্লঙ্ঘ্য ছিলনা। রাজা বিশ্বামিত্রের ঋষি হতে, কিংবা নামগোত্রহীন সত্যকামের ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষায় বাধেনি। পরে বৃত্তিগত বর্ণাশ্রম দুর্লঙ্ঘ্য সামাজিক সংস্কাররূপে চেপে বসে, আর তারই ফলে খ্রীষ্ট-পূর্ব প্রথম সহস্রকের মাঝামাঝি আবির্ভাব হয় বৌদ্ধধর্মের। প্রায় সেইসময় থেকেই প্রযুক্তিবিদ্যাগুলি বৃত্তিগত গুপ্তবিদ্যায় (trade secret)-এ পর্যবসিত হতে বসেছে।

কোনো কোনো ঘটনা থেকে বৈদিক যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কিছুটা ধারনা করা যায়। যেমন, মহাভারতে বর্ণিত যুধিষ্ঠিরের অভিষেকের সময় দেশেবিদেশ থেকে যেসব উপঢৌকন এসেছিল তার মধ্যে উল্লেখ আছে কুলিন্দের রাজার পাঠানো পিপীলিকা স্বর্ণের। অতি বিশুদ্ধ এই সোনা। কুলিন্দ হিন্দুকুশ পর্বতের উত্তর পশ্চিমে কোনো এক উপত্যকায় অবস্থিত। উপমহাদেশ সংক্রান্ত প্রথম ইওরোপীয় বিবরণে (খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে) পিপীলিকা স্বর্ণের কথা আছে।[2] অবশ্য হেরোডোটাস নদীর বালু চেলে সোনা বার করার কথাও বলে গেছেন। তার পরের শতকে পিপীলিকা স্বর্ণের কথা বলে গেছেন মেগাস্থিনিস[14]।

পিপীলিকাস্বর্ণ ও সোনা আহরণকারী পিপীলিকা নিয়ে চালু হলো অনেক কাহিনী। বিদেশী পর্যটকদের বিবরণে এসব কাহিনীর বর্ণনা আছে।

পরবর্তী দুহাজার বছর ধরে গল্পগুলো মননশীল বিদেশীদের কাছে গবেষণার বিষয় হয়ে রইল। শেষে মাত্র গত শতকে সমস্যার সমাধান করলেন রলিনসন আর শিয়ার্ন নামে দুজন অভিযানকারী। তাঁদের অনুসন্ধানের ফলে জানা গেল যে বহুকাল ধরে দর্দ্ নামে একটি উপজাতি পশ্চিম হিমালয়ে সোনা সংগ্রহ করে আসছে। খননের কাজটা তারা চালায় শীতকালে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় ভূজল জমে যায় বলে ভূগর্ভে গর্ত খুঁড়তে কোনো অসুবিধা থাকেনা। খননকালের পুরো সময়টা এরা কাটাত ভূগর্ভে। গর্তের মুখে পড়ত চমরী গাই-এর রোমশ চামড়ায় তৈরি কালো কালো তাঁবু। এগুলি দূর থেকে দেখতে কোনো রোমশ প্রাণীর মতো। 1867 সালে এই দুই ভূবিদ তাঁদের অভিযান চালান। তখন এমনি এক সার তাঁবু তাঁদের চোখে পড়ে। স্থানীয় লোকজন তাঁদের পিঁপড়ের গল্প বলে। তাঁদের নিবৃত্ত করার জন্য এ-পিঁপড়ের হিংস্র স্বভাবের কথাও বলে। কিন্তু সব বাধা অগ্রাহ্য করে শেষপর্যন্ত সুড়ঙ্গের মুখে পৌঁছতে সব রহস্য সমাধান হয়[15]। বস্তুত, হিমালয়ের মধ্যে উঁচু উপত্যকাগুলিতে যে এভাবে সোনা আহরণের চল বহুদিনের তার আর একটি প্রমাণ অসংখ্য পরিত্যক্ত স্বর্ণখনি[16]।

পিপীলিকা স্বর্ণ ও রলিনসন-শিয়ার্নের বিবরণ থেকে বোঝা যায়:

এক—কোআর্ট্‌জ্ শিরা থেকে আলাদা আলাদা করে প্রতিটি স্বর্ণকণা ছেনি দিয়ে বার করা হতো বলে পিপীলিকা স্বর্ণের বিশুদ্ধতা সর্বাধিক।

দুই—এ কাজের জন্য এমন শিরা দরকার যাতে খালি চোখে সোনা দেখা যায়। কিন্তু ভূবিদমাত্রেই জানেন যে এমন কোনো কোআর্ট্‌জ্ শিরা নেই যার সব জায়গায় সোনার ঘনত্ব (concentration) সমান এবং বেশি। যেখানে বেশি সেখানেই শুধু চোখে পড়তে পারে সোনা, কিন্তু সেই বেশি সোনাওয়ালা জায়গাটাই যে সবসময় সবার আগে চোখে পড়বে এমন তো নাও হতে পারে! অর্থাৎ সোনা দেখে স্বর্ণবাহী শিরা চেনা সম্ভব নয়, চিনতে হবে অন্য কোনো ভৌতধর্ম দেখে।

তিন—ভূপৃষ্ঠ থেকে খুঁড়তে খুঁড়তে নিচে নামা হতো। তাহলে ভূগর্ভে খুঁড়তে গেলে যে সব সমস্যার উদ্ভব হতে পারে তারও কিছুটা ধারনা থাকা স্বাভাবিক।

চার—দারণ (joint) ও চ্যুতি (fault) সম্বন্ধে কিছুটা ধারনা না থাকলে

কোনো মণিকশিরায় খননকার্য বেশিদিন চালানো সম্ভব নয়। সুতরাং সে সম্বন্ধেও কিছুটা জানা ছিল। সোনার মতো একটা দুর্লভ ধাতু পর্যাপ্ত পরিমাণে পেতে হলে চাই তার বহুগুণ আয়তনের কোআর্ট্‌জ্‌ শিরা। তাহলে এই তিন চার হাজার বছরে বহু কোআর্ট্‌জ্‌ শিরায় সোনা খুঁড়ে শেষ করা হয়েছে, দরকার পড়েছে নতুন শিরা খুঁজে বার করার। তাহলে নিশ্চয়ই নতুন নতুন স্বর্ণময় কোআর্ট্‌জ্‌ শিরা খুঁজে বার করার (prospecting-এর) মতো কোনো পদ্ধতিও চালু ছিল।

ঋগ্বেদে সোনার তিনটি সমার্থক শব্দ আছে—হরিত, সুবর্ণ ও হিরণ্য। মহাভারতে ও হেরোডোটাসের বর্ণনায় এই সোনাগুলি যে পিপীলিকা স্বর্ণের চেয়ে নিকৃষ্ট মানের তা বলা হয়েছে। তাই মনে হয় এগুলি বিভিন্ন উৎসে প্লাটিনাম, রূপা ও তামামিশ্রিত সোনা, বা প্রাকৃতিক ধাতুসঙ্কর (natural alloy)।

সুবর্ণরেখার তীর ধরে মুণ্ডা, হো ইত্যাদি উপজাতির গ্রামগুলিতে এখনো নদীর বালু চেলে সোনার দানা সমাহরণের যে পদ্ধতি চালু আছে তার উৎপত্তি বোধহয় সেই প্রাচীনকালে প্রাগৈতিহাসিক যুগে। বহুব্যবহারে প্রক্রিয়াটি এত সাধারণ হয়ে গেছে যে এটির কোনো বৈজ্ঞানিক বিবরণ কোথাও পাইনি। অথচ নদীবক্ষে যে সোনা পাওয়া যায় তার বর্ণনা ভুরি ভুরি।

সোনার তিনটি নাম হলেও রুপো ও সীসার একটা করেই নাম, রজত ও সীসক। তামার আবার দুটি নাম—লোহা (লাল রঙ বলে লোহিত, সেই লোহিত শব্দের অপভ্রংশ), আর লোহিতায়স। কিন্তু শ্যামায়স (শ্যাম+অয়স, কৃষ্ণবর্ণ ধাতু, লোহা বা আয়রণ অর্থে) প্রাচীনতর পুরাণে নেই। কারো কারো[17] মতে বৈদিক মানুষ বিন্ধ্যপর্বত অতিক্রম করার পর প্রথম লোহার সঙ্গে পরিচিত হয়। পরে বোধ হয় মরচের লাল রঙ থেকে লৌহ লোহা বলা প্রচলিত হয়েছে। আর তামার লোহিতায়স থেকে উদ্ভূত লোহানামটা ঘুচে গেছে।

অয়স শব্দটা তাহলে একটি মূল (root)। লোহিতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তা বোঝাচ্ছে তামা, শ্যামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বোঝাচ্ছে লোহা। তাহলে টিন, রাঙ (zinc) ইত্যাদি সম্বন্ধে অনুরূপ শব্দ (এ ক্ষেত্রে suffix) থাকাও স্বাভাবিক, তবে বর্তমান লেখকের তা নজরে পড়েনি। এইসব ধাতু ও ধাতুসঙ্কর শক্ত ছেদক তৈরির কাজে লাগত। অনেকেই মনে করেন প্রাচীন বৈদিক যুগে লৌহ যখন অজ্ঞাত ছিল তখন লৌহের স্থান নিয়েছিল টিনের কোনো ধাতুসঙ্কর।

বৈদিক রচনায় ধাতু গলানোর চুল্লির উল্লেখ আছে, কিন্তু বিস্তারিত বর্ণনা নেই।

3. আনুমানিক 600 খ্রীষ্টপূর্ব—400 খ্রীষ্টাব্দ

এযুগে মণিকবিদ্যা ও খনিবিদ্যার সবচেয়ে বিস্তারিত ও শ্রেণীবদ্ধ আলোচনা মেলে কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে। সেখানে (কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র : দ্বিতীয় অধিকরণ—একাদশ ও দ্বাদশ অধ্যায়) বহু আকরিকের ভৌতধর্ম দেওয়া আছে, বলা হয়েছে সেগুলির উৎস সম্বন্ধে। যেমন (30 প্রকরণে) :

সোনা—উৎস পার্বত্য উপত্যকায় ও পর্বতের ঢালে। এগুলি হলুদ, লালচে হলুদ ও তামার মতো লাল। ওজনে খুব ভারি।

উৎসের বর্ণনা থেকে মনে হয় যে কোআর্ট্‌জ্‌ শিরার ভৌতবিকার (mechanical weathering)-এ উৎপন্ন টুকরোগুলির সোনার দানা বা প্রকীর্ণকই (placer) উৎস বলে বর্ণিত হয়েছে। রঙের বৈচিত্র্য থেকে বোঝা যায় যে শুধু ধাতব সোনা (native gold) নয়, বিভিন্ন সংযুতির অ্যালয়ও সংগৃহীত হতো। রুপোর অ্যামালগাম ছাড়াও সোনার সঙ্গে থাকতে পারে প্যালাডিয়াম, রোডিয়াম, তামা ইত্যাদি। লক্ষ্যণীয় যে সোনার আকরিকের গুরুত্ব (specific gravity) যে খুব বেশি সেটা জানা ছিল।

রুপা—রজত—আকরিকের বর্ণ শাঁখ, কর্পূর, মাখন কিংবা পায়রা, ঘুঘুর রঙের মতো, অথবা ময়ূরকণ্ঠী।……এগুলি মিশ্রিত থাকে সীসক অথবা লৌহের সঙ্গে। আকরিক যত ভারি তাতে ধাতুর অনুপাত তত বেশি।

এই সূত্র থেকে কৌটিল্যের যুগের মণিকবিদ্যা সম্বন্ধে দুটি তথ্য পাওয়া যায়—(ক) রুপোর বিভিন্ন মণিকের সঙ্গে পরিচয় ছিল, আর (খ) জানা ছিল গন্ধকীয় আকরিকের স্বাভাবিক অনুষঙ্গ (association)। এদেশে এখন রুপোর খনি বিশেষ নেই, রুপো যা ওঠে তা প্রধানত তামা ও সীসার সঙ্গে। সেক্ষেত্রে রুপোর বিভিন্ন মণিক নিশ্চয়ই এদেশের আকরিকে নয়। অবশ্য অর্থশাস্ত্রের যুগে*

* কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র নামে পরিচিত পুঁথিটির আবিষ্কর্তা শ্যামশাস্ত্রী। তিনি এবং ইয়াকবি (Jacobi), ভিনসেণ্ট স্মিথ, টমাস মেয়ার. হপ্‌কিন্‌স্‌, মোনাহান, জয়সবাল, নরেন্দ্রনাথ লাহা ইত্যাদির মতে চন্দ্রগুপ্তমৌর্যের কালে (খ্রীস্টপূর্ব 323-298) কৌটিল্য বর্তমান ছিলেন ! বিভিন্ন প্রচলিত কাহিনী থেকে অনুমান করা যায় চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেকের সময় কৌটিল্য পরিণতবয়স্ক ব্যক্তি।

ইন্দোনেসিয়ার সঙ্গে সমুদ্রপথে ব্যবসা বেশ ক-শতাব্দী ধরে চলে আসছে। বর্তমান আসামের মধ্য দিয়ে ব্রহ্মদেশের সঙ্গে যোগাযোগও রয়েছে। রুপোর আকরিক হয়তো প্রধানত বিদেশী, তবে রাজস্থানের জাওয়ার অঞ্চলেও হয়তো কিছু উঠত।

তামা—উৎস পার্বত্য উপত্যকায় আর পর্বতের ঢালে। এগুলি ভারি, তৈলাক্ত, নরম, সব্জে, কালো, নীলচে, হলদে, লালচে, কিংবা লাল। রঙ থেকে মনে হয় ম্যালাথাইট, অ্যাজিওরাইট, কুপ্রাইট ও চ্যালকোপাইরাইটের কথা জানা ছিল। উৎসগুলি সিংভূম, অগ্নিগুণ্ডলা, মালঞ্চখণ্ড, ক্ষেত্রী, অর্থাৎ এ যুগের পরিচিত তাম্র অঞ্চলগুলি হতে পারে। পূর্ববর্তী যুগে পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাতের দরুন আকরিক-শিরার উপরে ও ফাঁকে-ফোকরে রাসায়নিক বিকার (chemical weathering) ঘটে থাকার সম্ভাবনা। ম্যালাথাইট, অ্যাজিওরাইট, কুপ্রাইট তাই পর্বতের ঢালে আর পার্বত্য উপত্যকায় পাওয়া যেত বলা হয়েছে। তবে রাজগৃহে মগধের রাজধানী স্থানান্তরের আগে সম্ভবত সিংভূমের তাম্র অঞ্চলের কথা জানা ছিলনা। অন্যদিকে আবার মালঞ্চখণ্ডে একটি প্রাগৈতিহাসিক খাড়া কূপের (shaft, bore-hole) অস্তিত্ব নির্দেশ করে অতি প্রাচীন খনি-প্রযুক্তিবিদ্যার। যেমন মিশর ইথিওপিয়ার সব স্বর্ণবাহী কোআর্ট্জ্ শিরার সোনা নিঃশেষিত হয়েছে সেই প্রাচীন যুগেই তেমনি এদেশেও প্রাচীনযুগের তামার বেশির ভাগ উৎসই রিক্ত হয়ে গেছে বিদেশীদের আসার অনেক আগেই। যেহেতু ডেকান শিল্ডের প্রায় সর্বত্রই অল্পবিস্তর তামার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় শিলার উপর রাসায়নিক বিকারে উৎপন্ন ম্যালাথাইট এবং অ্যাজিওরাইটের কঠিন আবরণ (incrustation) থেকে, তাই মনে হয় এসব জায়গায় প্রত্নতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান চালালে তামার খনি-প্রযুক্তির অনেক অজানা তথ্য আজও উদ্ঘাটন করা সম্ভব।

লৌহ—এগুলি পাওয়া যায় এমন জায়গায় যেখানে শিলা মসৃণ (smooth feel), তার বর্ণ মাছের আঁশের মতো। তারই মধ্যে শুকনো রক্তের দাগের মতো রঙের শিলার সঙ্গে থাকে লোহার আকরিক। অর্থশাস্ত্রের চিত্রকল্প এই বর্ণনায় মসৃণ মাছের আঁশের মতো বর্ণের শিলা সহজেই চেনা যায় ফিলাইট বা মাইকা-সিস্ট্ বলে, আর রক্তের দাগের অনুরূপ শিলা যে জ্যাস্পার তা বুঝতে অসুবিধা হয়না। ঐতিহাসিকদের কারো কারো মতে রাজগীরে নতুন জনপদ গড়ে ওঠার কারণ বিহারের সিংভূমের লৌহ-অঞ্চলের সান্নিধ্য।[18] সিংভূমের আকরিকের

আক্ষরিক বর্ণনা মেলে এই স্থত্রে। স্পষ্টতই দক্ষিণবিহারে নূতন নূতন জনপদ গড়ে ওঠার কারণ সিংভূমে লৌহ নিষ্কাশন—সেযুগে যাকে বলা যেতে পারে শিল্প বিপ্লব।

টিন—আকরিকের বর্ণ ঘোলাটে সাদা, অথবা অতিদগ্ধ ইটের মতো।

প্রথমটি মনে হয় টিনের কোনো সাল্‌ফাইড, দ্বিতীয়টি ক্যাসিটারাইট। এখানে শুধু মণিকেরই বর্ণনা আছে, উৎসের কোনো বিবরণ নেই। তাই মনে হয় যে উৎস এদেশে নয়। আমদানি করা আকরিক ঠিকমতো চিনে নেবার জন্য যেটুকু দরকার, শুধু সেইটুকুই বর্ণিত হয়েছে।

সীসক—সীসকের আকরিকের গন্ধ পচা মাংসের মতো (sulphuretted hydrogen), তার মধ্যে সাদা সাদা রেখা। সাদা রেখাগুলি বোঝা যায় কার্বোনেটের বলে। এখানেও উৎসের কোনো পরিচয় নেই। তাহলে কি সেযুগের সীসকও আসত বাইরে থেকে ? কারণ ভারতে প্রাচীনতম সীসক উৎপাদনকারী অঞ্চলরূপে রাজস্থানের জাওয়ার অঞ্চলের খনি অনেক পরের যুগের (সম্ভাবত খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতকের)।

গন্ধকীয় মণিক যে বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে বিক্রিয়ায় বর্ণান্তরিত (tarnished) হয় তাও বলা হয়েছে অর্থশাস্ত্রে। বিশেষ করে তামা ও রুপোর মণিক সম্বন্ধে ব্যাপারটা আরো পরিষ্কার করে বোঝাতে গিয়ে বলা হয়েছে যে এর টুকরো ভাঙলে দেখা যায় যে ভিতরের রঙ বাইরের রঙের থেকে আলাদা। যেমন বলা হয়েছে : যাহা খণ্ডিত হইলে (বাহিরে) শ্বেতবর্ণ ও (মধ্যে) কৃষ্ণবর্ণ (কিংবা, বাহিরে) যাহা কৃষ্ণবর্ণ ও (মধ্যে) শ্বেতবর্ণ…ইত্যাদি (অনুবাদ : রাধাগোবিন্দ বসাক, 1950)।

আকরিক ছাড়া কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে অন্যান্য মণিকের মধ্যে রত্ন (gems), মুক্তা ও উপরত্ন (semi-precious stones)-এরও বর্ণনা আছে। যেমন রত্নের বর্ণনায় বলা হয়েছে যে এগুলি (ক) ষড়ভুজাকৃতি (hexagonal), ঘনক (cubic) কিংবা গোলাকার (equidimensional); (খ) গাঢ় রঙের ; (গ) স্বচ্ছ ; (ঘ) মসৃণ (smooth surface); (ঙ) অধিক আপেক্ষিকগুরুত্ব বিশিষ্ট ও (চ) উজ্জ্বল প্রভাবিশিষ্ট (splendent lustre)। রত্নের দোষের মধ্যে বর্ণনা আছে হাল্কা রঙ, .উজ্জ্বলতার অভাব, কণাময়তা (granularity), বুদ্বুদবহুলতা ও অন্তর্ভুক্তি (inclusion)-এর আধিক্যহেতু অস্বচ্ছতা। অর্থশাস্ত্রে মুক্তা, প্রবাল এবং আরও পাঁচ ধরণের মণিকের কিছু কিছু ভৌতধর্মের বর্ণনা এবং উৎস দেওয়া

আছে। বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায় এই বর্ণনার অনেকটাই সঙ্কলিত হয়েছে। যেহেতু এগুলি আধুনিক মণিকবিদ্যার আলোকে বিশ্লেষণ করা যায় না, সে জন্য গ্রন্থ বিস্তারের ভয়ে এখানে আলোচিত হল না।

4. 400-800 খ্রীষ্টাব্দ

খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে রত্ন ও উপরত্ন সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন বাৎস্যায়ন, আর ষষ্ঠ শতকে বরাহমিহির। বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতার বিশেষ কয়েকটি অধ্যায়ে ভূবিদ্যার কয়েকটি বিষয় নিয়ে পূর্ববর্তী আচার্যদের বর্ণনা ও মতবাদ আলোচনা করা হয়েছে। আবার অনেকসময় এইসব পূর্বাচার্যদের রচনা থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে প্রাসঙ্গিক অংশগুলি। তাই বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায় বর্ণিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে এখানে একটু বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

বরাহমিহির

উজ্জয়িনীর আদিত্যদাসের পুত্র বরাহমিহির (505-587 A. D.) প্রথম আর্যভট্টের শিষ্য। মগধের কাম্পিল্যনগরে তাঁর কর্মস্থল[20]। কাম্পিল্য (বৈদিক কাম্পিল, পালি কাম্পিল্ল) দক্ষিণ পাঞ্চালের রাজধানী[21]। গঙ্গার প্রাচীন খাতের ধারে এখনকার বদায়ুন আর ফারুখাবাদের মাঝামাঝি আছে এই সুপ্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ। এখানেই নাকি দ্রৌপদীর স্বয়ংবর অনুষ্ঠিত হয়েছিল (মহাভারত, আদিপর্ব, 138 অধ্যায় ; রামায়ণ, আদিকাণ্ড, 23 অধ্যায়)

জ্যোতির্বিদ, জ্যোতিষী ও গণিতজ্ঞরূপে পরিচিত বরাহমিহির। প্রচলিত কাহিনী অনুযায়ী বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের একজন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে জানা যায় বৃহৎসংহিতা, বৃহজ্জাতক, লঘুজাতক, পঞ্চসিদ্ধান্তিকা, বৃহৎবিবাহ-পটল, স্বল্পবিবাহপটল ও যোগযাত্রার কথা। বরাহমিহিরের গ্রন্থের প্রাচীনতম ভাষ্যকার দশম শতাব্দীর ভট্টোৎপল (বা উৎপল ভট্ট)।

বৃহৎসংহিতার যে অংশ আমাদের হাতে পৌঁছেছে তা শত অধ্যায়ে বিভক্ত। এই মহাগ্রন্থশেষে বরাহমিহির বলছেন—আমার বুদ্ধিকে মন্দার পর্বতের মতো ব্যবহার করে জ্ঞানসমুদ্র মন্থন করে সর্বসাধারণের বিশুদ্ধ জ্ঞানলাভের জন্য বিজ্ঞানের এই নিধি (শাস্ত্রশশাঙ্কঃ) উপস্থাপিত করলাম। পূর্বসূরীদের অবজ্ঞা করিনি। সৎপাঠক এই রচনা পূর্বাচার্যদের নিবন্ধের সঙ্গে পাঠ করুন ! (ভূমিকার প্রথম ছটি শ্লোকের প্রথম শ্লোক)।

যে প্রাচীন আচার্যদের উল্লেখ আছে তাঁরা হলেন: পরাশর গর্গ, বৃদ্ধ গর্গ (পুরাণবর্ণিত গর্গ—চতুর্থ অধ্যায়), কশ্যপ, নারদ, বিষ্ণুগুপ্ত, অসিত, দেবল, ঋষিপুত্র, ময়, বৃহস্পতি, শক, গরুত্মন্, সপ্তর্ষী, বভ্রায়ন, নগ্নজিৎ, সরস্বত, মনু, বিশ্বকর্মা, বজ্র, শ্রীদেব্যবর্ধন, ভরদ্বাজ, কপিল ও কনভুক্। এ তালিকার অনেক নামই ছড়ান আছে পৌরাণিক রচনায় বিভিন্ন জায়গায়। অর্থশাস্ত্রে কিন্তু পূর্বাচার্যদের নাম নেই। অথচ খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম ও খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের গ্রীক ও রোমক গ্রন্থে (যেমন গ্রন্থকার: Diodorus Siculus, 44 B.C ; Strabo, 7 B. C. ; Lucius Annacus Seneca, A. D. 3-65 ; Dionysius, A. D. 81-96 ; Arrianus, A.D.. 90 ; Tranquillus, A. D. 72-173 ইত্যাদি)[22] কিন্তু পূর্বাচার্যদের সিদ্ধান্ত বা মতবাদের আলোচনা শুরু হয়ে গেছে। সুতরাং অনুমান করা যায় যে বরাহমিহিরের রচনার আঙ্গিকে সমকালীন ইওরোপের প্রভাব পড়েছে। বোধহয় খ্রীষ্টীয় যুগের বেশ কিছু আগে থেকেই তক্ষশীলায় ইওরোপীয় ও ভারতীয় ভাবধারার বিনিময় যে ভালভাবেই শুরু হয়ে গিয়েছে, এটি তারই অন্যতম নিদর্শন।

বৃহৎসংহিতায় মণিকবিদ্যার আলোচনা আছে রত্ন পরীক্ষাধ্যায় (79), মুক্তালক্ষণাধ্যায় (80), পদ্মরাগলক্ষণাধ্যায় (81) ও মরকতলক্ষণাধ্যায়ে (82)[23]। 79 অধ্যায়ের 1-5 শ্লোকে অনেকগুলি মণিকের নাম আছে—ইন্দ্রনীল (sapphire বা নীলা), মরকত (emerald বা পান্না), কর্কেতর পদ্মরাগ (হাল্কা রঙের চুণী), বৈদূর্য (topaz), পুলক (কোনো সবুজ মণিক), বিমল (spinel), রাজমণি বা রাজবান্ (lapis lazuli বা রাজপট্ট), স্ফটিক (quartz), শশিকান্ত (labradorite, এক ধরনের plagioclase feldspar), শঙ্খ (?), মহানীল, মহারাগাখ্য, ব্রহ্মমণি, সস্তক, মুক্তা, প্রবাল, বিদ্রুম। তবে তাদের মধ্যে উৎকৃষ্ট চারটি: বজ্র বা হীরা, মুক্তা, পদ্মরাগ ও মরকত। যদিও অধ্যায়টির নাম রত্নপরীক্ষা, তবু এর প্রধান বিষয় হলো বজ্রপরীক্ষা, অর্থাৎ বজ্র বা হীরক চেনার পদ্ধতি।

রত্নপরীক্ষাধ্যায়

হীরকচেনার প্রধান সূত্র হিসাবে বলা হয়েছে: যদ্বজ্রং সর্বদ্রব্যভেদং ন কেনচিৎ শস্ত্রাদিনা অপি ভিদ্যতে। লঘু গৌরববর্জিতং·········(শ্লোক 14)। অর্থাৎ, হীরা নানা রকম, কিন্তু তার মধ্যে সেটিই শ্রেষ্ঠ যা কোনো কিছু দিয়ে কাটা যায় না। অর্থাৎ এই তালিকায় এমন কোন কোন মণিককেও হীরক বলে

তালিকাভুক্ত করা হয়েছে যাদের কাঠিন্য সর্বাধিক নয়। তাহলে সেসব মণিক হীরকের তালিকায় স্থান পেল কেন? সম্ভবত যে ভৌতধর্মের সাহায্যে হীরককে সনাক্ত করা হতো তা সর্বাধিক কাঠিন্য নয়, মণিকের আলোক বিচ্ছুরণ ক্ষমতা (শক্রচাপমিন্দ্রধনুঃ, 14)। অর্থাৎ মণিকের মধ্যে আলো পড়ে তা থেকে যদি রামধনু রঙ বেরোয় তবে তা হীরক। এ ছাড়া হীরক হবে স্নেহসংযুক্তম্ (greasy lustre), অথবা তড়িদ্বিদ্যুৎ অনলাগ্নি; ইত্যাদি। এগুলির প্রথমটি প্রভা (lustre), কিন্তু পরেরটি নিশ্চয়ই internal reflection। এ যুগের মণিকার cats' eye দেখাতে গিয়ে গ্রাহককে বলেন, ভাল করে দেখুন! এটা নাড়ালে ভেতরে একটা সাদা সুতো নড়তে দেখছেন! এটাই cats' eye পাথরটার বৈশিষ্ট্য। শুধু cats' eyeতে internal reflection নয়, বিশেষভাবে কাটার জন্য অনেক মণিকেই এরকম সুতো দেখা যায়, উচ্চ প্রতিসরাঙ্কের মণিক হীরকে তো দেখা যাবেই! আলোর এই সূত্রাকার রেখাটি আকাশের বিদ্যুতের মতোই চঞ্চল, তাই তড়িদ্বিদ্যুৎ কথাটার ব্যবহার। আকাশের বিদ্যুৎ কথাটা electricity অর্থে ব্যবহার হয়নি সংস্কৃতে বরং তার ব্যবহার ক্ষণপ্রভা অর্থে, দপ্ করে জ্বলে উঠে নিভে যাওয়া বোঝাতে।

6 শ্লোকে বলা হয়েছে হীরকের সাতটি আকরস্থান (source area):

বেণানদীতে দোষহীন বজ্র। এটিই শ্রেষ্ঠ হীরক, বোধহয় মধ্য ভারতের পান্না অঞ্চলের বিন্ধ্য সঙ্ঘের শিলা থেকে জাত উপলময় প্রকীর্ণকে।

কোশলদেশে শ্বেতপীত বর্ণ (light yellow), অনেকটা শিরীষফুলের মতো।

সৌরাষ্ট্রের হীরা তাম্র বর্ণের।

সৌর্পার দেশের (?) হীরা কৃষ্ণ বর্ণের।

হিমালয়ের হীরা তামাটে রঙের (? সৌরাষ্ট্রের সঙ্গে তুলনীয়)।

হাল্কা হলুদ রঙের মতঙ্গ দেশের হীরা।

হলুদ রঙের কলিঙ্গ দেশের হীরা।

নীলরঙের পৌণ্ড্রদেশের হীরা।*

---

* অর্থশাস্ত্রে ছ-টি অঞ্চলের নাম ছিল, এবং যে নামগুলি ছিল তার কোনোটির সঙ্গেই এই তালিকায় পাওয়া নামগুলি মেলেনা। অর্থশাস্ত্রের সঙ্গে বৃহৎ-সংহিতার কালের ব্যবধান প্রায় নয় শতাব্দীর। এই দুটি গ্রন্থে হীরকের উৎপত্তিস্থলরূপে চিহ্নিত অঞ্চলগুলি তুলনা করলে প্রশাসনিক গুরুত্ব কালের

লক্ষ্যকরা যেতে পারে শ্লোকে (6) সপ্তাকারস্থানলক্ষণং বলা থাকলেও এ তালিকায় কিন্তু আটটি অঞ্চলের নাম। একটি নিশ্চয়ই প্রক্ষিপ্ত, বরাহমিহিরের পরবর্তী কোন সময়ে, এমনকি ভট্টোৎপলের হাতেও হতে পারে।

এতো গেল উৎসস্থানের ভৌগোলিক অবস্থান, 10 শ্লোকে বলা হয়েছে ভূতাত্ত্বিক উৎস (geological mode of occurrence)।…… স্রোতঃ খনি প্রকীর্ণমিতি। প্রতিটি আবার বিশদভাবে বলা হয়েছে ঐ শ্লোকেরই পরবর্তী অংশে। স্রোতো যতো জলং স্রবতি, খনিঃ খন্যত ইতি খনি খ্যাতম্। প্রকীর্ণকং যস্যাং ভূমৌ মণয়ো ভবন্তি। সমুদ্রে যথা…ইত্যাদি। সুতরাং ভূতাত্ত্বিক উৎস জলপ্রপাত (জলং স্রবতির অন্য অর্থ হতে গেলে দাঁড়ায় ঝর্ণা), খনি (মণিক শিরা) এবং সাগরতট। তার মধ্যে প্রকীর্ণক বলা হয়েছে দু জাতের। স্রোতজাত (alluvial placer) ও সমুদ্রজাত (beach placer)। জলপ্রবাহের বেগ কোথাও হঠাৎ কমে গেলে মণিকের গুটি যে সেখানে জমতে থাকে তা স্থূলভাবে হলেও লক্ষ্য করেছিলেন তাঁরা। বোধহয় পরবর্তীকালের হাইড্রলিক মাইনিঙ-এর প্রযুক্তির উৎপত্তির ভিত্তি প্রকীর্ণকের উৎপত্তি সম্বন্ধে এই যুক্তিবাদী সিদ্ধান্ত। অর্থশাস্ত্রেও হীরকের তিনটি উৎসের কথা ছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে তৃতীয়টি প্রকীর্ণকের বদলে গজদন্তের মূলপ্রদেশ। তুলনামূলক বিচার করলে অর্থশাস্ত্রের কালের তুলনায় বৃহৎসংহিতার কালে মণিকবিদ্যায় উন্নতি স্পষ্ট বোঝা যায়।

হীরক সনাক্ত করার জন্য তার আপেক্ষিক গুরুত্ব, কাঠিন্য ও সঠিক প্রতিসরাঙ্কের উপর নির্ভর না করে গণ্য করা হয়েছে উচ্চ প্রতিসরাঙ্কের উপর নির্ভরশীল হীরকীয় প্রভা (adamantine lustre)। হীরকীয় প্রভাবিশিষ্ট মণিকের মধ্যে হীরা ছাড়া আছে কোরাণ্ডাম, ক্যাসিটারাইট, জারকন, রুটিল, সেরুসাইট, অ্যাঙ্গলেসাইট, ফসজিনাইট, সেরারজিরাইট, কুপ্রাইট, সিনাবার, টিটানাইট অক্টাহেড্রাইট ইত্যাদি। এগুলির বেশির ভাগ মণিকই সাধারণত অস্বচ্ছ। তবু বিশেষ বিশেষ অবস্থায় এদের কোনো কোনোটির স্বচ্ছ বা অর্ধস্বচ্ছ রূপ হতে পারে। স্বভাবতই এইসব মণিকের স্বচ্ছরূপ অস্বচ্ছ টুকরোর চেয়ে অনেক বেশি দুর্লভ, আর সেজন্য দুর্মূল্যও বটে। রত্নের অন্যতম প্রধান লক্ষণ দুর্মূল্যতাও। এভাবে

ব্যবধানে কীভাবে এবং কেন বিভিন্ন দিকে সঞ্চারিত হয়েছে তার ইঙ্গিত মিলবে এবং শুধু ভূবিদ্যার ইতিহাসই নয়, ভারতীয় ইতিহাসের অন্যান্য দিক সম্বন্ধেও কিছু নূতন তথ্য নির্দেশ করবে।

চিন্তা করলে বরাহমিহিরের বর্ণনামত উৎসস্থান ও বিভিন্ন বর্ণের হীরকগুলির একটা সন্তোষজনক ব্যাখ্যা মেলে। আজ হীরা চিনতে গিয়ে যেখানে দশমিকের পর পঞ্চমস্থান পর্যন্ত প্রতিসরাঙ্ক ও আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয় করা হয়, সেখানে এ গোলমাল হতেই পারে। বোধহয় এ ধরনের বিভ্রান্তি ক্রমশ কমে এলেও মুঘল আমল পর্যন্ত ছিল, কারণ গত শতাব্দীতে ভ্যালেন্টাইন বল তাভার্নিয়েরের ভ্রমণ-বৃত্তান্তের অনুবাদ করতে গিয়ে হীরকের উৎসাঞ্চল বলে (পরিশিষ্ট—খ) যে সব জায়গার উল্লেখ করেছেন তার ধারে কাছে হীরার অস্তিত্ব সম্ভব নয়।

মুক্তালক্ষণাধ্যায়

মুক্তা বা pearl ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের গুটি। কোনো বিশেষ ধরনের ঝিনুকের খোলার মধ্যে ঝিনুকের দেহ থেকে নিঃসৃত রস থেকে সৃষ্ট। অনুমান করা যেতে পারে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট সম্পর্কে আধুনিক রসায়নবিদ্যাসম্মত কোন ধারনা ছিল না। তাহলে মুক্তা নিশ্চয়ই চেনা হত অন্য কতকগুলি ধর্ম থেকে। সেই ভৌতধর্মগুলি বিশদভাবে বলা আছে এই অধ্যায়ে। মৌক্তিক প্রভা (pearly lustre), গোলকাকৃতি, আর আগুনে দগ্ধ হলে একটা সাদা ভস্ম উৎপাদন করার ক্ষমতা, এই তিনটি মুক্তার লক্ষণ। তাহলে যে কোন বস্তুর এই তিনটি ধর্ম থাকলেই তা মুক্তা বলে গৃহীত হবে বৃহৎসংহিতা অনুযায়ী।

মৌক্তিকপ্রভা ধর্মটির সুন্দর পরিচয় দেওয়া আছে 23 শ্লোকে:

শশিকান্তসপ্রভং চন্দ্রপ্রভাভং......মৎস্যাক্ষিনিভং মীননেত্রসদৃশং···ইত্যাদি। চাঁদের আলোয় যেমন ছায়া ছায়া ভাব, অস্পষ্ট, সূর্যের আলোয় যেমন স্পষ্ট তেমন নয়। উপমাস্বরূপ বলা হয়েছে মাছের অক্ষিগোলকের মতো। এ যুগের মণিক-বিদ্যা আমাদের শিখিয়েছে যে আরো অনেক মণিকেরই মৌক্তিক প্রভা আছে। যেমন প্ল্যাজিওক্লেজ ফেল্ডস্পার, তার এক বিশেষ রূপ চন্দ্রকান্ত মণি (moon-stone)। কিন্তু তা গোলাকার হয় না, আর পোড়ালে ভস্মও হয়না। তাই চন্দ্রকান্ত মণিকে মুক্তা বলা হয়নি কোথাও। তেমনি নাইলনের বোতামেরও আছে মৌক্তিক প্রভা। এই প্রভা সৃষ্টি হয় mother of pearl বলে একটি উপাদান থাকার জন্য। কোন বস্তুতে এই জিনিযটি থাকলে তাতে মৌক্তিক প্রভা থাকবে। বস্তুটি সাদা রঙের হলে ঠিক মুক্তার মতোই দেখাবে। আজকাল প্লাস্টিক দ্রবণ লাগিয়ে যে কোন বস্তুতে এই প্রভা ফুটিয়ে তোলা যায়। সলিউ-

শানটিকে চলতি কথায় বলে mother of pearl paint। কলকাতার ক'টি দুর্গা প্রতিমায় এই রঙের ব্যবহার প্রতিবছর বহু দর্শককে আকৃষ্ট করে।

মুক্তালক্ষণমধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে মুক্তা কোথায় কোথায় পাওয়া যায় সে সম্বন্ধে বলা হয়েছে : হস্তীসর্পশুক্তিশঙ্খমেঘবেণুবংশঃ তিমিসূকরেভ্য প্রসূতানি মুক্তাফলানি ভবন্তি। তেষাং সর্বেষাং মধ্যাং শুক্তিজং শুক্তিসম্ভূতং বহুসাধ্বতিশ্রেষ্ঠং ভবতি। লক্ষ্যণীয় যে শুক্তিজ মুক্তা, আজ যেটাই শুধু মুক্তো, তাকেই বলা হয়েছে শ্রেষ্ঠ। এবার অন্যগুলিকে দেখা যাক। শামুক ঝিনুক শঙ্খের খোলকের দেওয়ালে mother of pearl আছে। তাই সেগুলির নদীবাহিত গোলাকৃতি মসৃণ টুকরো মুক্তা বলে চিহ্নিত হতেই পারে।

সাপ মাছ হাতী ইত্যাদির মুক্তা কিন্তু রহস্য থেকেই যায়। এ বিষয়ে বেশ কিছুটা আলোকপাত হবে যদি মেরুদণ্ডী প্রাণীর অস্থিবিদ্যা ও অঙ্গবিদ্যার দিকে নজর দেওয়া যায়। মেরুদণ্ডী প্রাণী মাত্রেরই কানের নলের গোড়ায় (root of inner ear) ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের ছোট ছোট গুটি তৈরি হয়। জীববিদরা এগুলিকে বলেন otolith। বৃহৎসংহিতায় বর্ণিত মুক্তার তিনটি ধর্মই আছে otolith-এর। তাহলে, আচার্যদের পরীক্ষায় এগুলির মুক্তা বলে চিহ্নিত হতে বাধা নেই। প্রাণীদেহে আরো একটি জায়গা আছে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট জমার। দাঁতের গোড়ায়, ডেন্টিস্টরা যাকে বলেন পাথুরী (calculus)। সেটারও মৌক্তিক প্রভা। বুনো শুওরের সামনের দাঁত (incisor)-এর গোড়ায় এরকম গোলাকৃতি পাথুরী জমে, আর তা আকারে বড় হতে হতে একসময় বিচ্যুত হয়ে পড়ে যায়। এটাই বলা হয়েছে 23 শ্লোকের প্রথমাংশে, সূকরদংষ্ট্রামূলং যতো দংষ্ট্রোৎপন্নতে···।

প্রথম শ্লোকের উৎসের তালিকার মধ্যে একটি বেণুবংশঃ। এক বিশেষ ধরনের বাঁশ, তার ফাঁকা অভ্যন্তরে পর্বের গায়ে কখনো কখনো গোলাকার সামান্য উঁচু আঁচিল বা আব-এর মত একটি বস্তু জমে। তারও মৌক্তিক প্রভা। আর সেটা পোড়ালে মুক্তার মতোই সাদা ভস্ম উৎপাদন করে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট না হয়েও।

এবার উৎপত্তিস্থলের কথায় আসা যাক। 2 শ্লোকে মুক্তার আটটি উৎপত্তিস্থলের নাম আছে—পরলোক, সিংহল, তাম্রপর্ণী নদী, সৌরাষ্ট্র, পারশরোদেশঃ, কৌবেরীদেশঃ, পাণ্ড্যবাটকোদেশঃ, হৈম।*

* অর্থশাস্ত্রে মুক্তার উৎপত্তিস্থল বলে দশটি জায়গার নাম ছিল, তার মধ্যে বৃহৎ

পরলোক নিশ্চয়ই মৃত্যুপারের দেশ নয়, বাইরের দেশ অর্থাৎ বিদেশ। অর্থাৎ সে মুক্তা আমদানি করা মুক্তা। তা চীনের হতে পারে। রামায়ণে চীনাংশুকের (চীনা সিল্ক) কথা আছে। সুতরাং চীনের সঙ্গে যোগাযোগের প্রাচীনত্ব যে কতদিনের তা সহজেই অনুমেয়। আবার ভূমধ্যসাগরীও হতে পারে। ইথিওপিয়ার সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যসূত্রে তো বটেই, এমনকি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যোগাযোগ বরাহমিহিরের যুগে অন্তত 1200 বছরের প্রাচীন।[12] 17 শ্লোকে আছে মুক্তার বিভিন্ন ধরণ-এর বর্ণনা ও সেগুলির নাম (ত্রয়োদশানাং ধরণানাং পিকাদ্যাঃ সংজ্ঞাঃ ইত্যাদি। এই 'ধরণ' বলতে ঠিক কি বোঝানো হতো আকৃতি না আর কিছু তা কিন্তু শ্লোক থেকে বোঝা যায়না। অনুমানও করা যায়না বর্ণনা থেকে। 18-19 শ্লোকে আছে বিভিন্ন ধরণের মুক্তার দাম সোনার কার্ষাপণে ও রুপোর টাকা রূপম্-এ।

24-30 শ্লোকে আছে মুক্তার উৎপত্তি (origin)। তবে একমাত্র 24 শ্লোক ছাড়া অন্য কোনোটিতে আধুনিক অর্থে উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা হয়নি। 24 শ্লোকে মেঘজ মুক্তার কথায় বলা হয়েছে যেমন বৃষ্টি থেকে শিল (বর্ষোপল) তৈরি হয় তেমনি বায়ু থেকে শিল তৈরি হতে পারে, শিলের অবশ্য কাচিক প্রভা (vitreous lustre)। তবে মাঝে মাঝে বুদ্বুদ ঢুকে গিয়ে যখন শিল অস্বচ্ছ হয় তখন তার আর কাচিক প্রভা থাকে না, হয়ে যায় মৌক্তিক প্রভা। কিন্তু বায়ু থেকে তো আর মণিক তৈরি হতে পারে না! যতই শিল-এর উপমা দেওয়া হক! তাই মনে হয় মেঘজ মুক্তা বা বায়ুতাড়িত মুক্তা কোন মৌক্তিক প্রভাযুক্ত গোলাকার অখাদ্য ফল বায়ুতাড়িত হয়ে মানুষের হাতে পৌঁছত—যা বিষাক্ত বলে ফলরূপে পরিচিত হতে পারেনি। তারপর 31-36 শ্লোকে বর্ণনা আছে মুক্তার বিভিন্ন অলঙ্কারের।

81-82 অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে পদ্মরাগ ও মরকতের ভৌতধর্ম। এই বর্ণনাগুলি 79 অধ্যায়ের বজ্রের ভৌত ধর্মের ধাঁচে। উৎস সম্বন্ধে কিন্তু কোন কথা নেই। তাই মনে হয় যে এ দুটি মণিক এদেশে পাওয়া যেত না, আসত বিদেশ থেকে। আর সেগুলি যারা যাচাই করে নেবে (customs-এর মত কোন দপ্তর ছিল) তাদের ব্যবহারের জন্য রচিত হয়েছিল এই সূত্রগুলি।

---

[12]সংহিতায় দুটির নাম বাদ গেছে, অন্যগুলির মধ্যে কোন-কোনটার নাম বদলেছে। ঠিক হীরকের মতোই মুক্তার বর্ণনায় এই পরিবর্তনগুলিও সাধারণভাবে ইতিহাসের তথ্যরূপে তাৎপর্যপূর্ণ।

বৃহৎসংহিতায় শুধু বর্ণনা আছে অধাতব মণিকের, যার প্রধান ব্যবহার মূল্যবান অলঙ্কারে। শিল্পে ও ভেষজবিদ্যায় ব্যবহৃত মণিকের কথা কিছু আছে বাওয়ার পাণ্ডুলিপিতে (খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে) ও ভাগভটের (আনুমানিক খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী) রচনায়।

সব মিলিয়ে মণিকের সুদীর্ঘ তালিকা। তার অর্ধেকই এখন আর চিনে ওঠা যায়না। প্রায়ই বিভিন্ন অঞ্চলের একই মণিক বিভিন্ন নামে পরিচিত হতে দেখা যায়। এর মধ্যে রসায়নের ক্ষেত্রে আলকেমিস্টরা এসে গেছেন। বহু ক্ষেত্রেই তাঁরা কৃত্রিম যৌগ আর মণিকে গুলিয়ে ফেলেছেন।

4. 800—1200 খ্রীষ্টাব্দ

এ যুগের একটি মূল্যবান গ্রন্থ গরুড়পুরাণম্। তার রত্নপ্রবেশিকা অধ্যায়ে দেখছি বৃহৎসংহিতার মতো প্রধানত মাত্র একটি ধর্মের ভিত্তিতে মণিক চেনার বদলে আরো অনেকগুলি ধর্ম আলোচিত হয়েছে। যেমন :

আপেক্ষিক গুরুত্ব—গুঞ্জা কথাটা ব্যবহৃত হত স্থূলভাবে আপেক্ষিক গুরুত্ব বোঝাতে। গুঞ্জা অর্থ কুঁচ। যেমন, বলা হয়েছে একটি কুঁচফলের আয়তনের চুণী উৎকৃষ্টমানের হলে তার ওজন হবে 7 কুঁচ। পরবর্তীকালে আলবিরুণী (973-1048 খ্রীষ্টাব্দ) বেশ ক-টি মণিকের আপেক্ষিক গুরুত্ব নিরূপণ করেছিলেন।[25] গুঞ্জার মাপ থেকে মনে হয় গুরুত্বমাপক বোতল (specific gravity bottle)-এর মতো যন্ত্র ততদিনে ভারতীয় বিজ্ঞানে এসে গেছে।

কাঠিন্য—চুণী পরীক্ষার পদ্ধতি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে হীরা আর কুরুবিন্দ ছাড়া আর কিছু দিয়ে চুণীর গায়ে আঁচড় কাটা যায় না। হীরক যে কঠিনতম বস্তু তাও বলা হয়েছে।

কোন কোন মণিকের একই টুকরোর দুটি স্বতন্ত্র বর্ণের উল্লেখ আছে। ল্যাব্রাডোরাইটে এরকম ধর্মের কারণ অন্তর্ভুক্ত অস্বচ্ছ মণিকের কণা। বিভিন্ন দিক থেকে দেখলে কোন কোন মণিকের যে আলাদা রঙ দেখা যায় সেটা লক্ষ্য করা হয়েছিল এবং সেই সব বিশেষ মণিকের সনাক্তিকরণের জন্য বিশিষ্ট ভৌত ধর্ম বলে চিহ্নিত হয়েছিল।

গলনীয়তা—কোনো কোনো মণিক তাপের প্রভাবে খুব তাড়াতাড়ি গলে যায়। স্টিবনাইট চেনার অতি সহজ উপায় তার অল্প তাপমাত্রায় চট করে গলে যাওয়ার ক্ষমতা। গরুড়পুরাণে আছে বিভিন্ন মণিকের গলনীয়তার একটা তালিকা[26]।

একাদশ শতকে ভোজ বর্ণনা করেছেন হীরকের অনুপ্রভা (phosphorescence)।[25]

5. পরবর্তী যুগ

রসায়নবিদ্যার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মণিকবিদ্যারও উন্নতি ঘটেছে। বিভিন্ন মণিক সঠিক চেনার পদ্ধতি যেমন বেরিয়েছে তেমনি দরকার হয়েছে মণিকের শ্রেণীবিভাগের। ত্রয়োদশ শতাব্দীর বৈদ্যপতিসিংহগুপ্ত প্রণীত (বেনারস পাণ্ডুলিপি) রসরত্নসমুচ্চয় প্রধানত ধাতুবিদ্যা (metallurgy)-র বই হলেও তাতে আছে মণিকবিদ্যার একটি পূর্ণাঙ্গ পাঠক্রম। দুটি খণ্ডের এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডটি ভূমিকা। এখানে পূর্বাচার্যদের নাম আছে। দ্বিতীয় খণ্ডের নাম মহারস। মহারসের বিভিন্ন অধ্যায়—অভ্রক, মক্ষিক, বিমল, বৈক্রান্ত, অদ্রিজ, উপরস ইত্যাদি।

পরিসরের অভাবে এই গ্রন্থের সামগ্রিক আলোচনা সম্ভব হলোনা। উদাহরণ হিসাবে প্রথম অধ্যায়ে আসা যাক।

অভ্রককে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে—পিনাকম্, নাগমণ্ডুকম্ ও বজ্রম্। এদের প্রতিটি আবার চারবর্ণের—শ্বেত (বর্ণহীন মাস্‌কোভাইট), লোহিত (হাজারিবাগের রুবি মাইকা), হরিত (অন্ধ্রের নেলোর জেলার সবুজ অভ্র) ও কৃষ্ণ (বায়োটাইট)।

তেমনি মক্ষিককে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে—হিরন্ময় বর্ণ (চ্যালকোপাইরাইট) ও রজতবর্ণ (আরসেনোপাইরাইট)। বলা হয়েছে যে, যে-পর্বতে সোনা পাওয়া যায় সেখানেই পাওয়া যায় মক্ষিক। তাপ্তিনদীর বক্ষে আর কিরাত, চীনা ও যবনদের বাসস্থান মক্ষিকের উৎস। তাভার্নিয়ের বর্ণনা থেকে কিরাতভূমি যে উত্তর আসামের কোন অঞ্চল তা অনুমিত হয়। লক্ষ্য করা যেতে পারে যে অর্থশাস্ত্রের তুলনায় মণিকবিদ্যা কতটা এগিয়েছে।* এখন আর শুধু অনুষঙ্গ বা mineral association নয়, সোনার সঙ্গে sulphide minerals-এর association যা hydrothermal deposits-এর বৈশিষ্ট্য, তাই প্রতিফলিত হয়েছে রসরত্নসমুচ্চয়ে। গুরুমুখী বিদ্যারূপে এই বর্ণনার অতিরিক্ত কিছু বিদ্যা প্রচলিত ছিলনা—একথা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়না।

---

* বৃহৎসংহিতায় মণিরত্ন (gemstones and semiprecious stones) ছাড়া অন্য কোন মণিকের কথা নেই।

আবার বৈক্রান্ত (spinel) এর বর্ণনায় আছে—অষ্টফলক (octahedral), ষট্‌কোণী (hexagonal) তৈলাক্ত (greasy), ভারি আর অষ্টবর্ণের। ষট্‌কোণ দেখে মনে হয় যে দ্বাদশফলকের (dodecahdron)-এর প্রস্থচ্ছেদ (section)।

বিমল তিনরকমের—তাদের প্রভা সোনা, রুপা ও কাঁসার মতো।

শস্যক—তুঁতে, ময়ূরকণ্ঠী রঙের।

চপল চার রকমের—হলুদ, সাদা, লাল আর কালো।

রসক (calamine)—পত্রায়িত (foliated) গঠন, দর্দ্দুর (concretion) ও অপত্রায়িত (massive)। এই অপত্রায়িত রসকের নাম করবেল্লক।

অলঙ্কারে ব্যবহার্য মণিককে যেমন রত্ন ও উপরত্ন এই দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়েছে, ঠিক তেমনি সাধারণ মণিকের বেলাতেও দুটো ভাগ করা হয়েছে—রস ও উপরস। মাণিক্যের বেলায় শ্রেণীবিভাগের ভিত্তিটা ছিল বর্ণ, স্বচ্ছতা, কাঠিন্য ইত্যাদি। উপরসের ও রসের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে ঠিক কোন কোন ভৌতধর্ম ব্যবহৃত হতো তা বোঝা যাচ্ছেনা। তবে উপরসের মধ্যে আছে গন্ধক, গৈরিক (ochre), কাসীস (iron sulphate), তুবরী (ফটকিরি), তালক (orpiment), মনঃশীলা (realgar) ও কঙ্কুষ্ঠ (stibnite)। এগুলির প্রতিটির আবার শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে কখনো বর্ণ অনুযায়ী (যেমন : গৈরিক—পশম্ ও স্বর্ণ ; কাসীস—বালুকা ও পুষ্প ; গন্ধক—সাদা, হলুদ, লাল ও কালো), কখনো গঠন অনুযায়ী (তালক—পত্রায়িত ও গোলকাকার)। অঞ্জন বলতে একটা বিশেষ মণিককে বোঝানো হয়েছে কিনা বলা মুশকিল, কারণ অঞ্জন কথাটার অর্থ কাজল। এই অঞ্জন পাঁচরকমের স্রোতোঞ্জন, নীলাঞ্জন, পুষ্পাঞ্জন, রসাঞ্জন, কঙ্কুষ্ঠ।

এতো গেল উপরসের তালিকা। এরপর আছে সাধারণ রসের তালিকা (120-121)। এগুলি হলো কম্পিল্ল, গৌরীপাষাণ, নবসারক, কপর্দ, বহ্নিজার গিরিসিন্দুর, হিঙ্গুল, মৃদ্দারশৃঙ্গম্, এই আটটি। এগুলির প্রতিটির বর্ণনা আছে 122-132 শ্লোকের মধ্যে ছড়ানো। কোনো কোনোটির ভৌতধর্ম দেওয়া আছে (যেমন কম্পিল্ল, গৌরীপাষাণ ইত্যাদি) আবার কোনোটির উৎসস্থান (অগ্নি বা বহ্নিজারঃ, গিরিসিন্দুরম্ ইত্যাদি), আবার কোনোটির উৎপত্তির কারণ। এগুলির বর্ণনা থেকে কোনটি যে কি উদ্ধার করতে পারিনি বরং মনে হয়েছে এ বর্ণনায় আলকেমির প্রভাব পড়েছে। এই শ্লোকগুলিতে পূর্বাচার্যরূপে নাগার্জুনের

নাম আছে। মনে হয় এখনো বিদগ্ধ কোনো কবিরাজের কাছ থেকে এগুলির প্রকৃত পরিচয় উদ্ধার করা সম্ভব। এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করার মতো—সিনাবার বা হিঙ্গুলের আর এক নাম দরদ (দর্দ্‌-এর অপভ্রংশ)। পাঠকের মনে থাকতে পারে পিপীলিকাস্বর্ণের উৎসস্থল প্রসঙ্গে দর্দ্‌ নামে একটি উপজাতির কথা জানা গেছে রলিনসন ও শিয়ার্নি-এর বিবরণে[15]। সিনাবার উত্তর কাশ্মীরে চিত্রল অঞ্চলে অতি প্রাচীনকাল থেকেই সুবিদিত। অনুমান করা যায় যে পিপীলিকা স্বর্ণের প্রযুক্তি এখানকার প্রাচীন প্রযুক্তি।

সাধারণ রস, উপরস ইত্যাদি ব্যবহারযোগ্য (useful) মণিক। কিন্তু রস-এর মধ্যে অভ্র, বৈক্রান্ত তো ব্যবহারযোগ্য নয়! বিশেষ করে অভ্রকের মধ্যে বায়োটাইটের মতো কালো অভ্রক। তা সত্ত্বেও বায়োটাইটের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। তাই মনে হয় মণিকবিদ্যার তাত্ত্বিক (theoretical) অনুশীলনের প্রচলন ছিল। সম্ভবত বায়োটাইটের অস্তিত্ব দিয়ে কোনো কোনো শিলাকে সনাক্ত করা হতো। তেমনি বৈক্রান্তের দানার ত্রিমাত্রিক বর্ণনায় থাকার কথা দ্বাদশফলক। তাহলে যখন বলা হচ্ছে ষট্‌কোণী সেখানে শিলায় বৈক্রান্তের কেলাস যেভাবে দেখা যাবে তাই বলা হয়েছে।

রস উপরসের মতো রত্নের বর্ণনাতেও কিছু বৈচিত্র্য এসেছে। যেমন হীরককে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে :

পুরুষ : অষ্টফলক (octahdral), অত্যুজ্জ্বল, বিচ্ছুরণ প্রবল;

স্ত্রী : ধারগুলি চাপা, সাধারণত ভোঁতা;

দ্বিলিঙ্গী : ভোঁতা, হাল্কা।

এগুলির প্রতিটিকে আবার সৌন্দর্য অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। যেমন ব্রাহ্মণ—শাঁখের মতো সাদা বা স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ; ক্ষত্রিয়—খরগোসের চোখের মতো লাল; বৈশ্য—কলাপাতার মতো সবুজ ও শূদ্র—মরচেহীন তলোয়ারের মতো রঙ। এই শেষেরটি কৃষ্ণহীরক বা bort হতে পারে।

রসরত্নসমুচ্চয়ের পঞ্চম খণ্ডে আছে ধাতুর সাধারণ পরিচয়। বলা হয়েছে বিশুদ্ধ ধাতু তিনটি—সোনা, রুপা ও লৌহ। পূতিলোহা (অর্থাৎ দুর্গন্ধ যুক্ত ধাতু) দুটি সীসা ও টিন। সোনা পাঁচরকমের। তার মধ্যে তিনটির উৎপত্তি আধিদৈবিক, একটি খনিজ, অন্যটি স্বল্পমূল্যের ধাতু থেকে কৃত্রিম উপায়ে উৎপন্ন। রুপা তিন রকমের—আধিদৈবিক রুপা 'সহজ', খনিজ ও কৃত্রিম উপায়ে তৈরি।

তামা দু রকমের—নেপালের তামা ও ম্লেচ্ছদেশের তামা। টিন দুরকমের—সাদা, নরম, ঠাণ্ডা, সহজে গলনীয়, উজ্জ্বল 'ক্ষুরকম্' ও ময়লাটে রঙের 'মিশ্রকম্' (1-153)।

উপমহাদেশের ইতিহাসে রসরত্নসমুচ্চয় যে যুগে সঙ্কলিত হয়েছে সেযুগে আলকেমির প্রভাব বেশ ভালোভাবে এসে পড়েছে। প্রকৃত রসায়নবিদ্যা ধামা-চাপা পড়ে গিয়ে মানুষ তখন রাতারাতি ধনী হবার জন্য পরশপাথর খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। মনে হয় এজন্য নিরূপক মণিকবিদ্যা (Determinative Mineralogy)র অনুশীলন বিশেষভাবে ব্যাহত হতে শুরু করেছে। প্রচলিত সূত্রগুলির অবশ্য আলোচনা চলত ব্যবহারিক প্রয়োজনে। তবে ধর্মীয় রচনা নয় বলে, আর চতুর্বর্ণের মধ্যে আরো হাজার বৃত্তিগত বর্ণ আর গোঁড়ামি এসে পড়ায় শেষপর্যন্ত এসব পুঁথি পূজার ঘরে নির্বাসিত হয়, আর কাজটুকু চলতে থাকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া পেশাগত নৈপুণ্যে। গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা ও আয়ুর্বেদ ঠিক এভাবে অবহেলিত হয়নি।

ইসলামিক যুগের আলবিরুণির রচনা ও আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরীতে প্রচুর মণিকের কথা থাকলেও কিন্তু মণিকবিদ্যা সংক্রান্ত নতুন কিছু নেই। তবে আইন-ই-আকবরীতে মণিকের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটা অদ্ভুত দার্শনিক মতবাদ দেখা যায়। সংক্ষেপে এই বিবরণ বলি।

স্রষ্টা চারটি উপাদান সৃষ্টি করলেন—আগুন (সবচেয়ে গরম, শুকনো আর হাল্কা), বায়ু (আপেক্ষিক ভাবে গরম, আর্দ্র ও হাল্কা), জল (আপেক্ষিক-ভাবে শীতল, আর্দ্র ও ভারি), আর মাটি (সবচেয়ে ঠাণ্ডা, শুকনো ও ভারি)। এই চারটি উপাদানে তৈরি হলো চার রকম বস্তু—আসার-ই-উল্‌ভি (উচ্চাকাশে যাদের উৎপত্তি, যেমন বৃষ্টি, তুষার ইত্যাদি), পাথর, গাছপালা, জন্তু জানোয়ার। সূর্যের তাপে জলকণা হাল্কা হয়ে বাতাসে মেশে—একে বলে 'বুখার' (গ্যাস)। একইভাবে মাটির কণা বাতাসে মিশে উপরে ওঠে, তৈরি হয় 'দুখান' (বাষ্প)। কখনো আবার বায়ুকণা মেশে মাটির সঙ্গে। বহু দার্শনিক এ দুটাকেই বলেন বুখার। ···তাঁরা বলেন যে এই দুধরনের মিশ্রণই ভূ-পৃষ্ঠের উপর সৃষ্টি করে মেঘ, বায়ু, বৃষ্টি, আর ভূ-পৃষ্ঠের নিচে ভূকম্পন, মণিক, প্রস্রবণ ইত্যাদি। তাঁরা বুখারকে মনে করেন দেহ আর দুখানকে আত্মা বলে। এ দুটোর পরিমাণ আর উৎকর্ষতায় উৎপন্ন হয় বিভিন্ন বস্তু। এই থিওরির ভিত্তিতে এবার আসছে মণিক সম্বন্ধে আলোচনা ঃ

মণিক পাঁচ শ্রেণীর—যেগুলি শুষ্কতা হেতু কখনই গলে না (যেমন ইয়াকুৎ), যেগুলি নিজেই তরল বলে গলে না (যেমন পারদ), যা নমনীয় বা দাহ্য না হলেও গলে (যেমন নীল পাথর); যা নমনীয় নয় কিন্তু দাহ্য, আর গলে (যেমন স্টিবনাইট); যা নমনীয় কিন্তু দাহ্য নয়, আর গলে (যেমন সোনা)।[72] এই তালিকায় ইয়াকুৎ বলতে কি বোঝান হয়েছে উদ্ধার করা যায়নি।

বোধহয় গলা অর্থে যেমন উত্তাপের গলা (melting), ঠিক তেমনি জলে দ্রবীভূত হওয়াও বোঝানো হয়েছে। লক্ষ্য করা যেতে পারে যে প্রথম বা আদিম উপাদান মাত্র চারটি, সাঙ্খ্য-পতঞ্জল ধারার পঞ্চভূত নয়। সুশ্রুতে (অধ্যায় 41) যে পঞ্চমহাভূতের বর্ণনা বা সূত্র আছে, তার সঙ্গে এগুলি মেলেনা। এই চারটি উপাদানে যে চার শ্রেণীর বস্তু তৈরি হবার কথা বলা হয়েছে তাও বৈদিক দর্শন থেকে আসেনি। বরং এসেছে বিদেশ থেকে, কারণ এই বর্ণনা থেকে exhalation theory-র কথা মনে হয়।[22] তক্ষশিলায় গ্রীক ভাবধারার সঙ্গে ভারতীয় ভাবধারার অতবড় বিনিময় কেন্দ্র বেশ কয়েক শতক ধরে থাকলেও কিন্তু পরবর্তীকালের কোন সংস্কৃত গ্রন্থে এরকম কোন থিওরি নেই। আমার মনে হয় সাঙ্খ্যের পঞ্চমহাভূতের থিওরির সঙ্গে গ্রীক মতবাদের মিলন হয়েছিল আরবে, এবং তারপর আরব থেকে আসে এদেশে।

জাহাঙ্গীর-শাহজাহানের রাজত্বকালে মুঘলসাম্রাজ্যে ও তার আশপাশে বহু হীরার খনি ছিল। তাভার্নিয়ের বিবরণ থেকে এই খনিগুলি চেনার চেষ্টা করেছিলেন ভ্যালেণ্টাইন বল (পরিশিষ্ট—খ)।[28] এর মধ্যে বাঙলার একটি খনির কথা বলা হয়েছে যেটি বর্তমান পালামৌ জেলার কোয়েল নদীর উপর কোন জায়গা। তাছাড়াও আছে লোহারডগা জেলায় ব্রাহ্মণী নদীর উপনদী শাঁখ-এর বালুতে। এই তালিকা থেকে মনে হয় ভ্যালেণ্টাইন বল-এর সময়েও যেগুলি হীরক বলে চিহ্নিত হয়েছে তার সবগুলি হীরক নয়, অন্য কোন উচ্চ প্রতিসরাঙ্ক (high refractive index)-এর মণিক।

চার ঃ শিলাবিদ্যা

মানবসভ্যতার শুরু যে কালচার বা কৃষ্টিতে, তা প্রস্তরভিত্তিক। তাই সভ্যতার উষাকালে মণিকের তুলনায় শিলার উপর তার নির্ভরতা বেশি। শিলা সভ্যতার আদিম-যুগে পাথরের সমার্থক হলেও সব পাথরই প্রয়োজনের দিক দিয়ে সমান উপযোগী নয়। কোনটা বেশি শক্ত, আবার কোনটা নরম। শক্তটা ধারাল কিনার (edge) যুক্ত, কখনও কাচের মত ধারালো, মারণাস্ত্র বা ছেদনাস্ত্র বানাবার পক্ষে আদর্শ। নরমটা সহজে ছেন্স, বা প্রবর্ধনযোগ্য (processable), মূর্তি বানাবার ও ঘর সাজাবার কাজে ব্যবহারযোগ্য। হাতে দেখে এই দুই ধরনের পাথরের একটাকে অন্যটা থেকে আলাদা করতে গিয়ে উদ্ভব হলো পাথর তথা শিলা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর। ক্রমে শিলার দরকার হল বাড়ী তৈরীর কাজে আর যাঁতা বা পেষণযন্ত্রে। মানুষও ততদিনে যাযাবর জীবন ছেড়ে স্থায়ী বসতি গড়তে শুরু করে দিয়েছে। বিলাসের প্রয়োজনে এসেছে নানাধরনের মণিক। তখন কোন সময়ে শিলাকে চিহ্নিত করা গেল মণিকের পোষক (host) রূপে।

প্রাচীন রচনায় শিলা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু চোখে পড়েনা। অথর্ববেদ, অর্থশাস্ত্র ও বৃহৎসংহিতায় মণিক সম্বন্ধে যত কথা আছে, তার শতাংশও নেই শিলা সম্বন্ধে। তবে পাথরের কথা আছে ঋগ্বেদ থেকেই। সেখানে সোমলতা পেষণ করে সোমরস বার করতে সাহায্য করে বলে প্রস্তরদের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানানো হয়েছে। ঋগ্বেদেই বিভিন্ন জায়গায় বর্ণনা আছে অয়োপুরের। অয়োপুর কথাটার শব্দার্থ করলে দাঁড়ায় লৌহপুরী। এ যুগে লৌহপুরী বলতে যে ধারনা হয় ঋগ্বেদের লৌহপুরী কি সেরকম বা তার কাছাকাছি হওয়া সম্ভব? কোথায়ই বা মেগাওয়াটের মাপে বিদ্যুতশক্তি, আর কোথায়ই বা যান্ত্রিক বল (mechanical power)! শহর বানাবার মত অত লোহা বানান হবে কীভাবে! তাই শুধু শব্দার্থ ধরে আয়োপুরের কষ্টকল্পনার চেয়ে বরং সম্ভাব্য মনে হয় লোহার মতো

কোন কঠিন বস্তু ধরে নিলে। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে মণিকবিদ্যার আলোচনা প্রসঙ্গে অয়স্ কথাটা যে একটা শব্দমূল তা দেখান গেছে।

লোহার মতো কঠিন কোন্ সেই বস্তু যা দিয়ে পুরী নির্মাণ সম্ভব? এর উত্তরে যেটার কথা স্বভাবতই মনে হয় তা হল শিলা। কাঁচা লোহার মতো দেখতে বেশ ক-রকম শিলা দেখা যায় পশ্চিম ভারতে। দুর্গ, প্রাসাদ আর মন্দির নির্মাণে এগুলির ব্যবহার ছিল মুঘল যুগের শেষপর্যন্ত। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায় আলোয়ার কোআর্ট্‌জাইটের। বর্ণে পেটা-লোহার মত এই শিলায় রাজস্থানের বহু প্রাসাদ আর মন্দির তৈরি। অন্যটি বিন্ধ্যযুগের লালচে বেলেপাথর। দিল্লীর লালকেল্লা আর বিহার-উত্তর প্রদেশের বহু দুর্গ তৈরি এ-পাথরে। শিলাটার লালচে রঙটা মরচের মতো। তাই থেকে লোহার প্রতিশব্দ অয়স এসেছিল কিনা কে বলতে পারে! তবে এই দুধরণের শিলার ব্যবহার উপমহাদেশের কোন নিজস্ব পদ্ধতি নয়! মধ্যপ্রাচ্য ও পূর্ব আফ্রিকার প্রাচীনতম সভ্যতার নিদর্শনগুলিতে অনুরূপ শিলার ব্যবহার আছে।

বৈদিক যুগে সেরকম কোন ইমারতের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া না গেলেও পাথর যেসব জায়গায় কাটা ও পালিশ করা হতো সেরকম কয়েকটি কর্মশালা আবিষ্কৃত হয়েছে। পরবর্তীকালে, পাঠান ও মুঘলযুগে যেসব জায়গায় এধরনের ইমারতী শিলা (building stone) খোঁড়া হতো (যেমন উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুর জেলায়), সেসব জায়গায় এই কর্মশালাগুলির চিহ্ন এখনো আছে। যতদূর জানি C^{14} বিশ্লেষণ করে এগুলির কোনটারই বয়স এখন বার করা হয়নি। অবশ্য C^{14} বিশ্লেষণ করতে গেলে তাৎকালিক কিছু জৈব অবশেষ থাকা চাই। ধাতু নিষ্কাশনের চুল্লীতে পোড়াকাঠ এব্যাপারে সাহায্য করলেও সাধারণ শিলা-প্রবর্দ্ধনশালায় এরকম অবশেষ না থাকারই কথা। তবে প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার শিলা প্রবর্দ্ধন কর্মশালা (rock processing workshop)-এর সন্ধান মিলেছে কর্ণাটকের কোলার অঞ্চলে। ডেভিডসন C^{14} বিশ্লেষণের রিপোর্ট উল্লেখ করে বলছেন এগুলি খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় ও চতুর্থ সহস্রকের।[29] ইমারতীশিলা নয়, ধাতুবিদ্যার সঙ্গে এগুলি যুক্ত। প্লিনি মিশরের ফ্যারাওদের এবং রাজা সলোমনের সোনার সরবরাহকারী অঞ্চল সম্বন্ধে বলেছেন, জায়গাটা 'নরি'-দের দেশ (land of Narae)। রুগিন ব্রাউন ও দে ডেভিডসনের হিসাব থেকে মনে করেন 'নরি' আসলে নায়ার—দক্ষিণভারতের একটি অতি সাধারণ পদবী। অর্থাৎ ফ্যারাওদের সোনার উৎস কোলারের স্বর্ণখনি অঞ্চল। উত্তরভারতে যখন

পিপীলিকা স্বর্ণ, দক্ষিণভারতে তখন স্বর্ণময় কোআর্ট্জ্ শিরা (auriferous quartz vein) বিচূর্ণিত করে তা থেকে সোনা সমাহরণ পদ্ধতি ভালোভাবে প্রচলিত ছিল।

তাহলে কি মণিক যেমন অভিজাত মহলে গৃহীত হয়েছিল, শিলা ঠিক সেভাবে স্থান করে নিতে পারেনি? হয়তো তাই, কারণ মণিক চেনার জন্য যেমন তার বিভিন্ন ধর্মের আলোচনা সূত্রবদ্ধ হয়েছে অর্থশাস্ত্র থেকে রসরত্নসমুচ্চয় পর্যন্ত প্রায় দেড়হাজার বছর ধরে শিলা সম্বন্ধে সেরকম কিছুই চোখে পড়েনি এক বাস্তুবিদ্যার প্রসঙ্গে ছাড়া। অর্থাৎ শিলা সনাক্তিকরণের পদ্ধতি সীমাবদ্ধ ছিল শুধু শিলা ব্যবহারকারীদের মধ্যে। এরা হল বাস্তুকার আর বাস্তুবিদ, আর অন্যদিকে খনিবিদ। এরা বোধহয় প্রধানত অনার্য ছিল। প্রাক্-আর্য সভ্যতার প্রধানতম কৃতিত্ব যে বাস্তুবিদ্যা, তার ছাপ রয়েছে সিন্ধু ও প্রাক্-সিন্ধু সভ্যতার সর্বত্র। বোধহয় আর্যদের শিলা সম্বন্ধে অনীহা এ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় আলোচনার অভাবের কারণ। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয়-তৃতীয় শতক থেকে কাব্য-উপন্যাসে 'অসুর বিবর' কথাটার প্রাচুর্য চোখে পড়ে। বিশেষজ্ঞদের মতে এগুলি পরিত্যক্ত খনি-সুড়ঙ্গ (mining tunnels)। যুধিষ্ঠিরের রাজসভা বানাবার জন্য যখন দরকার পড়ল তখন ডাকতে হল ময়দানবকে। ময়দানব চরিত্রটি আর্যরূপে বর্ণিত হয়নি কোথাও। তাই খনিবিদ্যার মতো বিশেষিত প্রযুক্তি (specialized technology)-এর ক্রমবিকাশের পিছনে দীর্ঘকালের গবেষণার ছাপ থাকলেও বৈদিক সাহিত্যে, এমনকি পরবর্তীকালের রচনায় তার কোনো নিদর্শন নেই। তার উপর বর্ণাশ্রমের দরুণ এদের আহরিত ও গবেষণালব্ধ তথ্য পেশাগত গুপ্তবিদ্যায় (trade-secret -এ) রূপান্তরিত হয়ে গুরুমুখী বিদ্যারূপে সঞ্চারিত হয়েছে বংশানুক্রমে, কিন্তু কোথাও কোন শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষাদানের উপযুক্ত বিষয়রূপে বিবেচিত হয়নি। কালক্রমে, বিশেষ করে পাশ্চাত্য প্রযুক্তির স্রোতে আজ তা সম্পূর্ণ হারিয়ে গেছে। পরোক্ষভাবে সেগুলি সম্বন্ধে ভাসা ভাসা ধারনা করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই বিচার করার।

পরোক্ষনিদর্শন থেকে শিলা-অনুশীলনের তিনটি ধারা পাই—বিশিষ্ট আকার, আকৃতি ও উৎপত্তির জন্য যে শিলাগুলিতে অপ্রাকৃত সত্বা আরোপ করা হতো, নির্মাণকার্যে ব্যবহারযোগ্য ইমারতী শিলা নির্বাচন; আর তৃতীয়ত যে শিলার মধ্যে মূল্যবান মণিক পাওয়া যেত তা থেকে সেই দুর্লভ মণিক সংগ্রহ করবার পদ্ধতি।

শিলায় আরোপিত অপ্রাকৃত সত্ত্বা

ঋগ্বেদের যাযাবর জীবনে মানুষ পাথরকে প্রণাম করত কারণ তা সোমলতা পেষণে সাহায্য করে বলে। প্রাক্-আর্য সভ্যতায় কিন্তু পাথরের পূজা ছিল দেবতারূপে। ভাস্করের স্পর্শবিহীন দেবতার মধ্যে তিনটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

স্ট্যালাগমাইট—শিবলিঙ্গরূপে পূজিত। কলকাতার কাছাকাছির মধ্যে এরকম শিবলিঙ্গের নিদর্শন সাসারামের কাছে কৈমুর শ্রেণীতে রোটাস চুণাপাথরে গুপ্তেশ্বর গুহার শিবলিঙ্গ।

চুণাপাথর ও মারবেল-এ ভূজলের ভূতাত্ত্বিক ক্রিয়ায় সৃষ্টি হয় নানান বৈচিত্র্যের। অনেকটা জায়গা জুড়ে এই সব শিলা কোথাও দ্রবীভূত হয়ে আবার কোথাও দ্রবীভূত ক্যালসিয়াম কার্বোনেট অবক্ষিপ্ত হয়ে তৈরি হয় গ্রটো (grotto)। অবক্ষিপ্ত ক্যালসিয়াম কার্বোনেট অনেক সময় দুটি বিশেষ রূপ ধারণ

Fig 4.1. চুণাপাথরের গুহায় প্রাকৃতিক কারণে সৃষ্ট শিবলিঙ্গের অনুরূপ শিলাবৈচিত্র্য।

করে। ক্যালসিয়াম কার্বোনেট দ্রবণ গুহা ও সুড়ঙ্গে উপর থেকে চুঁইয়ে নামার সময় এই দ্রবণ ভেঙে (decomposed হয়ে) গিয়ে ছাদ থেকে ঝুল-এর মতো সরু সরু ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের অধঃক্ষেপ স্ট্যালাকটাইট যেমন উৎপন্ন হয়

একদিকে অন্যদিকে তেমনি গুহার মেঝেতে ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের অধঃক্ষেপ জমে জমে গড়ে ওঠে স্ট্যালাগমাইট। এই স্ট্যালাগমাইটই পূজিত হয়ে থাকে শিবলিঙ্গরূপে। স্বয়ম্ভু নামটাও এই ধারনার সমর্থক। পরে স্ট্যালাগমাইটের মডেলেই তৈরি হয়েছে লিঙ্গমূর্তি। এর উৎপত্তি বোধহয় হিমযুগে গুহাবাসের সঙ্গে জড়িত। প্রাক্-আর্য জনপদের ধ্বংসাবশেষ-এ শিবলিঙ্গের প্রচুর নিদর্শন।[6]

গাঢ়বর্ণের শিব—লক্ষ্যণীয় যে স্ট্যালাগমাইট যে লিঙ্গমূর্তি, তার রঙ সাদা। কিন্তু আরো এক ধরনের লিঙ্গমূর্তিও প্রচুর দেখা যায়। সেগুলি গাঢ় রঙের (dark coloured)। কারো কারো মতে গাঢ়বর্ণের লিঙ্গমূর্তিও খুব প্রাচীন, এবং প্রাক্-আর্য সুপ্রাচীন প্রাচ্যের[7] উত্তরাধিকার। এটির উল্কাপিণ্ড হবার সম্ভাবনা অত্যন্ত প্রবল। দেবতারূপে উল্কাপিণ্ডের পূজা প্রচলিত ছিল অনেক প্রাচীন সভ্যতায়। এমন কি, কারো কারো মতে মক্কার 'কাবা'ও উল্কাপিণ্ড।[30]

পটহোল—গৌরীপট্টে শিবলিঙ্গের ধারনা। পার্বত্য শিলাময় অঞ্চলে নদীগর্ভে বালুর আবরণের বদলে থাকে কঠিন সংসক্ত শিলা (coherent rock)। সেখানে শিলার কাঠিন্যের কমবেশিতে তা কোথাও কম কোথাও বেশি ক্ষয় হয়। ফলে তৈরি হয় জলপ্রপাত। এই জলপ্রপাত যেখানে কঠিন শিলার উপর আছড়ে পড়ে সেখানে জলবাহিত নুড়ির আঘাতে ধীরে ধীরে তৈরি হয় একটি খাড়া গভীর গর্ত। এই গর্তকে বলে পটহোল (pothole)। পটহোল একটু গভীর হলেই
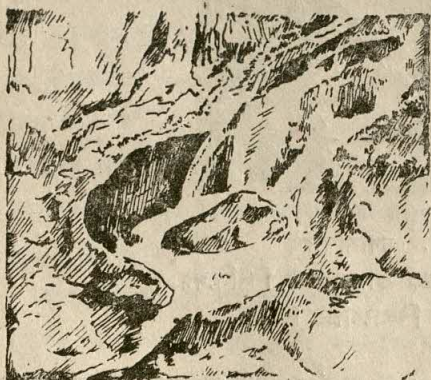
Fig. 4.2. নদীবক্ষে 'পটহোল' ও পটহোল-এ আটকা-পড়া শিলাখণ্ড।
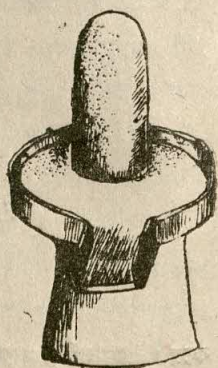
Fig. 4.3. গৌরীপট্টে শিবলিঙ্গ।

তাতে একটা বড় নুড়ি বা অনেক সময় একগাদা নুড়ি আটকে যেতে পারে। জলের টানে এই নুড়িগুলি ঘুরতে থাকে, আর ঘূর্ণ্য-ছিদ্রণের (rotary drilling-এর) অনুরূপ একটা প্রক্রিয়ায় পটহোলের গভীরতা ক্রমে বেড়েই চলে। কোনো কারণে নদী শুকিয়ে গেলে আটকে-থাকা নুড়িসুদ্ধ এই পটহোল নদীগর্ভে প্রকাশিত হয়। স্ট্যালাগমাইটের মতোই পটহোলও আপনাআপনি সৃষ্টি হয়ে ধীরে ধীরে বড় হয়। তবে স্ট্যালাগমাইটের মতো পটহোল ও তার ভিতরের নুড়ি শুধুমাত্র কার্বোনেট শিলায় সীমাবদ্ধ নয়, যে কোনো শিলায় তার উদ্ভব হতে পারে। তাই পটহোল যে কোনো বর্ণের হতে পারে। পটহোল উপদ্বীপ ভারতে ক্ষীণ-স্রোতা প্রাচীন নদী (mature বা old river)-এর শিলাময় বক্ষে প্রচুর দেখা যায়। সুবর্ণরেখা, নর্মদা, তুঙ্গভদ্রা ইত্যাদি নদীগুলিতে পটহোলের প্রাচুর্য। গৌরীপট্টে শিবের পারিসাংখ্যিক প্রাচুর্য কোনদিকে বেশি, আর্যাবর্তে, না দাক্ষিণাত্যে তা যাচাই করে দেখলে বোধহয় এ বিষয়ে আলোকপাত হবে।

জীবাশ্ম—জীবাশ্ম বা fossil-এর প্রকৃত তাৎপর্য বোধহয় প্রথম বিজ্ঞানসম্মত ভাবে বিবৃত হয় লিওনার্দো দা ভিঞ্চির নোটবইতে।[31] কিন্তু একটি বিশেষ ধরণের জীবাশ্ম শালগ্রাম শিলারূপে এদেশে পূজিত হয়ে আসছে বহুকাল। শালগ্রাম শিলার বর্ণনা পৌরাণিক অভিধানে দেখছি—গণ্ডকী নদীজাত বজ্রকীট* কর্তৃক চক্রযুক্ত যে শিলা পাওয়া যায় তাকে শালগ্রাম শিলা বলে। বলা হয়েছে হিমালয়ের দক্ষিণে ও গণ্ডকী নদীর উত্তরে দশযোজনব্যাপী বিস্তীর্ণ মহাক্ষেত্রে বিষ্ণু শালগ্রাম শিলায় পরিণত হন। আঠারো রকমের শালগ্রাম শিলা আছে গঠন ও লক্ষণ অনুসারে। লক্ষণ বলতে বলা হয়েছে ছিদ্রদ্বার, চক্র, চিহ্ন, আকার, বর্ণ এবং ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি। বাঙলাভাষায় আকার (size) ও আকৃতি (shape)-এ প্রায়ই গোলমাল করে ফেলা হয়। গণ্ডকী নদীতে যে শালগ্রাম শিলা পাওয়া যায় তার প্রতিটি একটি সেফালোপড-এর জীবাশ্মর চারদিকে লৌহ-অকসাইড জমে সৃষ্ট গুটি (concretion)। শামুকজাতীয় এই প্রাণীটির জীবাশ্ম জুরাসিক উপকল্পের একটি স্তর ট্রোপাইটিস বেড-এ আছে প্রচুর পরিমাণে— নদী প্রবাহের ধাক্কায় বিচ্যুত হয়ে গণ্ডক ও স্পিটি নদীর বক্ষে এগুলি নুড়ির সঙ্গে হাজির হয়। জীবাশ্ম-বিদের ভাষায় ছিদ্র হলো নাভি বা umbilicus, চিহ্ন suture line, আকৃতি

---

* ঘুণপোকা। সেফালোপড বা শামুকজাতীয় প্রাণীর খোলকের অভ্যন্তরে প্রাণীটিকে যে এঁরা ভালো করেই লক্ষ্য করেছিলেন তার প্রমাণ এই বর্ণনা।

বোঝাতে গোল (convolute) বা চ্যাপ্টা চক্রাকৃতি (discoidal), চক্র বলতে মনে হয় whorl ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে। একটি পৌরাণিক গল্প আছে বিষ্ণুর শালগ্রাম শিলায় পরিণত হওয়া সম্পর্কে[৩২]। তাতে বিষ্ণু বলছেন বজ্রকীট ও কৃমি ইত্যাদি আমার শিলার ভিতরে চক্র কর্তন করবে। বস্তুত বিভিন্ন whorl এর মধ্য দিয়ে ছিদ্র কেটে সেফালোপোডের প্রাণীটি বড় হতে থাকে।

শালগ্রাম শিলা সম্পর্কে প্রথম বর্ণনা পাই ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে। এটি পরবর্তী-কালের রচনা। কিন্তু এই বর্ণনায় যে অঙ্গসংস্থান (morphology) বিবৃত হয়েছে তা কিন্তু সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত। ভারতীয় অধ্যাত্মদর্শনে সামান্য কীটপতঙ্গ বালুকণা থেকে শুরু করে সব কিছুতেই প্রাণের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে।

Fig. 4.4.a. সীতা মাঈকি চীরাগ।

Fig. 4.4.b. হিল্ডোসেরাস (Hildoceras) নামে এই শামুক (cephalopod) জাতীয় প্রাণীর জীবাশ্মটি সর্পভয় নিবারণে ব্যবহৃত হতো। কার্যকারিতা বাড়াবার জন্য এর মাথার দিকটায় সাপের মাথা খোদাই করে দেওয়া হতো। Shackley (1977) এইরকম কটি জীবাশ্মের ছবি দিয়েছেন তাঁর গ্রন্থে।

জানিনা কোন রসায়নে এমন বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ধর্মীয় সংস্কারে রূপান্তরিত হয়ে ভক্তির জোয়ারে পথভ্রষ্ট হলো, কারণ সংস্কৃত রচনায় আর কোথাও শালগ্রাম কিংবা অন্ত কোনো জীবাশ্মের কথা পাইনি। মধ্যযুগে ইওরোপে যখন জীবাশ্মের বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব ধর্মীয় প্রভাবের আওতার বাইরে বেরিয়ে প্রতিষ্ঠালাভের জন্য প্রহর গুণছে এদেশে তখন মুঘল সাম্রাজ্যের প্রভাব বিস্তৃত হচ্ছে। উপমহাদেশের যেসব অঞ্চলে জীবাশ্মের প্রাচুর্য সেসব জায়গায় মানুষের যাতায়াত বাড়লেও তা মননশীল মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। তামিলনাড়ুর আরিয়ালুর অঞ্চলে পাওয়া সিডারিস (cidaris) নামে একটি জীবাশ্ম 'সীতামাঈকি চীরাগ' নামে প্রচলিত হয়েছিল উত্তরাপথের সাধারণ মানুষের মধ্যে (চিত্র 4.4a), সম্ভবত তাদের তীর্থযাত্রার পথে।

অন্ত দেশে প্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক ও ঐতিহাসিক সভ্যতায় কিন্তু আরো বহু জীবাশ্ম এসেছে, শালগ্রাম শিলার মতো পূজনীয় রূপে না হলেও ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে স্বাস্থ্য কামনায় কিংবা বিপদ ভঞ্জনের জন্য।[33] ভারতীয় জ্যোতিষ ও তন্ত্রশাস্ত্রে জীবাশ্মের উল্লেখ সেরকম ভাবে না দেখতে পেয়ে বিস্মিত হয়েছি। আমার মনে হয় উপদ্বীপভারতে এবং সিন্ধু গাঙ্গেয় সমভূমিতে যেখানে মানুষের ঘনবসতি, সেসব জায়গায় জীবাশ্মবাহী স্তরের অভাব সাধারণভাবে এর কারণ।

নির্মাণকার্যে ব্যবহৃত শিলা

সংসক্ত শিলা (coherent rock)-এর প্রধান ব্যবহারিক প্রয়োগ বাস্তু-বিদ্যায়। পারসি ব্রাউনের মতে ভারতে শিলার ব্যবহার শুরু হয় খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে।[34] অবশ্য বৈদিক সাহিত্যের বলতে গেলে শুরু থেকেই (দ্রঃ অয়োপুর—ঋগ্বেদ) পাথরের তৈরি প্রাসাদ এবং নগরীর বিবরণ আছে। যাই হোক শিলা তোলা হতো খনিতে খনন করে, তাকে ঘষে মেজে চৌকো কিংবা সমবাহু ষড়ভুজ (equilateral hexagon)-এর রূপ দেওয়া হতো শিলা কর্মশালায়। একেবারে শুরুতে শিলা খনন কীভাবে হতো তার কোনো নিদর্শন নেই কোনো বিবরণ কিংবা কোনো ধ্বংসস্তূপে। তবে মনে হয় আর সব দেশের মতো ভারতেও ইমারতী শিলার খণ্ডগুলি ছিল এবড়োখেবড়ো অনিয়তাকারের (irregular shape and size)। যে সময় থেকে মন্দির প্রাসাদ ইত্যাদির ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যাচ্ছে তখন থেকেই শিলাখণ্ডগুলি নিয়তাকারের, এবং মোটামুটি সুষমভাবে কাটা।

ব্রাউনের মতে খননবিদ্যায় নতুন টেকনিকের আমদানি হয় অশোকের সময়

গ্রীক-পারসীয় সভ্যতা থেকে। এটা খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের কথা। কর্ণাটক রাজ্যের ধারোয়ার অঞ্চলের শিলাখনিতে অসমাপ্ত (unfinished) বহু শিলাখণ্ড থেকে খনন পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছুটা ধারনা করা যায়। যেসব শিলা স্তরিত (bedded তাতে দুটি স্তরের সংযোগ বরাবর ছেনি দিয়ে গর্ত করা হতো। পরপর করা গর্তগুলোতে রোদে শুকানো কাঁচা (unseasoned) কাঠের গজাল হাতুড়ি মেরে আঁট করে পুরে দেওয়া হতো। তারপর গজালগুলি ভালো করে ভিজিয়ে দেওয়া হতো জলে। জল শুষে নিয়ে কাঠের গজাল ফুলে উঠত, আর তার ফলে সৃষ্টি হতো প্রচণ্ড চাপ। এই চাপে চারপাশের শিলা যেত ফেটে। স্তরিত শিলার মতো পত্রায়িত (foliated) শিলাও এইভাবে বিদারণ করা হতো। আরো পরে বেসল্টের মতো অপত্রায়িত বা অস্তরিত শিলার দারণ (joint)-এ কাঠের গজাল পুরে এই একই ভাবে বেসল্টের চাঙড় বার করা হতো। গজাল তৈরির জন্য বিশেষ বিশেষ কাঠের কথা বলে গেছেন বরাহমিহির পরবর্তীকালে [23]। কাঠ ও গাছের পাতা জমা করে জ্বেলে পাথর গরম করে ও পরে জলে ভিজিয়ে চটপট ঠাণ্ডা করে শিলা বিদারণের কথাও বলেছেন বরাহ-মিহির। বিশেষ বিশেষ গাছের পাতা ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সম্ভবত তাপমাত্রা বাড়াবার জন্য। এ দুটি পদ্ধতিই আজও ভারতের বহু জায়গায় ছোট ছোট খনিতে শিলাখননের দেশজ পদ্ধতি রূপে প্রচলিত আছে। যেমন দেখা যায় বাঙ্গালোরের অনতিদূরে 'পেনিনসুলার নাইস' শিলায়।

প্রাসাদের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ধরনের পাথরের ব্যবহারও বহুদিনের পুরানো। সাধারণত মন্দির এবং প্রাসাদের অন্দরমহলের মেঝে তৈরী হত সাদা মার্বেল-এ। যেখানে সম্পূর্ণ সাদা মার্বেল সুলভ নয় সেখানে দাগী পাথরকে বসানোর মধ্যে জ্যামিতিক প্যাটার্ন তৈরির প্রয়াস দেখা যায়। দুর্গ, দপ্তর ইত্যাদির মেঝেতে ব্যবহৃত হত নরম বেলে পাথর, আর দেওয়ালে এবং ছাদে কঠিন বেলেপাথর। এর যে ব্যতিক্রম ছিলনা তা নয়। সুলভ বলে কোন কোন জায়গায় গ্রানাইট, কোথাও বেসল্ট আবার কোথাও উঁচু মানের রূপান্তরিত শিলা খোণ্ডালাইটও ব্যবহৃত হয়েছে।

এরমধ্যে বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য ল্যাটেরাইট নামে একটি অতি সুলভ নরম পাথর। এটি একটি ফেরাস অকসাইডে সমৃদ্ধ কাদাপাথর, বা কাদাময় বেলেপাথর। প্রায় কাদার মত নরম বলে এগুলি কাটা সোজা। কেটে কিছুদিন ফেলে রাখলে রোদে এবং বায়ুমণ্ডলের প্রভাবে জারিত হয়ে এর মধ্যকার ফেরাস

অক্সাইড পরিণত হয় ফেরিক অকসাইড-এ। ফলে শিলাটি তখন হয়ে ওঠে সুকঠিন। নরম অবস্থায় এর উপর ভাস্কর্য করাও সহজ। পুরীর জগন্নাথের মন্দিরের একাংশ এরূপ একটি ল্যাটেরিটিক বেলেপাথরে তৈরি। কাদাটে ল্যাটেরাইটে তৈরি বেশ কয়েক শতাব্দীর প্রাচীন মন্দির ছড়িয়ে আছে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর ও বর্ধমানের কালনা অঞ্চলে। এদেশের কিছু বিখ্যাত ইমারতে ব্যবহৃত শিলার তালিকা দেওয়া হয়েছে পরিশিষ্ট গ-এ।

এসব শক্ত শিলা ছাড়াও আর একটি শিলা ব্যবহৃত হয়ে আসছে সিন্ধু সভ্যতার যুগ থেকে। বস্তুটি শিলাজতু বা bitumen।

গ্রানাইট, বেসল্ট, বেলেপাথর, চুণাপাথর, মারবেল ইত্যাদির পুরু পাত বা টুকরো কি দিয়ে জোড়া হত স্বভাবতই সে প্রশ্ন এসে পড়ে। সাধারণ চুণ সুড়কি ও কাদার গাঁথনির ব্যবহার বহুদিনের। তবে যেসব প্রাসাদ ও দুর্গ বহু শতাব্দী ধরে ব্যবহারের জন্য স্থাপন করা হত তাতে এ দুটি সিমেন্টের কোনোটিই ব্যবহার করা যায়নি। প্রাচীন রোমে আগ্নেয়গিরির ভস্ম থেকে তৈরি করা সম্ভব হয়েছিল পোর্টল্যাণ্ড সিমেন্টের মতো সিমেন্ট। কিন্তু উপমহাদেশে এই ভস্ম না থাকায় প্রয়োজন হয়েছিল অন্য শক্ত সিমেন্ট আবিষ্কারের। বৃহৎসংহিতায় দুটি সিমেন্টের নাম পাওয়া যায়[23]। একটি বজ্রলেপ ও অন্যটি বজ্রসংঘাত। বজ্রলেপ প্রধানত শিলা থেকে তৈরি সিমেন্ট। বৃহৎসংহিতায় তার বেশ ক-টি ফর্মুলা দেওয়া আছে। বজ্রসংঘাত হল ধাতব সিমেন্ট। সীসা, কাঁসা, পিতল ইত্যাদি গলিয়ে তৈরি হত বজ্রসংঘাত। বজ্রসংঘাতের আর এক নাম ময়-এর (অর্থাৎ ময়দানবের) সিমেন্ট।

প্রয়োজনীয় মণিকের পোষক শিলা

শিলাবিদ্যার অনুশীলনে তৃতীয় ধারার প্রাচীনতম উল্লেখ অর্থশাস্ত্রে[19], লোহার আকরিক কোন শিলায় খুঁজতে হবে তার বর্ণনাপ্রসঙ্গে। বৃহৎসংহিতায় ভূজল কোথায় থাকা সম্ভব তা বলতে গিয়ে বেশ ক-টি শিলার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

বিটুমেনের ব্যবহার জানা থাকলেও কয়লার ব্যবহার জানা ছিল বলে মনে হয় না। অঙ্গার কথাটার ব্যবহার ছিল কাঠকয়লা বোঝাতে। অনেকে[35] অঙ্গিরস কথাটা থেকে অঙ্গারের উৎপত্তি বলে মনে করেন। অঙ্গারকে যদি অঙ্গিরস বংশের টোটেম বলে ধরি তবে অবশ্য অঙ্গার যে কয়লা বোঝাত তা মানতে হয়। ধরে

নিতে হয় অঙ্গিরসের দেশে কয়লার উদ্ভেদ ছিল। তাহলে প্রশ্ন ওঠে পরে কয়লা মানুষের পরিচিতি থেকে হারিয়ে গেল কেন? এটা কি হতে পারে যে ঋগ্বেদের অঙ্গিরস প্রাক্-আর্য কোন বিশেষজ্ঞ, যিনি কয়লার ব্যবহার নিজেদের সমাজের মধ্যেই শুধু আবদ্ধ রেখেছিলেন, আর্যদের কাছে প্রকাশিত হতে দেননি?

অন্য কোথাও প্রাচীনতম সভ্যতায় কয়লার অস্তিত্বের খবর চোখে পড়েনি। ডুমার[36] মতে খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে চীনে ধাতুগলানোর চুল্লীতে কয়লার ব্যবহার শুরু হয়ে গেছে। এদেশে কয়লার ব্যবহার ঠিক কবে শুরু হলো তার নির্দেশ কোথাও পাইনি। প্রথম কয়লাখনি দেখছি অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে চালু হয়। ফারকোয়ার আর মোত্তি নামে দুই ব্যবসায়ী আসানসোলের কাছে নিয়ামতপুরে কিছুটা জমি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে লিজ নিয়ে প্রথম কোলিয়ারি খোলেন।

মাটি আর অনুরূপ ঝুরঝুরে বা আল্গা শিলাজাত বস্তুগুলিকে আধুনিক ভূবিদরা বলেন অসংসক্ত (unconsolidated) শিলা। প্রাচীনযুগে এই অসংসক্ত শিলার পরীক্ষণ প্রধানত বাস্তু (foundation)-এর প্রয়োজনে। জমির বিভিন্ন ধর্ম সম্বন্ধে বাস্তুবিদ্‌রা অনেকদিন ধরেই খুব বেশি সচেতন। প্রাগৈতিহাসিক যুগের অনেকগুলি ধ্বংসাবশেষে খুঁটি পোঁতা (pile driving)-এর মত একটি প্রযুক্তির বহুল প্রয়োগ দেখা যায়।[37] একটি প্রাসাদ নির্মাণে বাস্তু বা ভিতের গুরুত্ব কতটা তা বহু শ্লোকে আলোচিত হয়েছে স্থাপত্য বিদ্যার গ্রন্থ মানসার-এ (খ্রীস্টীয় চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শতক)। এই পুঁথিতে অনুপযুক্ত ভূমিকে উপযোগী করে নেবার বহু প্রক্রিয়ার বর্ণনা আছে।[38] ওড়িষী স্থাপত্যের সূত্রের উপর লেখা আর একটি প্রাচীন পুঁথিতে মাটিকে চার শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে [39]

ব্রাহ্মণ—রঙ সাদা, গন্ধ পরিশোধিত মাখনের, স্বাদ কষায়।

ক্ষত্রিয়—রঙ রক্তের মতো লাল, গন্ধ রক্তের মতো, স্বাদ তেতো।

বৈশ্য—রঙ হলদে, গন্ধ ক্ষারীয়, স্বাদ টক।

শূদ্র—রঙ কালো, গন্ধ বিষ্ঠার মতো, স্বাদ মদ্যের মত।

আপাতদৃষ্টিতে প্রথমটি ঝুরঝুরে বেলেমাটি। দ্বিতীয়টি ল্যাটেরাইট (বীরভূম বাঁকুড়ার মাটির মত রাঙ্গামাটি), আর চতুর্থটা এঁটেল পাঁকাল মাটি। তৃতীয়টি বর্ণনা থেকে ঠিক বোঝা যাচ্ছেনা। পরবর্তীকালে মাটির উপরের গাছপালা মাটির শ্রেণীবিভাগে বিবেচিত হয়েছে।

বলা হয়েছে ব্রাহ্মণজাতীয় ভূমিতে ভিত্তি সবচেয়ে সুস্থিত, অর্থাৎ এ-মাটির বসে যাওয়া (subsidence)-এর সম্ভাবনা অন্য তিনধরণের মাটির চেয়ে অনেক কম। শূদ্রজাতীয় মাটি সবচেয়ে অস্থিত। ওদিকে ক্ষত্রিয়ভূমির সহনশক্তি সর্বাধিক। স্পষ্টতই ল্যাটেরিটিক ভূমি বিকার, বিশেষ করে রাসায়নিক বিকৃতি (chemical weathering) সবচেয়ে বেশি এড়াতে পারে।

একটু ভাবলেই বোঝা যায় যে বর্ণাশ্রমের ছকে ফেলা এই শ্রেণীবিভাগে ভূমি বা রেগোলিথ (regolith)-এর কণাগুলির গ্রথন (packing), রাসায়নিক সহনীয়তা (chemical enduracne), জৈবমল (humus)-এর অস্তিত্ব ইত্যাদি কত সূক্ষ্ম বিষয়ের উপর নজর দেওয়া হয়েছে। যদি এসব বিচার পেশাগত অভিজ্ঞতা বলেও ধরি তবু এধরনের শ্রেণীবিভাগ বহু পরীক্ষা, নিরীক্ষণ ও অনুমানের ভিত্তিতে করা, যা স্পষ্টতই গবেষণার আর এক নাম। গবেষণার ফল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বা সূত্র আবিষ্কার। মাটির এই শ্রেণীবিভাগে ক্ষত্রিয়জাতীয় মাটি পরবর্তীকালে কেন সম্ভার মন্দিরে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হলো তা বোঝা যায় এইরকম কোনো সূত্র বার হয়েছিল ধরে নিলে।

শিলা থেকে দুর্মূল্য মণিক সংগ্রহের প্রযুক্তি :

সংসক্ত আর অসংসক্ত দুধরনের শিলা থেকে দুর্মূল্য মণিক সংগ্রহের প্রযুক্তি খুব প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত ছিল। নদীর বালুতেই হোক, কিংবা কোয়ার্ট্জ্ শিরায় বিকীর্ণ (disseminated) ভাবেই থাক, দুর্মূল্য মণিক সংগ্রহের এই পদ্ধতিগুলি খনি থেকে ধাতু কর্মশালা (melting shop) পর্যন্ত বহু ক্ষেত্রে বারবার ব্যবহৃত হতো। সোনা অবশ্য খুবই দুর্লভ মণিক, সেখানে তো এসব পদ্ধতির প্রয়োগ ছিলই, অপেক্ষাকৃত সুলভ টিনের মণিক ক্যাসিটেরাইটের সমাহরণ করা হতো অনুরূপ পদ্ধতির প্রয়োগে।

এই সমাহরণ পদ্ধতিগুলির লিখিত বিবরণ কোথাও পাওয়া যায়না। তবু এজন্য ব্যবহৃত একটি বিচিত্র যন্ত্র আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ঢুকে পড়েছে। অন্য একটি যন্ত্র আজও সুবর্ণরেখার মত নদীর বালু থেকে সোনা চেলে বার করার কুটির শিল্পে ব্যবহৃত হয়। অন্য একটি টেকনিকের বর্ণনা মেলে আরব্যোপন্যাসের নাবিক সিন্দবাদের কাহিনীতে। চতুর্থটি উত্তর পূর্ব আসামের (অরুণাচল প্রদেশের) সুবনসিঁড়ি নদীতে সোনা সমাহরণের প্রক্রিয়ারূপে অহোম রাজাদের

আমলে চালু ছিল। গত শতাব্দীর শেষার্ধে এই হারিয়ে-যাওয়া পদ্ধতিটি উদ্ধার করেন ভ্যালেন্টাইন বল[15]।

কুলো ও জিগ ঃ

সংসারে চাল, গম, ডাল ইত্যাদি থেকে কাঁকর ও অন্যান্য বাজে জিনিষ আলাদা করতে কুলোর ব্যবহার বহুদিনের। শুধু এদেশে নয়, বিদেশেও।[28] চালার সময় কুলোতে একই সঙ্গে একটা ভূ-সমান্তরাল (horizontal) ও একটা উর্দ্ধাধঃ (vertical) ধাক্কা দেওয়া হয়। ফলে, কিছুক্ষণ চালার পর বেশি গুরুত্বের বস্তুগুলি থেকে যায় ভিতরদিকে (চিত্র: 4.5) আর হাল্কা বস্তু অলোদা
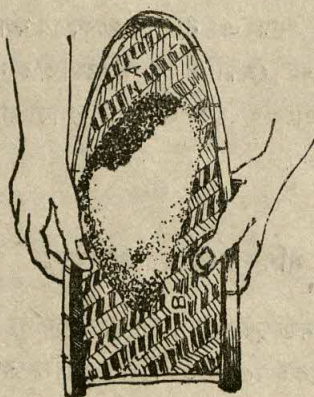
Fig. 4.5. কুলোয় রেখে চাললে ভারিকণা (A) পড়ে থাকে পিছন দিকে, আর লঘু-কণা (B) এসে জমে সামনে।

হয়ে ছড়িয়ে পড়ে বাইরের দিকে। চাল কিংবা গমের তুলনায় কাঁকরের গুরুত্ব খুব বেশি হলে আড়াইগুণ। সোনার আপেক্ষিক গুরুত্ব (19-21) সংশ্লিষ্ট কোআর্টজ্ জাতীয় মণিকের গুরুত্বের (2.65-2.85) তুলনায় প্রায় সাত-আট গুণ। তাই কুলোয় চাললে কোআর্টজ্ কণার থেকে সোনার দানা আলাদা করা চাল আলাদা করার চেয়ে অনেক সুষ্ঠুভাবে হতে পারে। বোধহয় সোনা এবং অনুরূপ দুর্লভ মণিক কুলোয় চেলে আলাদা করা হতো বলে কুলো পূজনীয়, এরকম

একটা সংস্কার চলে আসছে শুধু এদেশে নয় বিদেশেও। কুলোর সবচেয়ে প্রাচীন উল্লেখ চোখে পড়েছে অর্থশাস্ত্রে, অথর্ববেদে পাইনি।

কুলোয় যে তত্ত্ব (principle) প্রয়োগ করে হাল্কা থেকে ভারি কণা আলাদা করা হয়, আধুনিক সমাহরণ প্রক্রিয়ার (beneficiation process-এর) জিগ্ (jig) যন্ত্রটিতে সেই তত্ত্ব ব্যবহৃত হয়েছে। কুলোয় একবারে বেশি বস্তু চালা যায়না। অথচ ক্যাসিটারাইট, গ্যালেনা ইত্যাদির জন্য একেকবারে অনেকটাই আকরিক চালা দরকার। তাই বর্তমান জিগ্ সৃষ্টি হবার অনেক আগে থেকেই যান্ত্রিক শক্তি প্রয়োগ করে বড়বড় গোল কুলোর মত পাত্রে এই চালন ক্রিয়া সম্পন্ন হতো। খনির মুখেই থাকত এই সমাহরণ কর্মশালা। বালু ও বিচূর্ণিত শৈল শিরা চালতে দেবার আগে অবশ্যই পর পর সাজানো কয়েকটি নির্দিষ্ট মাপের ছাঁকনির মধ্যে ফেলে ছেঁকে নেওয়া হতো। এই ছাঁকনির ছিদ্রগুলির মাপ (ব্যাস) হতো যুক-এ ($\frac{3}{196}$ ইঞ্চ), যব-এ ($\frac{3}{32}$ ইঞ্চ), অথবা অঙ্গুলিতে ($\frac{3}{4}$ ইঞ্চ)। অবশ্য এর মাঝামাঝি ব্যাসের (যেমন 2 যুক, 4 যুক, 2 যব, 4 যব ইত্যাদি) ছাঁকনিও থাকত। যুক-এর চেয়ে ছোট মাপ ছিল লিক্ষ ($\frac{1}{8}$ যুক), তার চেয়ে ছোট মাপ বালাগ্র ($\frac{1}{8}$ লিক্ষ)। এত সূক্ষ্ম কণা ছেঁকে আলাদা করা যায়না, আর সোনা ছাড়া অন্য মণিকের বেলায় তা দরকারও হয়না। তবু, এত সূক্ষ্ম কণাও যে আলাদা করা হতো তার প্রযুক্তির বিবরণ দিয়ে গেছেন ভ্যালেণ্টাইন বল[15]। সেখানে এই সূক্ষ্ম কণাপূর্ণ ধুলো একটি জলপূর্ণ পাত্রে রেখে ঘাঁটিয়ে দেওয়া হতো। তাতে হাল্কা কণাগুলি জলের মধ্যে ভেসে থাকত অনেকক্ষণ, কিন্তু ঘাঁটানো থামাবার একটু বাদেই বেশি গুরুত্বের সোনার কণিকাগুলি জমতে শুরু করতো পাত্রটির তলায়। বল সাহেব এই পদ্ধতিতে সোনা আলাদা করতে দেখেছেন নেহারওয়ালাদের। বাদশাহী আমলে নেহারওয়ালা বলতে বোঝায় ঝাড়ুদারদের এক বিশেষ সম্প্রদায়কে, যাদের কাজই ছিল স্বর্ণকারদের কর্মশালার ঝাঁটালো কিনে নেওয়া। এই ঝাঁটালো থেকে সংগৃহীত সোনা বিক্রি করেই তারা জীবন ধারণ করত।

স্টোক্স ল'র অনুরূপ সূত্র প্রয়োগ করা নেহারওয়ালাদের এই পদ্ধতির আবিষ্কার কোন যুগে, আর তার ভিত্তিস্বরূপ হাইড্রোস্ট্যাটিক্সের উদ্ভাবক ও অনুশীলনকারী কে তার সন্ধান প্রাচীন ভারতে গণিত সম্পর্কে যাঁরা গবেষণা করেছেন তাঁদের গবেষণার বিষয়। তবে যতদূর জানি এখনো তা স্থির করা যায়নি।

প্যানিঙ ও সেন্ট্রিফিউজ :

কুলোয় চেলে আলাদা করতে গেলে দানাগুলো শুকনো হওয়া চাই। নদীর বালুতো অত শুকনো হয়না! তাহলে সেই বালু চালার আগে শুকিয়ে নেওয়া দরকার। কিন্তু যেখানে দশহাজার ভাগ (আয়তন অনুযায়ী, by volume) বালুতে মাত্র দু-তিন ভাগ সোনা, সেখানে বালু শুকিয়ে চালার কথা ভাবাই বাতুলতা। জলে ডুবিয়ে যদি চালা যায় তবে সময় ও শ্রম দুইই বাঁচে। এই চিন্তা-ভাবনা আর পরীক্ষা-নিরিক্ষা (trial and error) থেকে প্যানিঙ প্রক্রিয়ার উদ্ভব হলো।

এই পদ্ধতিতে মাটির সরার মতো একটি কাঠের পাত্রে (চিত্র : 4.6) সোনা-
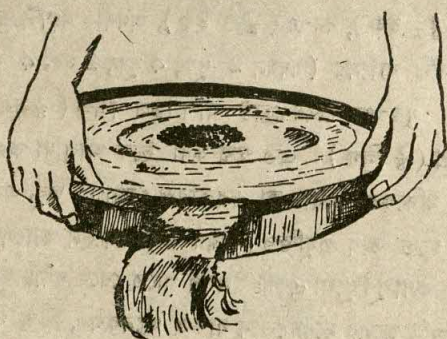
Fig. 4.6. সরার মতো আকারের কাঠের পাত্রে জলে ডোবান অবস্থায় গুঁড়ো করা পাথর থেকে কীভাবে সোনা চালা হয় দেখান হয়েছে।

কোআর্ট্‌জের মিশ্র বালু রেখে সবসুদ্ধ একটা বড় গামলায় চোবানো হয়। তারপর পাত্র বা প্যানটিকে দেওয়া হয় একটা বৃত্তাকার আবর্তন। এতে সোনার দানাগুলি এসে জমে কেন্দ্রে, আর কোআর্ট জের দানাগুলি ছড়িয়ে পড়ে বাইরের দিকে।

কুলোর চেয়ে এই পদ্ধতিতে আলাদা করা যায় আরো সুষ্ঠুভাবে। কারণ শুকনো অবস্থায় সোনা-কোআর্ট্জের গুরুত্বের অনুপাত ছিল $\left(\frac{19\cdot00}{2\cdot65}\right)$ সাত-আট, জলে ডোবানো অবস্থায় তা $\left(\frac{19\cdot00 - 1\cdot00}{2\cdot65 - 1\cdot00} = \frac{18}{\text{1·৬১}}\right)$ বেড়ে দাঁড়ালো এগারো-বারোয়।

প্যানিঙ পদ্ধতি সোনা ছাড়া অন্য কোন মণিকের বেলায় বিশেষ ব্যবহৃত হতো বলে মনে হয়না, কারণ অধিক মাত্রায় (large scale-এ) প্যানিঙ করার মতো কোন যন্ত্রের খবর পাওয়া যায়না। প্যানিঙ তাই প্রধানত কুটির শিল্পরূপে সুবর্ণরেখার মতো কতকগুলি নদীর দুধারে দরিদ্র মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল। গ্রানাইট প্রদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত স্বল্পতোয়া নদীর প্রায় সব কটিতেই স্বর্ণময় বালু অল্পবিস্তর পাওয়া যায়। স্বাধীনতার সময় সুবর্ণরেখা সুবর্নসিঁড়ি, ও কাশ্মীরের বহু নদীর ধারে বসবাসকারী উপজাতির এটাই যে একমাত্র উপার্জন সেনসাস রিপোর্টে একথা পাওয়া যায়। কয়েকবছর আগেও সুবর্ণরেখার তীরে সোনা ছেঁকে বার করায় অভিজ্ঞ লোকের দেখা পাওয়া যেত।

প্যানিঙ-এর বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ব্যবহৃত হয়েছে দুটি আধুনিক যন্ত্রে—একটি সেন্ট্রিফিউজ ও অন্যটি রিভল্‌ভিঙ রাউণ্ড টেবল্।

সিন্দবাদের কাহিনী ঃ

প্রকীর্ণক থেকে রত্ন সমাহরণের আর একটি পদ্ধতির ইঙ্গিত পাওয়া যায় আর-ব্যোপন্যাসের নাবিক সিন্দবাদের কাহিনীতে। যে জায়গায় রত্ন সংগ্রহ করা হতো সে জায়গাটি ছিল শ্বাপদসঙ্কুল বনভূমি, চারপাশে উঁচু পাহাড়। মেদবহুল ভেড়ার মাংসের টুকরো এই পাহাড়গুলির উপর থেকে নিচের উপত্যকায় ফেলে দেওয়া হতো। চর্বির গায়ে আটকে যেত শুধু রত্নগুলি। কিছুক্ষণের মধ্যে শকুন বাজ ইত্যাদি শিকারি পাখি এই মাংসখণ্ডগুলি মুখে করে এনে বসত পাহাড়ে। তখন তাদের তাড়িয়ে দিয়ে সংগ্রহ করা হতো মাংসখণ্ডে আটকে যাওয়া রত্নগুলি।

শ্বাপদসঙ্কুল বনভূমি বলতে যে অঞ্চলের কথা মনে হয় সেটি আরাকান-ইয়োমা পর্বতশ্রেণীর পূর্বে ব্রহ্মদেশে শান উপত্যকা বা Shan Plateau। পদ্ধতিটা সুপ্রাচীন, আর লোকের মুখে মুখে ছড়িয়েও পড়েছিল অনেকদূর। তাই সাধারণ

প্রবচনই হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে শকুন রত্ন অপহরণ করে। কালিদাসের বিক্রমোর্ব্বশীয়ম্-এ তার প্রতিফলন আছে।

সারফেস টেনসানজাত বল কাজে লাগিয়ে অধাতব কেলাস সমাহরণে তত্ত্বটি প্রয়োগ করা হয়েছে আধুনিক যন্ত্র গ্রিজ টেব্‌ল্‌-এ। হীরা, চুণী, পান্না, নীলার টুকরো সমাহরণ করা হয় এই যন্ত্র দিয়ে।

আসামে প্রচলিত সমাহরণ পদ্ধতি :

আসামের স্থবনসিঁড়ি নদীতে সোনার অস্তিত্ব নদীটির নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। গতশতকের শেষার্ধে এদিকে অনুসন্ধান চালিয়ে সমাহরণের লুপ্ত পদ্ধতি উদ্ধার করেন ভ্যালেণ্টাইন বল। লোকমুখে পদ্ধতিটির কথা তিনি শুনেছিলেন অনেক আগেই, এবং আসামে নয়, কাশ্মীরে। গতশতাব্দীতে পদ্ধতিটির প্রয়োগ ছিলনা কোথাও। অরুণাচলের কোন এক অঞ্চলে গিয়ে প্রথম তাঁর কানে এল যে এই পদ্ধতিটির বর্ণনা যে পুঁথিতে আছে, সেই পুঁথিটির একটি প্রতিলিপি আছে গ্রামের মোড়লের কাছে। সেই মোড়লকে ভয় দেখিয়ে ও ঘুষ দিয়ে তিনি সেই পুঁথিটি বার করলেন। এসিয়াটিক সোসাইটির আনুকুল্যে পুঁথিটির অংশবিশেষ অনুবাদ করায় পদ্ধতিটি জানা গেল।

এই প্রক্রিয়ায় নদীগর্ভে নিক্ষেপ করা হতো ইয়াকজাতীয় প্রাণীর রোমশ চামড়া। শীত ও গ্রীষ্মকালে নদীর জল যখন কমে যেত তখন এই রোমে আটকে যেত স্বর্ণকণা। কিন্তু জলে ধুয়ে বেরিয়ে যেত কমগুরুত্বের কোআর্ট্‌জ কণা। পরে এই রোমশ চামড়া তুলে এনে শুকিয়ে চাল মাড়াইয়ের আঙিনার মতো একটা পরিষ্কার জায়গায় ঝাড়া হতো। যে বালুটুকু বেরোত তাতে সোনার অনুপাত নদীর বালুর তুলনায় অনেক বেশি। পরে এই বালু কুলোয় ঢেলে ও প্যানিঙ করে তা থেকে সমাহরণ করা হতো সোনা।

এই যে পদ্ধতিগুলোর বিবরণ দেওয়া হলো, এর কোনোটিই কিন্তু ভারতীয় উপমহাদেশে উদ্ভাবিত পদ্ধতি এ-কথা মনে করার কোনো কারণ নেই। বরং আদিমতম সভ্যতায় যখন পাথরের জায়গায় ধাতু আসতে শুরু করেছে, তখন একই সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় পদ্ধতিগুলি উদ্ভাবিত হয়েছে। এটাই অনুমান করা যেতে পারে। পরবর্তীকালে এক এক দেশে এক একভাবে সেগুলির উন্নতি হয়েছে, এই মাত্র। আসামের সোনা আহরণ পদ্ধতি সম্ভবত গ্রীকপুরাণের স্বর্ণময় মেষচর্মের (golden fleece এর) একটা যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা দেয়।

স্বর্ণময় মেষচর্ম ঃ

মূল কাহিনীতে আছে খ্রীস্টপূর্ব চতুর্দশ শতকের শেষ ও ত্রয়োদশ শতকের শুরুতে গ্রীসের থেসালির এক মিনোয়ান গোষ্ঠীর নেতা জেসন আরগাস্ নামে এক জাহাজ নির্মাতাকে দিয়ে একটি পঞ্চাশদাঁড়ের জাহাজ তৈরি করান, আর তার নাম দেন আরগাস্। এই জাহাজটি নিয়ে তিনি স্বর্ণময় মেষচর্মের সন্ধানে বেরোন, তাই অভিযানটি আরগোনাটিক অভিযান নামে পরিচিত। ব্রোঞ্জ যুগের অভিযান এটি।

স্বর্ণময় মেষচর্মটি কি সেসম্বন্ধে বহু জল্পনাকল্পনা হয়েছে। তার মধ্যে স্ট্রাবোর (63 B.C. – 21 A.D) অনুমানই সবচেয়ে যুক্তিসম্মত মনে হয়।

কৃষ্ণসাগরের ধারে ককেশাস পর্বতের দক্ষিণে ছিল প্রাচীন কল্কাস্। স্ট্রাবো বলেছেন, কলকাসের সোনা ধুয়ে আসত ফাজিজ নদী দিয়ে। কলকাসীয়রা রোমশ চামড়া জলে ডুবিয়ে এই সোনা ধরে ফেলত। আগ্রিকোলা (1546 A.D) নদীর বালু থেকে সোনা সংগ্রহের এই পদ্ধতির বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। অনেকের মতে জেসনের আরগোনটিক অভিযানই সভ্যতার ইতিহাসে প্রথম 'গোল্ডরাশ' !

বলা বাহুল্য, আগ্রিকোলার বর্ণনার সঙ্গে ভ্যালেন্টাইন বল-এর-বর্ণনা হুবহু মিলে যায়।

ইসলামিক যুগে ইমারতী শিলার প্রবর্ধন ঃ

ইসলামিক যুগের আগে ইমারতী শিলায় খোদাই করে ফুল লতাপাতা, কখনো কোনো রাজার অভিষেক বা অন্য বিশেষ ঘটনা ফুটিয়ে তোলা হতো। ধর্মীয় প্রাসাদে ও মন্দিরে এটাই ছিল প্রাচীর অলঙ্করণের সবচেয়ে সাধারণ পদ্ধতি। তাই এইসব হর্ম্যের মেঝেতে মারবেল কিংবা অন্য কোন পাথরের মসৃণ টুকরো লাগানো হতো, অন্য কোনো ভাবে অলঙ্করণ করা যেতনা।

ইসলামিক যুগের প্রাসাদে ও মসজিদে একটি অন্য টেকনিক চোখে পড়ে। পাথরের চৌকো বা ছকোণা টুকরোর মাঝখানে ফুল লতা-পাতার নক্সা কেটে পরে অন্য রঙের পাথরে সেই ফাঁকটুকু ভরাটকরা হতো। যেমন সাদা রঙের মারবেল এ-ভাবে কেটে ভরাট করা হতো। নীল রঙের রাজপট্টে (lapis lazuli)। বা মেটে রঙের জ্যাস্পার দিয়ে। নকসাটা দেখতে হতো একেবারে

মোজেইক টাইলের মতো। কলকাতার কাছাকাছির মধ্যে মুর্শিদাবাদে জগৎশেঠের প্রাসাদের মেঝেতে এর নিদর্শন আছে।

দুটো আলাদা শিলা এভাবে বিন্যস্ত (set) করার মধ্যে একটা উন্নত প্রযুক্তির ইঙ্গিত আছে। নিশ্চয়ই বিশেষভাবে পরীক্ষা করে শিলা দুটির একরকম coefficient of expansion কিনা তা দেখে নেবার কোনো ব্যবস্থা ছিল। এই প্রযুক্তিরই একটি শাখারূপে শিলায়, বিশেষ করে মার্বেল-এ সোনা, পিতল ও অন্যান্য ধাতব পদার্থ আর উপরত্ন বিন্যস্ত করার শিল্পের উদ্ভব হয়েছিল। এই শিল্পের নিদর্শন এখনো তাজমহল ও আগ্রার বহু ঐতিহাসিক প্রাসাদে ছড়িয়ে আছে।

লক্ষ্যণীয় যে এই শিল্পগুলি শুধু ইসলামিক স্থাপত্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সামান্য কিছু আছে সমসাময়িক হিন্দু স্থাপত্যে (যেমন জয়পুরের অম্বর প্রাসাদে)। তাই অনুমান করা যায় যে পদ্ধতিগুলির আমদানি পারস্য থেকে।

খননবিদ্যা ঃ

শিলাবিদ্যার প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় উল্লেখ না করলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। ভূগর্ভে খনিতে যে শুধু কাজ হতো তাই নয়, অন্যান্য নানা প্রয়োজনেও সুড়ঙ্গ (subway) খনিত হতো। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে রচিত জাতকে কাম্পিল্য নগরে এরকম একটি সুড়ঙ্গের (বলা হতো উন্মঙ্গ) উল্লেখ আছে। কাম্পিল্যনগর বরাহমিহিরের কর্মস্থল, তাঁর বৃহৎসংহিতায় উন্মঙ্গ নির্মাণের পদ্ধতিও আছে। এযুগে উৎখনন (excavate) করে রাজপ্রাসাদ থেকে গঙ্গা পর্যন্ত বিস্তৃত এরকম সুড়ঙ্গের সন্ধানও পাওয়া গেছে। জাতকের বর্ণনায় তো আছেই, ধ্বংসাবশেষ থেকেও দেখা যায় এই সুড়ঙ্গের গায়ে (দীপাধারশোভিত) বহু কক্ষ ছিল। বর্ণনা থেকে মনে হয় পরবর্তীকালের ভুলভুলাইয়ার মতো ভূগর্ভের এই সুড়ঙ্গ ছিল রাজা ও অভিজাতদের সম্ভোগস্থান।

জাতকের প্রাচীনত্ব মেনে নিলে সুড়ঙ্গ খননের শিল্প যে ভারতের একটি সুপ্রাচীন শিল্প সেসম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না। খ্রীষ্টপূর্ব 312 অব্দের আপ্পিয়া-এর প্রাচীনতম রোমক অ্যাকুইডাক্টের[40] চেয়েও অনেক আগে ভারতে জল সঞ্চালনের জন্য অ্যাকুইডাক্টের বহুল প্রচলন ছিল বলে মনে হয়। কিন্তু কোথাও এ বিদ্যার কোন উল্লেখ চোখে পড়েনি। অবশ্য কাশ্মীরে উৎপল বংশের অবন্তীবর্মণের রাজত্বকালে নাকি জলসেচের ব্যবস্থার অদ্ভুত উন্নতি হয়েছিল[13]।

পাঁচ ঃ নিসর্গ ভূবিদ্যা

ভূপৃষ্ঠের উপর যেসব পরিবর্তন নিয়ত ঘটে চলেছে তা বিজ্ঞানসম্মতভাবে পর্যবেক্ষণ করে সেইসব পরিবর্তনের কারণ ও ধারা নিরূপণ করা নিসর্গ ভূবিদ্যা বা Physical Geologyর কাজ। ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তনের সর্বাঙ্গীণ অনুসন্ধান গতীয় ভূবিদ্যা বা Dynamic Geology র বিষয়বস্তু। সেদিক দিয়ে নিসর্গ ভূবিদ্যা গতীয় ভূবিদ্যার অংশবিশেষ।

আমাদের সুপরিচিত ঘটনার মধ্যে পলি জমে নদীখাতের গভীরতা হ্রাস পাওয়া, বালুচর সৃষ্টি হওয়া, অতিবৃষ্টিতে নদীর জল উপচে পড়ে প্লাবন ঘটা নদী-প্রবাহের পথ পরিবর্তন ইত্যাদি প্রাকৃতিক ঘটনার কারণ নিরূপণ, এসবই পড়ে নিসর্গ ভূবিদ্যার আওতায়। আবার মরু অঞ্চলে ভূপৃষ্ঠে পরিবর্তন ঘটাতে প্রধান ভূমিকা বায়ুপ্রবাহের। ভূপৃষ্ঠের কোথাও আবার মুখ্য ভূমিকা হিমবাহের, কোথাও ভূজলের। এছাড়াও আছে ভূকম্প, অগ্ন্যুচ্ছ্বাস।

আদিম মানুষের কাছে পরিচিত অবস্থা থেকে সামান্যতম বিচ্যুতিও একটা ভয়ানক দুর্দৈব। তাই সভ্যতার আদিযুগে মানুষ যখন যাযাবর জীবন ছেড়ে প্রথম উপনিবেশ পত্তন করতে চলেছে তখন সবার আগে তাকে এইসব প্রাকৃতিক পরিবর্তনশীলতা সম্বন্ধে সচেতন হতে হয়েছিল বাধ্য হয়ে। অন্তত কিছুকাল বসবাস করতে না পারলে অত কষ্ট করে করা বসতি যে কতটা পণ্ডশ্রম তা মানুষকে ঠেকে শিখতে হয়েছিল। এই অভিজ্ঞতাই ধীরে ধীরে রূপ নিল নিসর্গ ভূবিদ্যায়। ক্রমে মানুষ বুঝতে শিখল যে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ও কতকগুলি নিয়ম মেনে চলে, আর সেই নিয়ম আবিষ্কারের চেষ্টা থেকে শুরু হলো বৈজ্ঞানিক গবেষণার। তারপর আবিষ্কারের ফলাফল কাজে লাগাবার চেষ্টা থেকে এল বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ ঃ

সিন্ধুসভ্যতার যুগে সামুদ্রিক বায়ুর গতিপথ এযুগের মতোই আরাবল্লী

পর্বতশ্রেণীর সমান্তরালভাবে বইতে শুরু করেছে। ফলে আগের যুগের মতো সুষম বর্ষণের সম্ভাবনা কমে এসেছে। শুরু হয়ে গেছে খরা ও অতিবৃষ্টির ঘন ঘন পুনরাবৃত্তি, আর মাঝে মাঝে ভয়াবহ মেঘবিদার বা cloud burst-জাতীয় প্লাবন। তাই শস্যশ্যামল অঞ্চলের চেয়ে এখানে মরুর অস্তিত্বই বেশি সম্ভব, অন্তত মোহেঞ্জোদারো-হরাপ্পার যে স্তর সবচেয়ে উপরে পাওয়া গেছে তার সময়ে। সিন্ধু সভ্যতার শুরু যে কেন নব্যপ্রস্তরীয় কালচারের সঙ্গে ছেদহীন বলে ধরা যেতে পারে তা আলোচিত হয়েছে দ্বিতীয় অধ্যায়ে। তাহলে সিন্ধুসভ্যতার যে সমস্যা তা ভারতীয় উপমহাদেশের তো বটেই, এসিয়া-আফ্রিকার প্রায় সব নব্য প্রস্তরীয় যুগের পরিবেশে গড়ে ওঠা তাম্র ও ব্রোঞ্জ সভ্যতার সমস্যা। অধ্যাপক টয়েনবির ভাষায় : After the close of the Ice Age our Afrasian areas began to experience a profound change in the direction of desiccation... ...finally there were communities that responded to the challenge of desiccation by changing their way alike, and this double reaction was a dynamic act (পৃষ্ঠা 91-92)

সহজেই অনুমান করা যায় যে সিন্ধু-অববাহিকার প্রাগৈতিহাসিক অধিবাসীরা এমনি কোন গোষ্ঠী। তাই তাদের প্রথম চেষ্টা হলো প্রাকৃতিক পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়ানো। তা করতে গেলে চাই চাষের জন্য পর্যাপ্ত জল সরবরাহের ব্যবস্থা আর সাগরতটে জোয়ারের জল শুকিয়ে উৎপন্ন লবণ নিয়মিত মরশুমি বায়ুতাড়িত হয়ে দেশের মধ্যে সঞ্চারিত হয় তার প্রভাব থেকে নিজেদের বাসস্থান আর চাষের জমিকে রক্ষা করা।

অনিয়মিত বৃষ্টির পরিপূরকরূপে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল তার কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ সিন্ধু-অববাহিকায় পাওয়া যায়নি। পরোক্ষ নিদর্শন পাওয়া গেছে ঋগ্বেদের সূত্র থেকে। আর্যরা যে সিন্ধু-অববাহিকায় বেশ ক-টা জায়গা দখল করেছিল তা অনুমান করা যায় ঋগ্বেদের কিছু বিবরণ ও উপাখ্যান থেকে[11]। ঋগ্বেদের দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব। তাঁর আর এক নাম বৃত্রহন্। নাম না বলে উপাধি বা খেতাব বলাই ভালো। বৃত্রনামক অসুরকে হনন বা সংহার করে এই খেতাব লাভ। প্রশ্ন হলো; এই অসুরটি কে, বা কী? শব্দবিদরা অনেক বিশ্লেষণ করে বলেছেন 'বৃত্র' অর্থে বাধা, কিংবা বাঁধ বোঝায়, কোন অতিমানবীয় প্রাণী নয়। কোশাম্বি[12] দেখিয়েছেন বৃত্র শব্দের এ-ব্যাখ্যার সঙ্গে ঋগ্বেদের বর্ণনা কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাহলে 'বৃত্রসংহার' আসলে এই বাঁধ

ভেঙে কৃত্রিম প্লাবন ঘটিয়ে জনপদ ধ্বংস করার ঘটনা। আক্রমণকারী আর্যদের এই কূট যুদ্ধকৌশলের নেতা ইন্দ্র।

কোশাম্বির ব্যাখ্যা থেকে মনে হয় যে সিন্ধু-অববাহিকার দুধারে এরকম অনেক বাঁধ ছিল। বাঁধ দেবার দুটো উদ্দেশ্য সম্ভব :

1. বন্যা থেকে নদীতীরবর্তী লোকালয়গুলি বাঁচানো। সিন্ধু ও তার উপনদীগুলির উৎপত্তি প্রধানত হিমবাহ থেকে। এ ধরনের নদীতে প্লাবনের সম্ভাবনা আর প্রাবল্য দুইই সাধারণত কম। বরং বৃষ্টির জল থেকে উৎপন্ন নদীতে দুইই বেশি। তাই অনেকে বাঁধের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নেদারল্যাণ্ডের মতো প্লাবন থেকে জনপদ রক্ষা করার কথা যে বলেন, তা বোধহয় যুক্তির খাতিরে বাদ দেওয়া যায়।

2 কিন্তু মরুভূমিতেও প্রবল বর্ষণ হয়, আর তা যে কোনো জায়গাতেই হতে পারে। এই বাড়তি জল অবশ্যই প্লাবন ঘটাতে পারে। কিন্তু উদ্বৃত্ত জলটুকু ধরে রাখা গেলে চাষের জন্য নিয়মিত জল সরবরাহটা বাঁধা থাকে। বোধহয় বাঁধ বা বৃত্রের উদ্দেশ্য এটাই, চাষের জন্য উদ্বৃত্ত জল সংরক্ষণ।

আকস্মিক অতিবৃষ্টির জন্যও প্লাবন মাঝে মাঝে হতো। তবে সে প্লাবন যে নিয়মিত ঘটনা নয় তা মোহেঞ্জোদারোয় পাঁচশো বছরের জমা পলির বেধ থেকে অনুমান করা যায়। প্লাবনের জল যাতে জমে না থেকে বেরিয়ে যায় সেজন্য শহরের পথঘাট লোকালয়ের কেন্দ্র থেকে বাইরের দিকে ঢালু হতো। পরবর্তীকালে স্ট্রাবো (63 B.C.—21 A.D.) চন্দ্রভাগা নদীর জল এইভাবে লোকালয়ের পথঘাট দিয়ে নিষ্কাশনের একটা প্রচলিত ব্যবস্থার বিবরণ দিয়ে গেছেন।

লোকালয়ের এক একটি প্লাবনের পর ঘরবাড়ীর দাওয়া পথের চেয়ে আর একটু উঁচু করে দেওয়া হতো। আর এইভাবে উঁচু করতে করতে মোহেঞ্জোদারোর শেষদিকে সাধারণ বাড়ীগুলির ভিত হয়ে দাঁড়িয়েছিল মাটির বাঁধের মতো। ফলে প্লাবনের জল ক্রমে লোকালয়ের মধ্যে আরো একটু উঁচুতে উঠতে থাকল। তারপর কখনো কখনো জলের চাপে পাশাপাশি দুটো পথের মধ্যে এই ভিতের বাঁধ ভেঙ্গে গিয়ে ঘরবাড়ি ধসে পড়ত। মোহেঞ্জোদারোর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কারের ঠিক পর পরই ধ্বংসাবশেষের সর্বোচ্চ স্তরগুলির বৈশিষ্ট্য দেখে অনেকে সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসের একটি কারণ মহাপ্লাবন বলে নির্দেশ করেন। কেউ কেউ সেই মহাপ্লাবন বাইবেলের মহাপ্লাবনের ভারতীয় প্রতিরূপ বলে ভেবেছেন। আসলে সেই প্লাবন সম্ভবত মানুষের উঁচু-করা দাওয়া ভেঙে ঘটা প্লাবন।

বৃষ্টির জলের একাংশ যে মাটিতে শুষে নেয় তা বিশেষ করে লক্ষ্য করেছিলেন এঁরা। কারণ শুধু মাটিই নয়। ইট আর পাথরও যে জল শুষে নেয় সে-সম্বন্ধে তাঁদের কতটা জানা ছিল তা অনুমান করা যায় ঘরবাড়ীর আকৃতি ও পরিকল্পনা থেকে :

(ক) ছাদে যাতে জল না জমে, যাতে চুঁইয়ে দেওয়ালে না ঢোকে, সেজন্য বিশদ ব্যবস্থা নেওয়া হতো। বহু ঘরের ছাদ ঢালু, সম্ভবত যাতে মাটিতে জল ঝরে যায় সেজন্য।[43]

(খ) কোথাও চুণ-সুড়কির একটা বিশেষ অনুপাতে তৈরি মিশ্রণ ব্যবহৃত হয়েছে জল নিরোধক অস্তর (waterproof lining) রূপে।[44]

(গ) নর্দমার জল আর বৃষ্টির জল ভূত্বকে সঞ্চারিত করার জন্য মাঝে মাঝে থাকত গর্ত (soak pits)[44]। এই গর্তগুলি আল্গা মাটিতে খোঁড়া। পাছে মাটি ধসে দেওয়াল ধুয়ে গর্ত বুজে যায় সেজন্য গৃহস্থালীর অব্যবহার্য জিনিষপত্রে ভরা থাকত এই গর্তগুলি।

(ঘ) ভূজল সম্বন্ধে তাদের জ্ঞানের নিদর্শন বিভিন্ন ব্যাস ও আকৃতির (shape-এর) বেশ ক'টি কূপ।[44] লক্ষ্য করা যায় যে কূপের ব্যাস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ানো হয়েছে তার দেওয়ালে গাঁথা সারিতে ইটের আকার।

(ঙ) বৃষ্টির জল চোঁয়ানো বন্ধ করতে চুণ-সুড়কিই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু মোহেঞ্জোদারোর প্রধান স্নানাগার (Grate Bath)-এ বোধহয় শুধু চুণ-সুড়কি দিয়ে আবদ্ধ-জল চোঁয়ানো বন্ধ করা যায়নি। তাই এখানে ব্যবহার করা হয়েছিল বিটুমেন। হয়তো কিরথর শ্রেণীর দক্ষিণে হিংলাজের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে হাইড্রোকার্বন-সম্পৃক্ত স্তর থেকে এ বিটুমেন সংগৃহীত হয়েছিল। যাতে এই বিটুমেন স্নানাগারের দেওয়াল থেকে পিচের মতো বহে গিয়ে (flow করে) নিঃসারিত না হয় সেজন্য বিটুমেনের আস্তরের উপর গেঁথে দেওয়া হয়েছিল একসারি ইট।

বৃষ্টির জলের ধারা খাড়াভাবে পড়লে ভূমি তো বটেই, গাঁথনিরও ক্ষয় হয়। সেজন্য এ যুগের ঘরবাড়ীতে বৃষ্টির জল বেরোবার নলের নিচের দিকটা ইংরাজি L-অক্ষরের মতো না বেঁকিয়ে সাধারণত বাঁকানো হতো ধীরে ধীরে বৃত্তাকারে, কিংবা খাড়ানলের ঠিক নিচে রাখা হতো soak pit-এর মুখ। মোহেঞ্জোদারোর প্রাসাদে এ-ধরনের নলই দেখা যায়।

মোহেঞ্জোদারোর রাস্তাগুলি উত্তর-দক্ষিণ আর পূর্ব-পশ্চিম বরাবর। ম্যাকে-

এর মতে[15] পথঘাটের এমন বিন্যাস ঘন জনবসতিতে প্রাকৃতিক বায়ুপ্রবাহের সাহায্যে বদ্ধ বায়ু বার করে দেবার জন্য। অবশ্য ঠিক সমকোণিভাবে বিন্যস্ত যে কোনো দুটো সেট রাস্তায় বদ্ধ বায়ু বার করে দেবার কাজ হতে পারে। সেক্ষেত্রে উত্তর, পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম, এই চারটি প্রধান দিককে (cardinal points) কাজে লাগানোর অন্য কোনো উদ্দেশ্যও থাকতে পারে।

মোহেঞ্জোদারোয় প্রচুর খেলনা পাওয়া গেছে, তার মধ্যে নৌকো অন্যতম। বর্তমানে সমুদ্র থেকে জায়গাটার দূরত্ব প্রায় পাঁচশ কিলোমিটার। নৌকোর অস্তিত্ব থেকে বোঝা যায় যে নৌকোচালানো আর পাঁচটা বৃত্তির মতোই সাধারণ একটি বৃত্তি। লোথাল-এ জগতের প্রাচীনতম পোতাশ্রয় ও পোতাশ্রয়ের কাছে পণ্যের জন্য গুদামঘর (warehouse)[6] প্রমাণ করে যে এযুগে সমুদ্রপথে বাণিজ্য কতটা প্রচলিত ছিল।

সূর্য পূর্বদিকে উঠে পশ্চিমে অস্ত যায়, তাই পূর্ব আর পশ্চিম দিক দুটিকে চিহ্নিত করা যত সহজ, কম্পাস না থাকলে উত্তর আর দক্ষিণদিক চিহ্নিত করা তত সহজ নয়। মোহেঞ্জোদারোর ধ্বংসাবশেষে কোনো চৌম্বকশিলা মেলেনি যা উত্তর-দক্ষিণ নিরূপণে সাহায্য করতে পারে। অথচ পূর্ব-পশ্চিম রেখা বা অক্ষাংশের লম্বরূপে উত্তর-দক্ষিণ রেখা বরাবর পথের যে বিন্যাস করা হয়েছে, এটা কি নেহাৎই কাকতালীয়? নাকি দ্রাঘিমারেখা বলে পরিচিত উত্তর-দক্ষিণ রেখাগুলি মহাবৃত্ত* (great-circle)-এর স্মারক? নৌ-বাণিজ্যে পারদর্শী সমাজে মহাবৃত্তের তাৎপর্য জানা থাকা বোধহয় অসম্ভব নয়!

উত্তরপশ্চিম ভারতের প্রাগৈতিহাসিক ধ্বংসাবশেষ :

কিরথর শৈলশ্রেণীর পূর্বঢাল বরাবর বেশ ক-টি ধ্বংসাবশেষ আছে। মোহেঞ্জোদারোর সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় এই উপনিবেশগুলিতে ঘরবাড়ীর ভিত সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। পাহাড়ের গায়ে প্রায় এক মিটার পর্যন্ত ভিত

* একটি গোলক (spehere)-এর কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে কোনো তলক (plane) গেলে গোলকপৃষ্ঠ আর তলকের ছেদরেখা যে বৃত্তটি, তাকে বলে মহাবৃত্ত। নিরক্ষরেখা আর প্রতিটি দ্রাঘিমারেখা এই মহাবৃত্ত। গোলকপৃষ্ঠে দুটি বিন্দুর মধ্যে সবচেয়ে কম দূরত্ব বিন্দু-দুটির মধ্য দিয়ে প্রসারিত মহাবৃত্ত বরাবর। জাহাজ ও বিমানের গতিপথ ঠিক করা হয় সাধারণত মহাবৃত্ত বরাবর জ্বালানি ও খরচ বাঁচাবার জন্য।

পাথরে তৈরি[37]। উপরের অংশটা কাদা, শুকনো লতা আর কাঠে বানানো। পাহাড়ের কোলে জমির ঢালের জন্য ধীরে ধীরে মাটি নেমে আসে। ক্রিপ (creep) নামে পরিচিত ভূমির এই সঞ্চার রোধ করার জন্য এখন পাহাড়ের গায়ে মাঝে মাঝে পুরু দেওয়াল তোলা হয়। অনুমান করা যায় কিরথর অঞ্চলের প্রাগৈতিহাসিক বাসিন্দারা এই জন্যই ভিতটা পাথরে (সংসক্ত শিলায়) স্থাপন করত।

মন্‌ছর (Manchhar) হ্রদের ধারে যেসব বাড়ী, সেগুলির ভিত খুঁটির (pile) উপর। হ্রদের ধারে পলল জমে যে ভূমির উৎপত্তি তাতে বসে যাওয়া বা subsidence-এর সম্ভাবনা। খুঁটি বসাতে গেলে খুঁটিগুলো উপর থেকে হাতুড়ি মেরে মেরে বসাতে হয়। পদ্ধতিটাকে আধুনিক ভাষায় বলা যায় percussion drilling। এই পিটানোর ফলে জমি যেটুকু বসার আগেই বসিয়ে দেওয়া যায়। আলিমুরাদ আর কোৎরাস্‌-এ ভিত্তি স্থাপনের সময় পিটিয়ে ভিত সুদৃঢ় করার নিদর্শন আছে।

সিন্ধু-অববাহিকার প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে যেমন অনাবৃষ্টি আর অতিবৃষ্টি, বালুচিস্তানে তেমনি প্রধান প্রাকৃতিক দুর্যোগ যখন তখন উঁচুমাত্রার ভূকম্পন। আল্পসীয়-হিমালয় ভূকম্পন বলয়ের মধ্যে জায়গাটা পড়ায় এযুগের মতোই সেযুগেও জনপদের নিরাপত্তার সমস্যা ছিল।

এ-দুর্যোগ থেকে ঘরবাড়ী নিরাপদ করার জন্য সিরকাপ-এ এক বিশেষ ধরনের ভিত্তি-পরিকল্পনা দেখা যায়।[46] জমির মধ্যে ভিতের জায়গাটুকু খুঁড়ে নিয়ে ভরাট করা হতো আল্‌গা নুড়ি দিয়ে। তারপর তার উপর বসানো হতো ভিত। হঠাৎ এই অঞ্চলে আলাদা এই ধরনের ভিত দেখে মনে হয় যে প্রয়োজনের তাগিদে এরকম ভিতের উদ্ভব হয়েছিল। ভূপৃষ্ঠে ভূকম্পনজনিত ক্ষয়ক্ষতি যে প্রধানত ভূপৃষ্ঠের উপর আবদ্ধ, এই ব্যাপারটা সে যুগে নজরে পড়েছিল। আজ আমরা জানি যে ভূকম্পের L-তরঙ্গের জন্য প্রধানত এই ক্ষয়ক্ষতি। ভূপৃষ্ঠ বরাবর এই তরঙ্গ সঞ্চারিত হয় আর ভূপৃষ্ঠেই সীমাবদ্ধ থাকে তার কার্যকারীতা। এই L-তরঙ্গের ভৌতধর্ম সাগরের উপর জলের ঢেউ-এর মতো। দালানের ভিতে যদি সাগরপৃষ্ঠের মতো ঢেউ ওঠে তবে ভিত তো বটেই, উপরের দালানেও বড় বড় ফাট ধরে। জলে বা যেকোনো তরল বস্তুতে দৃঢ়তার (rigidity-র) অভাব বলে সেখানে এরকম ফাটল উৎপত্তির প্রশ্নই ওঠে না।

কণাময় আল্গা (granular loose) কঠিন বস্তুর ধর্ম অনেকটা জল বা

অনুরূপ তরল পদার্থের মতো। যারা সিরকাপে এরকম ভিতের পরিকল্পনা করেছিল তারা এটা লক্ষ্য করেছিল নিশ্চয়ই। এযুগে এরকম ভিত raft-foundation নামে পরিচিত। জাপানে বেশ ক'টি বহুতল প্রাসাদ এই raft-foundation-এর উপরে উঠেছে।

সিরকাপ অবশ্য মাত্র খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতকের বসতি। তবু ভিত্তির পরিকল্পনা, নগরের পথঘাট ও পয়ঃপ্রণালীর বিন্যাস, পোতাশ্রয়ের ধ্বংসাবশেষ ইত্যাদি প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার যেসব ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে তা ছড়িয়ে আছে এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে। এই সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছিল প্রায় পনের লক্ষ বর্গমাইল বিস্তৃত এক অঞ্চলে। মোহেঞ্জোদারো, হরপ্পা, কালিবঙ্গন ও লোথাল এই সভ্যতার প্রতীক। উপরে আলোচিত ভূতাত্ত্বিক নিদর্শন ছাড়াও সভ্যতার উৎকর্ষতার প্রচুর নিদর্শন আছে। অনেকেই মনে করেন এযুগে বহু বিদ্যার নিয়মিত অনুশীলনের ব্যবস্থা ছিল। পরবর্তীকালে এই সভ্যতার কিছুটা পরিপাক করে ও কোনো কোনো অংশের আরো উন্নতি করে গড়ে ওঠে আর্যদের বৈদিক সভ্যতা।

বৈদিক যুগ :

আর্যদের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের মতামত শুরুতে আলোচনা করে নিলে বৈদিক রচনায় পাওয়া বহু সিদ্ধান্ত ও মতবাদের উৎপত্তির কারণ খুঁজে বার করতে সুবিধা হবে।

ভাষাবিদ্যা ও প্রত্নবিদ্যার সূত্রে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে রুশ দেশের উরাল পর্বতের দক্ষিণে শুষ্ক তৃণাচ্ছাদিত সমতলভূমিই ছিল আর্যদের আদি বাসস্থান। দক্ষিণ থেকে আসা আর্দ্র সমুদ্রবায়ু দক্ষিণে ককেশাস পর্বতে বাধা পায় বলে এ জায়গাটা আজ শুকনো। তবে 50°-55°N অক্ষাংশে অবস্থিত বলে এখন এখানকার আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ। বিগত হিমযুগে এই অঞ্চলে তুষারপাতের মাত্রা ছিল কম। তাই নিরক্ষীয় অঞ্চলের বাইরে এই জায়গাটা ছিল মানুষের বসবাসের পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে জানা যায় যে এখানে নর্ডিক ও আল্পসীয় উভয়গোষ্ঠির লোকই থাকত। নব্যপ্রস্তরযুগের আবহাওয়ার পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে বৃত্তিগত বিভাজন হয় এই মানুষদের—আল্‌পসীয়রা কৃষিকে অবলম্বন করে মন দিল স্থায়ী বসবাস গড়ার দিকে, আর নর্ডিকরা আগের মতো পশুপালনে রত থেকে যাযাবর জীবন বেছে নিল।

নর্ডিকরা প্রকৃতিকে বিভিন্নরূপে পূজা করত, আর আল্প্‌সীয়রা চাষবাসে সাফল্যের জন্য সৃজনশক্তিরূপ দেবতাদের পূজা করত।

অনেকের ধারণা আল্পসীয়রা নর্ডিকদের বলত 'অসুর'।[6] আবহাওয়ার পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে এরা ক্রমশ শিরদরিয়া ও আমুদরিয়া নদী দিয়ে ঘেরা বিস্তীর্ণ সমতলভূমিতে এসে বসবাস শুরু করে। তারপর ক্রমশ আরো পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়ে। তাদেরই একদল এসিয়া মাইনর থেকে বালুচিস্তানের মধ্য দিয়ে আরবসাগরের পশ্চিম উপকূলের ধার ঘেঁষে ধীরে ধীরে উপমহাদেশে ছড়িয়ে পড়ে এরাই প্রাক্‌-আর্য সভ্যতার স্রষ্টা। এরা উপমহাদেশের আদিম বাসিন্দা দ্রাবিড়দের কৃষ্টি পরিপাক করে উন্নত নাগরিক সভ্যতার ধারক হয়। পরবর্তীকালে নর্ডিকরাও তাদের আদি বাসভূমি থেকে বেড়িয়ে দুদলে বিভক্ত হয়ে একদল পশ্চিম ইওরোপের দিকে ছড়িয়ে পড়ে, অন্যদল উত্তর-পশ্চিম প্রবেশদ্বার দিয়ে উপমহাদেশে ঢুকে পঞ্চনদের উপত্যকায় এসে বসবাস শুরু করে। এরাই ঋগ্বেদের প্রবক্তা। তাদের অবিরাম সংগ্রাম আগের যুগের ইমিগ্রাণ্ট আল্পসীয়দের সঙ্গে। ঋগ্বেদে তৎকালীন ঘটনাই শুধু নেই, আছে আরো আগের যুগের ঘটনা যা স্মৃতিতে বংশ পরম্পরায় সঞ্চারিত হয়ে এসেছে। কারো কারো মতে ঋগ্বেদে সাতটা কালস্তর আছে[6]। তাতেই অনুমান করা যায় প্রাথমিক স্তরটির প্রাচীনত্ব।

বৈদিক বা পৌরাণিক ঘটনার বয়স নিরূপণের চেষ্টা সেযুগে ইওরোপীয়রা করেননি। অথচ বৈদিক সাহিত্যের মূল বিষয় আর্যদের ধারাবাহিক ইতিহাস। বিষ্ণুপুরাণের শ্রীধরকৃত টীকায় বলা হয়েছে 'ইতিহ' অর্থ পরম্পরাগত কাহিনী বা traditional history। এইরূপ কাহিনীর বা ইতিহ-এর যে আসন বা ভিত্তি তাই ইতিহাস। অথচ এই পরম্পরার কথাই ভাবা হয়নি বৈদিক ঘটনাগুলির কাল বিচার করতে গিয়ে। পার্জিটার পুরাণকে traditional history বলে মানতে রাজি হননি। অনেক ভারতীয় ঐতিহাসিকও পুরাণকে ইতিহাসের মর্যাদা দিতে চাননা বলে কীরকম হাস্যকর সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হয় তার একটা উদাহরণ পাওয়া যাবে কোশাম্বীর কথায়: If such a battle (*Kurukshetra*) really took place, it could only have been about 850 B. C., counting the traditional number of the dynastic kings down to historical kings। এই historical kingটি মহাপদ্ম নন্দ, তাঁর রাজ্যাভিষেক 413 B. C. তে[13] বলে অনুমান করা হয় গ্রীক ঐতিহাসিকদের বিবরণ থেকে।

আর অর্জুনপৌত্র পরীক্ষিতের সঙ্গে তাঁর অভিষেক বর্ষের ব্যবধান 34 প্রজন্মের। এটা আরো সুন্দরভাবে বলা আছে বিষ্ণুপুরাণে :

যাবৎ পরিক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।
এতদ্বর্ষসহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরম্ ॥ 4/24/32

অর্থাৎ বলেই দেওয়া আছে মহাপদ্ম নন্দের অভিষেকের সঙ্গে পরিক্ষিতের জন্মের ব্যবধান সহস্র বৎসর। অর্থাৎ পরিক্ষিতের জন্ম 1413 B. C. অর্থাৎ গড় প্রজন্মের মেয়াদ 29 বৎসর, একটা বিশ্বাসযোগ্য সময়। আর কোশাম্বির হিসাবে অভিষেক আর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের মধ্যে ব্যবধান 850 – 413 = 437, অর্থাৎ এক এক প্রজন্মের মেয়াদ 12·8 বৎসর !

পরিক্ষিতের জন্ম থেকে পৌরাণিক কালের মান নির্ধারিত (standardize) করার চেষ্টা করেছেন গিরীন্দ্রশেখর বসু[47]। বিভিন্ন রাজবংশের পর্যায়ক্রম (genealogy) তিনি সাজিয়েছেন পৌরাণিক বিবরণ মতে। তাতে দেখা যাচ্ছে যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যেসব রাজারা বিভিন্ন রাজবংশের বলে বিবৃত, বসুর হিসাবে তাঁরা সবাই একই কালে এসে হাজির হচ্ছেন (পরিশিষ্ট—ক)। যেমন পাণ্ডুবংশের যুধিষ্ঠির, বৃষ্ণি বংশের অক্রুর, নীপবংশের উগ্রায়ুধ, যদুবংশের দেবকী, সবাই একই বা কাছাকাছি সময়ের। একইভাবে দশরথপুত্র রামের সমসাময়িক বলে মিলানো যায় সেইসব রাজাকে যাদের নাম রামায়ণে পাই। বসু মহাশয় তাঁর হিসাবে 28 বছরকে ধরেছেন এক-এক প্রজন্মের মেয়াদ বলে। এটা বিতর্কের বিষয় হলেও কিন্তু তাঁর পদ্ধতিটা বিজ্ঞানসম্মত।

এই হিসাব অনুযায়ী ইক্ষাকু বংশের প্রথম রাজা বৈবস্বত (বৈবস্বত মনু)। তাঁর কাল খ্রীস্টপূর্ব 3814 অব্দ। আমাদের পুরাণে বৈবস্বতের আগে আরো 66 পুরুষ। 28 বছরে এক এক প্রজন্ম ধরলে 2408 বছর। এ-হিসাবে ভারতীয় পুরাণের আদিপুরুষ স্বায়ম্ভুব মনুর কাল 5958 B. C.। এই অতিপ্রাচীন রাজারা ভারতভূখণ্ডে রাজত্ব করেছিলেন, না উরালপর্বতের দক্ষিণে যখন আর্যদের বসবাস ছিল তখন থেকে বংশপরম্পরা রক্ষিত হয়ে এসেছে এদেশে ঢুকে পৌরাণিক সাহিত্য রচনা করা পর্যন্ত, তা গবেষণার বিষয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে মধ্য ইওরোপে, বিশেষ করে ফ্রান্সে যে সাত হাজার বছর আগে আবহাওয়ার হঠাৎ একটা আমূল পরিবর্তন ঘটে এটা আমরা দেখেছি। সেই পরিবর্তনের ফলেই হয়তো আল্পসীয় ও নর্ডিক জাত দুটোর দুরকম বৃত্তিগত বিভাজন (vocational differentiation)

ও তাদের বিভিন্ন দিকে প্রব্রজন শুরু। উপমহাদেশের দিকে যে গোষ্ঠীটা আসছিল তারই নেতা বোধহয় এই স্বায়ম্ভুব মনু।

এরকম একটা সিদ্ধান্তে আসতে আমাদের খুবই অসুবিধা হয় বহুদিন ধরে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ইত্যাদির একটা বয়স আমাদের ইতিহাসে চলে আসছে বলে। বোধহয়, আমরা যদি মনে রাখি যে মিশরের নথিভুক্ত ইতিহাস (documentary history) শুরু প্রায় 4000 B. C. তে, মধ্যপ্রাচ্যেও যেখানে অতিপ্রাচীন বেশ ক-টি রাজবংশের ইতিহাস পাওয়া যায়, সেখানে হঠাৎ সুপ্রাচীন প্রাচ্যের (Ancient East-এর) একটি অংশ ভারতীয় উপদ্বীপে তার ব্যতিক্রম ঘটে খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রকে ঋগ্বেদ প্রণয়ন মোটেই যুক্তিসম্মত মনে হবেনা। বরং তখন মনে হবে ঋগ্বেদের রচনা একটা বিস্তীর্ণ কাল জুড়ে। আগের দিকের মণ্ডল-গুলির রচনা সম্ভবত উপমহাদেশের সীমানার বাইরে। এমনকি মধ্য এসিয়া থেকে উপমহাদেশে এসে পৌঁছনর যে কালপরিসর অনুমান করা হয় বোধহয় সেটাও ভ্রমাত্মক ! এ কথা মনে রাখতে হবে যে কলম্বাসের সামনে যেমন ভারত-বর্ষের একটা ছবি ছিল, আদিযুগে এই মানুষদের সামনে তাদের কাঙ্খিত বাস-ভূমির ঠিক সেরকম কোনো ছবি ছিল না। তাই সেই প্রব্রজন ট্রায়াল অ্যাণ্ড এরর পদ্ধতিতে কয়েক সহস্রক ধরে চলার পর শেষ পর্যন্ত ভারতীয় উপমহাদেশে ঢুকে তারা একটা বসবাসের উপযোগী জায়গা খুঁজে পেয়েছিল, যুক্তির দিক দিয়ে একথা মানতে কোনো বাধা নেই।

পৌরাণিক ঘটনা ঃ

কৃষ্ণের যুগেও তাহলে প্রাচীন ইতিহাস একটা ছিল। কৃষ্ণের যুগ থেকে আমাদের যুগের সাড়ে তিন হাজার বছরের ব্যবধান। কুরুক্ষেত্র আমাদের চোখে একটি পৌরাণিক ঘটনা। তাহলে কৃষ্ণের যুগে তার 1500 বছর আগেকার সগর, 1700 বছর আগেকার হরিশ্চন্দ্র কিংবা 2500 বছর আগেকার মান্ধাতাকে নিশ্চয়ই পৌরাণিক ব্যক্তিত্ব বলা যায়।

এরকম দুটি পুরাণবর্ণিত বৈজ্ঞানিক ব্যক্তিত্বের একজন গর্গ। বিষ্ণুপুরাণে (2·5. 13—17) ও শ্রীমদ্ভাগবতে (10.6.5—6) বলা হয়েছে যে গর্গমুনি বিশেষ অনুশীলনের সাহায্যে নক্ষত্র, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, অগ্ন্যুচ্ছ্বাস ও ভূকম্পন সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করেছিলেন। ভারতের মধ্যে আলপ্সীয়-হিমালয়ের ভূকম্পন বলয় (Alpine Himalayan seismic belt) এর খানিকটা পড়লেও সেখানে

কোনো জীবন্ত আগ্নেয়গিরি নেই। তাহলে গর্গ অগ্ন্যুচ্ছ্বাস সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করলেন কোথায়? মনে হয় ভারতের বাইরে, মধ্যপ্রাচ্য থেকে উপমহাদেশে আসার পথে। আর তা কোনো ব্যক্তি-গর্গের আহরিত জ্ঞান নয়, গর্গ নামে চিহ্নিত কোনো দলের বহু প্রজন্ম ধরে সঞ্চারিত অভিজ্ঞতা-প্রসূত সংস্কার। বিশেষ গোষ্ঠীকে চিহ্নিত করা হতো গোত্র দিয়ে। গর্গ কিংবা তার কাছাকাছি নামের কোনো গোত্র আছে কিনা তা বিশেষজ্ঞরা বলতে পারবেন।

এমনি আর-এক পৌরাণিক ব্যক্তিত্ব ঋষি উতঙ্ক। তিনি অবশ্য বৈজ্ঞানিক ব্যক্তিত্ব নন, ভূতাত্ত্বিক উৎপাতে বিব্রত। রাজা বৃহদশ্বের কাছে অভিযোগ পেশ করছেন এই ভাষায়ঃ হে ভূপতে! আমার আশ্রমের কাছে একটি বালুকা-সমুদ্র (বালুকার্ণব) আছে। সেখানে দেবতা ও দানবদিগেরও অবধ্য ধুন্ধু নামক মধুতনয় শত শত লোক বিনাশের জন্য মৃত্তিকানিম্ন বালুকায় অন্তর্নিহিত থাকিয়া সুদারুণ তপ করিতেছে। সংবৎসর শেষে যখন সে নিঃশ্বাস ত্যাগ করে তখন সপ্তাহব্যাপী ভূমিকম্প হইতে থাকে। প্রদীপ্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সহ দারুণ ধূম নির্গত হয় (বিষ্ণুপুরাণ 4. 2. 13) ভূমিকম্প আর অগ্ন্যুচ্ছ্বাসের অনুরূপ বর্ণনা আছে বায়ুপুরাণেও (অধ্যায় 80)।

দুটি প্রশ্ন তোলা যায়—ঋষি উতঙ্ক কোনকালের, আর তাঁর আশ্রমের অবস্থান কোথায়?

গিরীন্দ্রশেখরের দেখানো পারম্পর্য (পরিশিষ্ট - ক) অনুযায়ী বৃহদশ্বের কাল 3627 B. C.। স্থানটি যে মরুভূমি সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই কোনো। কিন্তু সেই মরুভূমিতে তরঙ্গাকার বালিয়াড়ি সাগরের ঢেউ-এর মতোই মরুকেন্দ্র থেকে ধারের দিকে সঞ্চরণশীল। এই ঢেউগুলিকে সঞ্চরণশীল বালিয়াড়ি (migratory dunes) বলে ভাবতে কোনো বাধা নেই। জায়গাটায় ভূকম্পন অন্তত বছরে একবার প্রলয়ঙ্কর হয়। মরুভূমির কথায় দুটি জায়গার কথা মনে আসে—এক, সুলেমান-কিরথরের কোলে থর মরুভূমির উত্তর আর উত্তর-পশ্চিমে, অথবা মধ্য প্রাচ্যে আরব উপদ্বীপের উত্তরে ইরানে। দ্বিতীয় অঞ্চল বেশি সম্ভাব্য বলে মনে হয়, কারণ সেখানে প্রবল ভূকম্পন প্রায়ই ঘটে থাকে। এখন সেখানে মৌসুমী-বায়ুর মতো নিয়মিত ঋতুকালীন বায়ুপ্রবাহ (seasonal wind) হয়তো নেই, কিন্তু সেযুগেও ছিলনা একথা মনে করার কোনো কারণও নেই। বরং ভূগোলক-জোড়া বায়ুপ্রবাহের অন্যরকম বিন্যাসে তা থেকে থাকতেও পারে!

সাগর মাঝে মাঝে তার উপকূলে প্লাবন ঘটায়। অর্ব যখন তখন

বালুকার্ণবও এমন প্লাবন ঘটাতে পারে এটা ভাবতে আপত্তি নেই। এথেকে উপকূলকে বাঁচাতে গেলে বালিয়াড়ির ঢেউ ভেঙ্গে দেওয়া, কিংবা তা প্রতিহত করা দরকার। বড় বড় গাছের এ ব্যাপারে ভূমিকা সেই যুগ থেকেই অনুভূত হচ্ছে। তাই খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রকের শেষার্ধে রামায়ণ ও দ্বিতীয় সহস্রকের প্রথমার্ধে মহাভারতের কাহিনীতে বনস্পতিকে মহিমান্বিত করা হয়েছে।

অথচ এ যুগের অনেক পরে হেরোডোটাস (484—426 B. C.) মিশরের মরুভূমির কথা বলতে গিয়ে বলেছেন যে এককালে মিশর বনসম্পদে পরিপূর্ণ শস্যশ্যামল অঞ্চল ছিল। ফ্যারাওদের চাহিদা মেটাতে গিয়ে একধার থেকে গাছপালা কাটার ফলে দেশটা ধীরে ধীরে মরুভূমিতে পরিণত হলো। মিশরের প্রাচীন রাজবংশের অবক্ষয়ের যুগে উত্তর আফ্রিকায় মরুর সম্প্রসারণ শুরু। তাহলে কি যুবনাশ্ব বৃহদশ্ব কুবলয়াশ্বের যুগটা প্রাচীন যুগ শেষ হয়ে আর একটা নতুন যুগের সূচনা ? নামের সঙ্গে অশ্ব কথাটা কি অশ্বের উপর নির্ভরশীলতার চিহ্ন ? প্রব্রজনের কালে অশ্বের উপর নির্ভরতা থাকতেই পারে, আর সেজন্য ঘোড়াকে গোষ্ঠীর প্রতীক (totem) রূপে নেওয়া হয়ে থাকতে পারে। এ অনুমান গ্রহণযোগ্য হলে বৈদিক সভ্যতায় এটি একটি প্রব্রজনের (migration-এর) কাল।

মরুর সম্প্রসারণ সভ্যতার ঊষাকালে মানুষকে বারবার বিব্রত করেছে। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম সহস্রকের শেষার্ধে সংকলিত মনুসংহিতায় বিধান আছে গাছকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করার। শুরুর দিকে বোধহয় শুকনো বেলেমাটিতে চাষ করার চেষ্টা হয়েছিল। তার পরিণাম মানুষকে যে শিক্ষা দিল তা লক্ষ্য করে মনুসংহিতার বিধান হলো (2.112) ক্ষারীয় ও লবণাক্ত জমিতে চাষ করবেনা, কারণ সেখানে চাষ করে ফসল ফলানো যাবে না। অবশ্য লবণাক্ত জমি সাগরের ধারে, তবে ক্ষারীয় ভূমি ভূভাগের অভ্যন্তরে অনার্দ্র (arid) অঞ্চলেও হতে পারে।

গিরীন্দ্রশেখরের প্রস্তাবিত পারম্পর্য অনুসরণ করে বহু ঘটনার কাল বার করা গেলেও ঋগ্বেদের বয়স কিন্তু বার করা যায় না। কারণ ঋগ্বেদে সুদাস ও দিবোদাস ছাড়া আর কোনো রাজার কথা নেই, আর এই রাজা দুজন যে ঋগ্বেদের সাতটি কালস্তরের অনেক পরের দিকে, তার নিদর্শন আছে।

ঋগ্বেদে বর্ণিত প্রাকৃতিক শক্তি :

এ যুগের সাধারণ মানুষ গ্রীষ্মের দাবদাহে অতিষ্ঠ হয়ে যেমন 'আল্লা ম্যাঘ দে পানি দে' বলে কাতর প্রার্থনা জানায় ঋগ্বেদের যুগের মানুষ তেমনি যাদের করুণা ভিক্ষা করত, বাসস্থান অনুযায়ী তাদের তিনভাগে ভাগ করা যায় :

পৃথ্বীস্থান : পৃথিবী, অগ্নি সোম, বৃহস্পতি, নদী।

অন্তরীক্ষস্থান : আপস্-নাপৎ, ইন্দ্র, বায়ু-বাত, পর্জন্য ও মাতরীশ্বন্।

দ্যুস্থান : দ্যৌঃ, বরুণ, সূর্য, সবিতৃ, পূষণ, আদিত্য, উষস্, অশ্বিন্।

এগুলির মধ্যে কোনো কোনো দেবতাকে (যেমন নদী, বায়ুবাত ইত্যাদি) প্রাকৃতিক শক্তি বলে চেনা যায়, কিন্তু অনেকগুলিকেই আবার চিনে ওঠা যায়না। বোঝা যায়না সূর্য, সবিতৃ, পূষণ, আদিত্য ইত্যাদির মধ্যে পরস্পরকে আলাদা করার ভৌত কারণ কি ছিল। তবে এটা বোঝা যায় যে সব দেবতা সমান শক্তিমান নয়। কারণ প্রথম শ্রেণীতে অগ্নি দ্বিতীয় শ্রেণীতে ইন্দ্র আর তৃতীয়টিতে বরুণ সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক শ্লোক। ইন্দ্র সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে বর্তমান অধ্যায়ের শুরুতে। অগ্নিকে জানা গেছে আমূল পরিবর্তনের (চাল থেকে ভাত, কাদা থেকে ইট) কারক বলে। বরুণের অনুগ্রহের অনুভূতি হয়েছে কৃষি কাজে।

বরুণকে বলা হয়েছে আকাশ আর জলের সর্বময় অধিপতি। অর্থাৎ রাজত্ব পুরো জলমণ্ডল বা hydrosphere-এ, এমনকি আকাশের জল অর্থাৎ মেঘ ও বৃষ্টিতেও। নানান ধরনের জলরূপে বরুণের গতি সর্বত্র। এখন এই সর্বত্রগতি বলতে কতটা বোঝাত (আমরা এখন যেমন আর্দ্র জলবায়ুকে ঘরবাড়ী ও শিলার রাসায়নিক বিকারের কর্তা বলে ভাবি) ঋগ্বেদের যুগে, তা নির্ধারণ করার মতো কোন সূত্র নেই। অথচ বরুণের কর্মস্থলকে যে বহুক্ষেত্রে ভাগ করা হয়েছে তার প্রমাণ কিন্তু নানা জায়গায় ছড়ানো আছে। আলাদা করা হয়েছে নদীপ্রবাহকে তরঙ্গ বা ঊর্মিমালাভূষিত হ্রদের জল থেকে। আলাদা বর্ণনা আছে কুয়ো আর ঝর্ণার। একটার সঙ্গে অন্যটাকে গুলিয়ে ফেলা হয়নি কোথাও। নদীপ্রবাহের ধর্ম সম্বন্ধে যথেষ্ট পরীক্ষা ও গবেষণা যে হয়েছিল তার প্রমাণ কৃত্রিম জলপ্রবাহ (কুল্য—aqueduot) ও সেচব্যবস্থা (খনিত্রিম আপঃ)-এর বর্ণনা।

পৃথ্বীস্থানের দেবতা অগ্নিসম্বন্ধে বলা হয়েছে অগ্নির প্রভূত্ব অরণি বজ্র আর উচ্চতম স্বর্গে। এই উচ্চতম স্বর্গের অধিবাসী সূর্য। সূর্যও অগ্নির একটি রূপ। কাঠের মতো কোন দাহ্য বস্তুকে অবলম্বন করে সূর্যের আগুন জ্বলছে না।

পৃথ্বীস্থানের এরকম আগুন পাহাড় ফাটাবার জন্য দায়ী। মেসোপটেমিয়ার একটি শিলমোহরে এই বর্ণনার অনুরূপ একটি ছবি পাওয়া গেছে। বর্ণনা আর শিলমোহরের ছবি দুইই অগ্ন্যুচ্ছ্বাসের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। ঋগ্বেদের প্রাথমিক মণ্ডলগুলি যে উপমহাদেশের বাইরের অভিজ্ঞতার উপর রচিত, সে সন্দেহ দৃঢ় হয়।

ভূতাত্ত্বিক কাল ঃ

ইওরোপে প্রথম ভূতাত্ত্বিক কাল বা geological time সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ উপস্থাপিত করেছিলেন লিওনার্দো দা ভিঞ্চি। আল্পস্ পেরোবার সময় পাথরের মধ্যে সামুদ্রিক প্রাণীর খোলা (প্রকৃতপক্ষে জীবাশ্ম) দেখে তিনিই প্রথম বলেন যে মহাপ্লাবনের চল্লিশদিনের বৃষ্টিতে এরকম উঁচু জায়গা কখনো জলমগ্ন হতে পারেনা।

এদেশে জীবাশ্মের তাৎপর্য সম্বন্ধে কি ধারনা ছিল তার একটা পরিমাপ করার চেষ্টা হয়েছে অধ্যায় চার-এ। আর যাই হোক, সে ধারনা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত নয়। তাই ভারতীয় ঋষিদের কালের বিপুলতা সম্বন্ধে অনুভূতি এ যুগের মানুষকে স্তম্ভিত করে দেয়।

কালের শ্রেণীবিভাগ প্রথম গণনযোগ্য (quantitative) ফরমুলারূপে পাওয়া যায় বিষ্ণুপুরাণে। সেখানে বলা হয়েছে—কাল অনন্ত। কিন্তু তাকে বিভক্ত করা যায় কয়েকটি কল্পে। পরপর দুটি কল্পের মধ্যে একটি করে প্রলয়ের ব্যবধান। এই প্রলয়ে সব সৃষ্টি লোপ পায়। তবে সব প্রলয়ই যে একধরনের তা নয়। কোনো কোনো প্রলয় ভয়ঙ্কর খরা দিয়ে সূচিত। আবার কোনো কোনোটি প্লাবন, অগ্ন্যুৎপাত কিংবা বিপর্যয়কারী ভূকম্পন (tectonic earthquake) দিয়ে।

প্রলয়ের এই বর্ণনাগুলি এত আধুনিক যে তা কোথায় আছে বলে না দিলে ভূবিদ্যার ছাত্র এগুলিকে টেকটনিক (tectonic) বিপ্লব বলে ভুল করবে। আধুনিক স্তরবিদ্যার প্যালিওজোয়িক এরাকে মেসোজোয়িক এরা থেকে, এবং মেসোজোয়িক এরাকে কেনোজোয়িক এরা থেকে আলাদা করা হয়েছে বিষ্ণুপুরাণের বর্ণনার অনুরূপ দুধরনের প্রলয়কাল দিয়ে! পুরো বিষয়টার আধুনিকত্ব গত শতাব্দীতে চার্লস্ লায়েলকে এমনি চমকে দিয়েছিল যে তিনি তাঁর Princi-

ples of Geologyতে লিখেছেন Vedic people had the knowledge of geologic time ।[48]

বোঝাই যাচ্ছে জীবাশ্মের তাৎপর্য জানা ছিলনা বলে বৈদিক ঋষি সম্বন্ধে লায়েলের বক্তব্য গ্রাহ্য হতে পারেনা। তাই বলে পুরাণবর্ণিত কালের হিসাবটা তো আর অস্বীকার করা যায়না !

হিসাবটা এবার পরীক্ষা করে দেখা যাক। বিষ্ণুপুরাণের হিসাব থেকে এক একটি কল্পের মেয়াদ পাওয়া যায় 429×10^7 থেকে 432×10^7 বছর। প্রতিটি কল্প আবার কয়েকটি মন্বন্তরে বিভক্ত। দুটি মন্বন্তরের মধ্যে এক-একটি মন্বন্তরের ব্যবধান। মন্বন্তর অনেকটা প্রলয়কালের মতো, শুধু মাপ (magnitude)-এ ছোট। লক্ষ্যণীয় যে প্রলয়কালে প্রাণী ও উদ্ভিদজগৎ যেমন সম্পূর্ণ লোপ পায়, মন্বন্তর সম্বন্ধে কিন্তু সেরকম কিছু বলা হয়নি। মনুকালের মেয়াদ বিষ্ণুপুরাণ (1.3.10 – 14) আর মনুসংহিতা (1·61-63) অনুযায়ী $12000 \times 71 = 852,000$ বছর। প্রতিটি মনুকাল আবার চার যুগে (সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি) বিভক্ত। এবার এই বিভাগ আধুনিক ভূতাত্ত্বিক কালের বিভাগের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যাক :

আধুনিক বিভাগ	**পুরাণবর্ণিত বিভাগ**
এরা (Era)	কল্প
পিরিয়ড (Period	মনুকাল
এপক (Epoch)	যুগ

কালের ব্যাপ্তিতে কিন্তু বারবার প্রলয় ঘটেছে। পুরানো কল্পের অবসান ঘটে অন্য কল্প শুরু হচ্ছে। অর্থাৎ কালবিভাগের ধারনার ভিত্তি হলো পর্যাবৃত্তি (Periodicity)। কল্পের মেয়াদ (429-432 কোটি বছর) প্রায় পৃথিবীর বয়সের কাছাকাছি। এই বিপুল সময়ের পর্যাবৃত্তি কিসের ভিত্তিতে করা হয়েছিল তা কোথাও লেখা নেই, এমনকি এসম্বন্ধে কোনো কিছু অনুমান করার মতোও কোনো ইঙ্গিত কোথাও নেই। অথচ সমগ্র পরিকল্পনাটায় একটা system-এর পরিচয় আছে।

সৃষ্টিরহস্য :

কালবিভাগের মতোই বৈদিকসাহিত্যে সৃষ্টিরহস্যের তত্ত্বীয় আলোচনা আর-

একটি অতি-আধুনিক আলোচনা। ঋগ্বেদে সৃষ্টিরহস্যের অংশবিশেষ ইতস্তত ছড়ানো। এর প্রথম পূর্ণাঙ্গ আলোচনা পাই বৃহদারণ্যক উপনিষদে।

শুরুতে বিশ্ব ছিল সূক্ষ্ম বস্তুতে পূর্ণ মহাশূন্য। এই বস্তুকণা ঘনীভূত হয়ে প্রথম সৃষ্টি হলো বায়ু। এই বায়ুর মধ্যে বাষ্পাকারে ছিল জল। গরম দুধে যেমন সর পড়ে, আদিম জলমণ্ডলের উপর তেমনি পড়ল ক্ষিতির স্তর। তারপর পঞ্চমহাভূতে উৎপন্ন একটি ডিম্বাকার বস্তু আবির্ভূত হলো। এই ডিম্বাকার বস্তুটি সূর্যের মতো তেজোসম্পন্ন। এর দেবতা ভগবান হিরণ্যগর্ভ। এই ডিম্বাকার বস্তু থেকে ক্রমে এল নক্ষত্র, গ্রহ ইত্যাদি। ভগবান কথাটার অন্যতম অর্থে সর্বত্র বিদ্যমান (omnipresent)। হিরণ্যগর্ভ বলতে অন্তঃস্থ শক্তি, internal energy ভাবা যেতে পারে।

এবার আধুনিক মতবাদের সঙ্গে এই পৌরাণিক মতবাদের তুলনা করা যেতে পারে। মহাশূন্য (interstellar space) যে সূক্ষ্ম বস্তুতে (যাকে বলা হয়েছে ব্যোম্) পূর্ণ আজ কিন্তু তা প্রত্যক্ষ প্রমাণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এই সূক্ষ্ম বস্তুকণা কয়েক কোটি বছর ধরে সমবায়িত হয়ে প্রথম যে বস্তুর উদ্ভব হচ্ছে, স্বভাবতই তা বায়বীয়, যদিও আমরা যে বায়ুর সঙ্গে পরিচিত তার সঙ্গে এই বায়বীয় বস্তুর অনেক তফাৎ থাকতেই পারে। একেবারে আদি অবস্থায় সমবায়নের সঙ্গে সঙ্গে সেই বস্তুপুঞ্জের মধ্যে একধরনের বিভাজন ঘটে আলাদা হয় কঠিন বস্তু (ক্ষিতি), জল (অপ্) ও বায়বীয় বস্তু (মরুৎ)। তারপর সমবায়নের সময় ঘর্ষণের ফলে বস্তুপুঞ্জের মধ্যে সৃষ্টি হবে তেজঃ (তাপ)। এই পর্যন্ত পৌঁছে সমবায়িত বস্তুপুঞ্জে আবার একটা সামগ্রিক পরিবর্তন দেখা দেবে। কঠিন বস্তু সৃষ্টি হয়ে সূর্যের মতো রঙবিশিষ্ট ডিম্বাকার বস্তু উৎপন্ন হবে।*

ঠিক এভাবে সৃষ্টির সামগ্রিক ছবি কিন্তু অন্য কোনো দেশের পুরাণে পাইনি। শুধু অ্যারিস্টট্‌ল্‌কে (384—322 B. C) দেখছি ভূত্বক সৃষ্টি সম্বন্ধে এই একই ধরনের কথা বলতে। পরবর্তী কোনো অধ্যায়ে বিভিন্ন দেশের তুলনামূলক আলোচনার সময় দেখা যাবে যে বিভিন্ন দেশে অনেকসময় যেমন একই ধরনের মতবাদের উদ্ভব হয়েছে তেমনি কোথাও কোথাও আবার তাদের মধ্যে বিশাল ব্যবধানের উদ্ভব হয়েছে। এ থেকে মনে হয় যে যন্ত্র ও পরীক্ষাভিত্তিক নিরিক্ষণ

---

* Von Weizsacker ও সুব্রামনিয়াম চন্দ্রশেখরের প্রস্তাবিত সৌরজগতের উৎপত্তি এখানে বৃহদারণ্যক উপনিষদের ভাব বজায় রেখে বর্ণিত হলো।

(experimental observation) মানব সভ্যতার ইতিহাসে বরাবর নতুন hypothesis বা theory-র আবির্ভাবকে নিয়ন্ত্রণ করেনি। তাই বহু প্রাচীন মতবাদ যা দার্শনিক মতবাদ নামে সাধারণভাবে বিশেষিত, আধুনিকত্বে আমাদের অনেকসময় স্তম্ভিত করে দেয়।

দুটি যুগের মধ্যবর্তীকালে (মন্বন্তর কিংবা কল্পান্তরে) কি ধাঁচের পরিবর্তন ঘটত তার বর্ণনা আছে বিষ্ণুপুরাণে (1. 4. 25-30)। আগেই বলেছি মন্বন্তর শুধু মাপে কল্পান্তরের চেয়ে ছোট। কিন্তু তার ধাঁচ বা pattern একই রকম। এরকম একটা প্রলয়ে সারা পৃথিবী জলপ্লাবিত হলো। তারপর সেই জল ধীরে ধীরে সরে গেল, আবার ভূভাগ প্রকাশিত হলো ! বস্তুত ভূভাগের মাত্র একাংশই প্লাবিত হয়েছিল, আর সেই একাংশ জনবসতিসঙ্কুল। তাই অনুমান করা যায়, যাঁরা বর্ণনা করেছেন তাঁদের নিজের চোখে দেখা। তারপর বর্ণনাটি সামান্যীকরণ (generalize) করা হয়েছে। বৈদিক রচনায় এই সামান্যীকরণ ও একই কথার পুনরাবৃত্তি দুটোই অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আধুনিক যুগে 1755 A. D.-র লিসবন ভূকম্পে ঘটা জলপ্লাবন, কিংবা 1978-এ পশ্চিমবঙ্গ ও সন্নিহিত অঞ্চলগুলির প্লাবনের পর জমির অবস্থা এরকমই দাঁড়িয়েছিল বটে।

ভাগবতে (3. 13. 5-17) আবার আর-একরকম প্রলয়ের বিবরণ আছে। সেটি প্রবল আগ্নেয়োচ্ছ্বাস, লাভা উদ্গীরণ ও বিখণ্ডিত তপ্ত শিলাখণ্ডের (pyroclastics-এর) আকাশে উৎক্ষেপন দ্বারা চিহ্নিত। লাভাকে আলাদা কোনো নাম দেওয়া হয়নি, শুধু বলা হয়েছে অগ্নিপ্রবাহ।

বিষ্ণুপুরাণে অগ্ন্যুৎপাত ও ভূকম্পনের কারণ বলা হয়েছে। দুটিই ঘটে থাকে বিষ্ণুর অবতার সঙ্কর্ষণের ক্রিয়ায়। পাতালের সবচেয়ে নিচে আছে বিষ্ণুর 'শেষ' মূর্তি। 'শেষ'কে নাগও বলা হয়েছে। পাতাল অর্থে ভূগর্ভ। নাগ অর্থে রৈখিক আকৃতি বিশিষ্ট কোনো বস্তু, যা সাধারণত চুপচাপ পড়ে থাকে, কিন্তু হঠাৎ সাপের মতো কিলবিল করে ওঠে। সংকর্ষণ কথাটার আর এক অর্থ ছেঁড়া (tearing)। টুকরো টুকরো যে বর্ণনা ও ব্যুৎপত্তি পাওয়া যাচ্ছে বিষ্ণুপুরাণে সেগুলি একত্র করলে একটি টেকটনিক ভূকম্পনের চিত্র পাওয়া যাচ্ছে। এই বর্ণনার সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলে যায় oldham-এর দেওয়া 1897 সালের 12 জুনের আসামের ভূকম্পনের বর্ণনার সঙ্গে। The surface of the ground vibrated visibly in every direction as if it was made of soft jelly and long cracks appeared at once along the road...(Memoir of the Geological Survey of India, Vol. 29, 1900)। টেকটনিক ভূকম্পনের উৎপত্তি

ঘটে একটি ফাট বরাবর ফাটের দুধারের শিলার মধ্যে বিচ্যুতি ঘটলে। ঘটনাটিকে বলে চ্যুতি (faulting)। ভূপৃষ্ঠে চ্যুতির চিহ্ন একটি আঁকাবাঁকা ফাটলে। ভূকম্পনের সময় এই আঁকাবাঁকা রেখাটি ঠিক সাপের মতো কিলবিল করে ওঠে। সংস্কৃত সাহিত্যে উপমা সবাই জানেন। সুতরাং টেকটনিক ভূকম্পনকে যে শেষনাগের কাণ্ডকারখানা বলে বর্ণনা করে হয়েছে এতে সন্দেহ করার কিছু নেই। আসামের যে ভূকম্পন 15 August, 1950 সালে অনেকে দেখেছেন তাঁরাও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে ভূকম্পনের এই রূপটিকে সমর্থন করেছেন (The Statesman, 16 August, 1950)।

পতঞ্জলের যোগদর্শনে ক্রমপরিণাম :

বৈদিক রচনায় সামান্যীকরণের ভূমিকা সম্বন্ধে আগেই বলেছি। জড়বিজ্ঞান material science)-এর বহু ক্রিয়া, বিক্রিয়া ও ঘটনা সামান্যীকৃত হয়ে উপমা-রূপে গৃহীত হয়েছে অধ্যাত্মদর্শনে। অনুশীলনের অভাবে সহস্র বছরের ব্যবধানে জড়বিজ্ঞানের মূল রচনা হারিয়ে গেলেও নিয়মিত অনুশীলন প্রচলিত থাকায় কিন্তু দর্শনের গ্রন্থগুলিতে সেগুলি থেকে গেছে। এমনি একটি বর্ণনা পাওয়া যায় পতঞ্জলের যোগদর্শনের মহাভাষ্যে।

বলা হয় পতঞ্জলের যোগদর্শন অতিপ্রাচীন রচনা, এমনকি এই মহাভাষ্যও অনুমান করা হয় খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের রচনা। মহাভাষ্যে লোহার বাট-খারার উপমা দিয়ে বলা হয়েছে যে দশবছর বাদে ক্ষয় হয়ে এই বাটখারার ওজন কমে যাবে, কিন্তু প্রতিমুহূর্তে মেপে গেলে এই কমাটা নজরে পড়বেনা। অথচ দশবছর বাদে যে কমাটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে তা দশবছর ধরে তিল তিল করে হয়েছে। এটুকু হলো জড়বিজ্ঞানের উপমা। তা থেকে ভাষ্যকার সামান্যীকরণ করে বলেছেন—ঠিক তেমনি যোগসাধক প্রতিদিন তার আগের দিনের চেয়ে কতটা এগোলেন টের না পেলেও বহুদিন বাদে হিসাব মিলাতে বসলে দেখবেন অনেকটাই এগিয়েছেন।[49] তারপর বিবর্তনের এই ধারনা প্রয়োগ করা হয়েছে সব উদ্ভিদ ও প্রাণীর উৎপত্তির কথা বলতে গিয়ে। বোধহয় ধর্মীয় দর্শনের বা তথ্যমূলক রচন বলে এ বর্ণনা আরোহী (inductive), জড়বিজ্ঞানের রচনার মতো অবরোহী বা যুক্তিমূলক (deductive) নয়। তাই বিবর্তনের মতবাদ বৌদ্ধদর্শনে শুধু জাতকের উদ্ভব করেই ক্ষান্ত হয়েছিল একথা মেনে নিতে বাধে। জন্ম, বিবর্তন ও মৃত্যুর ছকে স্থাবর-জঙ্গম প্রকৃতি যে বাঁধা পড়েছিল বৈদিক

ঋষিদের চোখে, কাব্যে নাটকে ছড়িয়ে আছে তার অসংখ্য উদাহরণ। তাই মনে হয় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আরো বিশদ হয়েছিল, তবে হয় তা হারিয়ে গেছে, অথবা প্রাচীন অপঠিত গ্রন্থের মধ্যে লুকিয়ে আছে।

বরাহ-মিহিরের আগে পর্যন্ত ভূতাত্ত্বিক রচনা ঃ

বৈদিকযুগের শুরু থেকে খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতক পর্যন্ত নিসর্গ ভূবিদ্যা একটা ধারা অনুসরণ করে চলেছিল। তারপর বেশ কবার বিদেশী আক্রমণে এই ধারা ব্যাহত হলো। বোধহয় শিক্ষার্থী আর আচার্য দুজনেই তখন বুঝলেন যে পূর্বাচার্যদের নাম দিয়ে বিভিন্ন মতবাদ উত্তরপুরুষদের জন্য সঙ্কলন করে রাখা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। নইলে আর পাঁচটা লৌকিক বস্তুর মতো এগুলিও কালের গর্ভে বিলুপ্ত হবে। সেই অনুভূতি থেকেই এই সময়ে অর্থাৎ খ্রীস্টীয় প্রথম সহস্রকের শেষার্ধে বিভিন্ন সঙ্কলনগ্রন্থের আবির্ভাব। অর্থশাস্ত্র এরকম একটি সঙ্কলন, তবে সেখানে পূর্বাচার্যদের নাম নেই। পরবর্তীকালে রচিত বরাহমিহিরের বিভিন্ন গ্রন্থ প্রকৃতঅর্থে এই ধরনের সঙ্কলন।

আর্যদের কাছে প্রাকৃতিক শক্তিমাত্রেই দেবতা একথা মনে রাখলে কিন্তু টেকটনিক ভূকম্পনকে (ভগবান) সঙ্কর্ষণ কিংবা 'শেষ'-এর সঙ্গে জড়িত বলে আর ধর্মীয় সংস্কারের গন্ধটা থাকেনা। যেমন আধুনিক ভূবিদ্যায় ভূকম্পন প্রসঙ্গে tectonic কথাটার ব্যুৎপত্তি গ্রীকপুরাণের বিশ্বকর্মা Tekton-এর থেকে হলেও কথাটা আজ বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক শব্দ।

আর এক ধরনের ভূকম্পনের কথা পাই যার কর্তা বলভদ্র। এটাই আমাদের ভূকম্পনের মতো শুধু টেকটনিক ভূকম্পন, যার সঙ্গে অগ্ন্যুচ্ছ্বাসের কোনো সম্পর্ক নেই। বিষ্ণুপুরাণে (5.18 ও 5. 26. 11) বলা হয়েছে বলভদ্রের দাপটে যমুনা সরে আসে বৃন্দাবনের কাছে। হস্তিনাপুর নিমজ্জিত হয় গঙ্গাগর্ভে আর দ্বারকানগরী সাগরে—একথা আছে শ্রীমদ্ভাগবতে (10. 68. 41—42)। টেকটনিক ভূকম্পন যে ধরনের চ্যুতির জন্য ঘটে থাকে সেগুলি জীবন্ত (active fault), অর্থাৎ সেই চ্যুতিতল বরাবর যখন তখন নূতন করে চ্যুতি ঘটতে পারে। দিল্লীর কাছাকাছি শাখাপ্রশাখা সমেত এরকম চ্যুতি হলো মোরাবাদ চ্যুতি। ওদিকে, মহাভারতের দ্বারকার যেখানে অবস্থান ছিল বলে ভাবা হয় সে-জায়গাটি ঐতিহাসিককালে বারবার উঠেছে আর নেমেছে। এ অঞ্চল শেষবার উঠেছে 1819 সালের 16 June এর কচ্ছ ভূকম্পে।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বাস্তুভূমির শিলাসম্বন্ধে যে ভূকম্পন-সহ (earthquake-roof) বাস্তুর কথা বলা হয়েছে, তার প্রযুক্তি বরাহমিহিরের ঠিক আগের এই পরবর্তী বৈদিক যুগের।

নদীর উৎপত্তি যে পর্বতে তা বলা হয়েছে কঠোপনিষদে (2. 2. 2)। বিষ্ণুপুরাণে বলা হয়েছে জোয়ার চন্দ্রকলার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত (2.4.90)। জলাবর্ত বা hydrologic cycle-এ সূর্যের ভূমিকা বর্ণিত হয়েছে ছান্দোগ্যোপনিষদে (6.10.12)।

সারাবছর ধরে যে নদীর প্রবাহ অক্ষুণ্ণ থাকে তাকে বলে সদানীর। গণ্ডক এরকম একটি নদী। অর্থাৎ গণ্ডক যখন সদানীর বলে বর্ণিত হলো তখন পশ্চিম ভারতে আর কোনো সদানীর নেই।

গণ্ডকনদী লক্ষ্ণৌর পাশ দিয়ে আসছে। তারও অনেক পরে এসেছে মগধ সাম্রাজ্য। তাহলে মগধে যখন আর্যদের অনুপ্রবেশ ঘটল তখন তারা গণ্ডককে সারাবছর প্রবাহিত হতে দেখে তার নাম দিয়েছিল সদানীর। মগধে জরাসন্ধের রাজত্বের কথা পাই মহাভারতে। সুতরাং, জরাসন্ধের জমজমাট রাজত্বের জন্য আরো কয়েক শতাব্দী পিছিয়ে গেলে প্রায় 2000 B. C.র কাছাকাছি কোনো সময় পশ্চিম ভারতের (ঋগ্বেদে বর্ণিত) দৃষদ্বতী-সরস্বতীর শুকিয়ে যাবার সময়। হয়তো এই শুকিয়ে যাওয়াটা আবহাওয়ার আঞ্চলিক পরিবর্তনে ঘটেছিল। কারণ কাদাময় এঁটেল মাটি যেখানে, সেখানে এরকম অবস্থা ঘটলে মাটি ফেটে তার যা চেহারা হবে তা তুলনীয় কচ্ছপের পিঠের মতো। বিষ্ণুপুরাণে (6. 3. 14-38) বলা হয়েছে যে কূর্মাবতারে ভগবান বিষ্ণু পৃথিবীকে রক্ষা করেছিলেন খরা থেকে। কিন্তু রক্ষা করার পদ্ধতিটা তো আর বিষ্ণুপুরাণে পাওয়া যাবেনা, কারণ বিষ্ণুপুরাণ ধর্মগ্রন্থ। বিষ্ণু সেখানে প্রাকৃতিক শক্তি না হয়ে দেবতা।

বিষ্ণুপুরাণে আর একটি অবতারের বর্ণনা আছে—বরাহ অবতার। সেটা অবশ্য কল্পান্তরের প্রলয়ের জলে ঢাকা পড়ে যাওয়া ভূভাগ আবার কীভাবে উঠল তার বিবরণ (1. 4. 25-30)। পঞ্চানন তর্করত্ন এই অংশের অনুবাদ করেছেন : পৃথিবীকর্তৃক এইরূপে সংস্তূয়মান, সামস্বরধ্বনি শ্রীমান ধরণীধর পরিঘর্ঘর শব্দে গর্জন করিয়া উঠিলেন। তদনন্তর উৎপলপত্রসন্নিভ প্রফুল্ল পদ্মলোচন মহাবরাহ নিজ দন্তদ্বারা ধরাকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া রসাতল হইতে মহান্ নীলাচলের ন্যায় উৎক্ষিপ্ত হইলেন।…মহীকে ধারণ করিয়া উত্তিষ্ঠমান জলার্দ্রকুক্ষি কম্পিতকায়

সেই মহাবরাহের রোমে আচ্ছাদিত হইয়া মুনিগণ তাঁহার বেদময় শরীর আশ্রয় করিয়াছিলেন।

প্লাবনের পর ভূমির চেহারা কিরকম দাঁড়ায় তা ভাবলে বরাহ-অবতারের রহস্যটা বোঝা যায়। বিষ্ণুপুরাণের যে অংশে পুরাণবর্ণিত গর্গ ইত্যাদির ভূকম্পন বিষয়ক প্রসঙ্গ আছে, নিঃসন্দেহে সে অংশ প্রাচীন। কিন্তু অবতারের ধারণাটা পরবর্তীকালের বলে বরাহ ও কূর্মাবতারের বর্ণনা বুদ্ধের পরের যুগের বলে মনে করা যেতে পারে।

চাষযোগ্য জমির সমস্যাগুলি এখন মানুষের কাছে আগের যুগের চেয়ে অনেক বেশি স্পষ্ট। তাই বহতা-নদীতে নূতন জেগে-ওঠা বালুচরের অধিকার নিয়ে কিছু কিছু আইনগত সমস্যা দেখা দিতে শুরু করেছে (নারদ সংহিতা-14.6.17-18)। নূতন পড়া চরের উর্বরতা যে বেশি তা জানা ছিল, আর সেই জ্ঞান প্রয়োগ করে নদীতে বাঁধ (সেতু) দিয়ে জল বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে দিয়ে জমির উর্বরতা বাড়াবার প্রযুক্তি খুবই চালু ছিল। হতে পারে এভাবে ভূগর্ভে ভূজল পুনঃসঞ্চালন (recharging)ও বাঁধ দেবার আর-একটা উদ্দেশ্য।

জলপ্রবাহের কোনোটাকে বলা হয়েছে নদী, যেমন গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, কৃষ্ণা, নর্মদা ইত্যাদি। আবার কোনোটাকে বলা হয়েছে নদ, যেমন সিন্ধু, শোণ, চম্বল, দামোদর, ব্রহ্মপুত্র ইত্যাদি। নদ ও নদীর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য কি কিছু ছিল? যাস্কের নিরুক্ত দেখলে বোঝা যায় যে সংস্কৃতে প্রতিটি নামবাচক বিশেষ্য, তাদের সম্বন্ধে ব্যবহৃত বিশেষণ এবং ক্রিয়াপদের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ আছে। সুতরাং কোনোটিকে নদ আর কোনোটিকে নদী বলে শ্রেণীবিভক্ত করার নিশ্চয়ই কোনো ভিত্তি আছে। তবে দুটো কারণে তা উদ্ধার করতে পারিনি—প্রথমত, নিরুক্তের কোনো পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ পাইনি, আর দ্বিতীয়ত নদনদীগুলির সেযুগে কি নাম ছিল তাও বার করতে পারিনি। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস নিয়ে যাঁরা গবেষণা করছেন তাঁদের পক্ষে এসম্বন্ধে অনুসন্ধানের সুযোগ অবশ্যই বর্তমান লেখকের তুলনায় বেশি। তবে নদ ও নদীর মধ্যে যেটুকু তফাৎ চোখে পড়েছে তাতে মনে হয়েছে এটা drainage system বা জলপরিবাহ ধারার পার্থক্য। নদগুলি দেখছি কোনোটাই শাখানদীতে (distributaries) বিভক্ত হয়নি, বরং মিলেছে গিয়ে অন্য একটি নদীতে। অর্থাৎ নদের দেহ থেকে কোনো সন্তান সৃষ্টি হয়নি, তাই সে পুরুষ। পরে নদীর সঙ্গে মিলনের পর নিম্নতর অঞ্চলে এসেছে সন্তানরা। পিতা নদের জলে পুষ্ট হয়ে মাতানদীর দেহ থেকে সৃষ্টি হয়েছে

সন্তানরা। তাই গঙ্গা, কাবেরী, গোদাবরী—এরা নদী, কিন্তু পেনার, চম্বল, ব্রহ্মপুত্র, এরা নদ।

প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে পরিবেশ প্রসঙ্গে :

ব্রহ্মবিদ্যাই বৈদিকসমাজে শেষ লক্ষ্য, কারণ ব্রহ্মবিদ্যা আয়ত্তে এলে প্রাকৃতিক শক্তি, অর্থাৎ প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এই ব্রহ্মবিদ্যার সাধনায় কি প্রাকৃতিক পরিবেশ দরকার তা স্পষ্ট বলা আছে বৃহদারণ্যক উপনিষদে (6.3.396) —মধুবাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্ণঃ সন্ত্বোষধীর্ভূঃ স্বাহা। অর্থাৎ, ঋতপ্রার্থীর (তপস্বীর) জন্য বায়ু ও নদীসমূহ মধুক্ষরণ করুক, ওষধীসমূহ মধুময়ী হউক! অন্য কোনোদেশের পৌরাণিক রচনায় এত স্বল্পকথায় সাধনার উপযুক্ত পরিবেশ বর্ণিত হয়েছে বলে জানা নেই। ঋগ্বেদের প্রথম স্তরে, যেখানে সোমলতা পেষণ করে বলে প্রস্তরকে প্রণাম জানানো হয়েছে, সেখানেও বৃক্ষ সম্বন্ধে প্রশস্তি আছে। শুধু কাঠের জোগানদার হলে নিশ্চয়ই গাছকে দেবতারূপে পূজা করার নির্দেশ থাকতনা। বিভিন্ন কাব্যে এক পরিবেশের নর বা নারী অন্য পরিবেশে গিয়ে সুখী হচ্ছে বা কষ্ট পাচ্ছে, তারও বিবরণ আছে অনেক। তাই মনে হয় খ্রীস্টীয় প্রথম শতকের অনেক আগে থেকেই পরিবেশ প্রসঙ্গে এদেশে চিন্তাভাবনা শুরু হয়ে গেছে, হয়তো শাস্ত্রও রচিত হয়েছে কিছু কিছু।

অনুমান করা হয় এমনি একটি গ্রন্থ 'ভাবপ্রকাশ' রচিত হয়েছিল 15A.Dর কাছাকাছি কোনো সময়ে। প্রধানত আয়ুর্বেদের বই হলেও এই গ্রন্থে পরিবেশের প্রাচীনতম শ্রেণীবদ্ধ বর্ণনা পাই। প্রথম শ্লোকে বলা হয়েছে, জমি তিনরকমের : অনুপ অর্থাৎ জলীন (influent), যেখানে জমির উপর জল থাকেনা; জঙ্গল; আর সাধারণ। 2—4 শ্লোকে অনুপ অঞ্চলের বর্ণনা আছে, সেখানে পাখির মধ্যে আছে সারস, রাজহাঁস, করন্ত (বেলেহাঁস), চক্রবাক আর অনুরূপ পাখি; জন্তু-জানোয়ারের মধ্যে খরগোস, বরাহ, মহিষ ও রুরু (মৃগবিশেষ) ইত্যাদি। অনুপ অঞ্চলের গাছ কলা আখ, শাল ইত্যাদি। মাটির রঙ গাঢ়। ফুলগাছ নানা-ধরণের। বর্ণনা থেকে বহরমপুর—বীরভূমের মধ্য দিয়ে শাল-সেগুনের যে বলয় প্রসারিত সেসব জায়গার কথা মনে হয়। এই বিভাগ অনুযায়ী বীরভূমের সিউড়ি, বোলপুর, বর্ধমানের দুর্গাপুর, আসানসোল, বাঁকুড়া জেলা আর পুরুলিয়া জেলার প্রায় সবটাই অনুপ। ভূজল সংস্থানের দিক থেকে influent বলে চিহ্নিত।

জঙ্গল-এর বর্ণনা আছে 5-7 শ্লোকে : যেসব জায়গা নির্মেঘ আকাশের মতো পরিষ্কার, উঁচু, জল আর ছোটগাছ (মনে হয় ঝোপ) দুইই কম, গাছের মধ্যে শমী (বাব্‌লাজাতীয় গাছ), করীর (বাঁশের অঙ্কুর বা ছোট ছোট তীক্ষ্ণাগ্র ঘাস), বেল, অর্ক (আকন্দ) আর অনুরূপ গাছপালা; প্রাণীর মধ্যে হরিণ এন, পৃষত (শ্বেতবিন্দুযুক্ত হরিণ), খর (গর্দভ), গোকর্ণ (অশ্বেতর) এবং অনুরূপ প্রাণী যেসব জায়গার বৈশিষ্ট্য। গাছপালা আর জন্তুজানোয়ারের তালিকা থেকে মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট আর কর্নাটক, মহারাষ্ট্র ও পূর্বরাজস্থানে স্বল্পবৃষ্টি অঞ্চলের কথা মনে হয়।

সাধারণ অঞ্চল অনুপ আর জঙ্গল-এর মাঝামাঝি। সেখানে বৃষ্টি-অনাবৃষ্টি, শীত গ্রীষ্মের মধ্যে সাম্যাবস্থা।

ভাবপ্রকাশের বর্ণনা পড়লে বোঝা যায় যে সেযুগে সুন্দরবনের মতো কোনো জলা অথচ জঙ্গলা জায়গার কথা গ্রন্থকারের জানা ছিলনা। পরে যখন এরকম অঞ্চলের কথা জানা গেল তখন দেখা গেল যে একে ভাবপ্রকাশ-এর জঙ্গল শ্রেণীতে ফেলা যাচ্ছে না, অথচ জায়গাটা জঙ্গল। তাই পরবর্তীকালের গ্রন্থ তন্ত্রান্তর-এ বলা হয়েছে যে-জায়গা বন্ধুর আর প্রচুর জলসম্পন্ন, আর যে জায়গার সাধারণ রোগ বাত ও কফ, সে জায়গাকে বলা চলে জঙ্গলে জায়গা। তবে এ বর্ণনার লক্ষ্যও সুন্দরবন নয়, কারণ সুন্দরবন বন্ধুর নয়, সমতল। তন্ত্রান্তরের বর্ণনার আদর্শ সম্ভবত তরাই, খাসি জয়ন্তিপাহাড়, মেঘালয় ইত্যাদি।

তবে সবসময়ে পরিবেশ, বিশেষ করে জল যে ঠিক মনোমতো থাকত তা নয়। তখন দরকার হতো পরিবেশ পরিশোধনের। কারো কারো মতে[52] আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রে জল পরিশোধনের যেসব প্রক্রিয়া পাওয়া যায় তা সম্ভবত 2000 B.C.র মতো প্রাচীন। ফোটানো ছাড়াও জল পরিশুদ্ধ করতে বিভিন্ন মণিক ও উদ্ভিজ্জের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। এই থেকেই পরবর্তীকালে জলে এলাচ, বাদাম, ফটকিরি ইত্যাদির ব্যবহার প্রচলিত হয়। আরো পরের যুগে সুশ্রুত সংহিতায় ঘোলা জল ফটকিরি দিয়ে পরিশোধন করে ছেঁকে নেবার নির্দেশ আছে।

এর পরবর্তীযুগে নিসর্গ ভূবিদ্যার বিস্তারিত আলোচনা পাই বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায়। বলতে গেলে বৃহৎসংহিতা এই বিষয়গুলিতে কোষগ্রন্থ। তাই পরবর্তী অধ্যায়ে স্বতন্ত্রভাবে বৃহৎসংহিতায় বর্ণিত নিসর্গ ভূবিদ্যার তত্ত্বগুলি আলোচিত হয়েছে।

ছয় ঃ বৃহৎসংহিতার নিসর্গ ভূবিদ্যা

মণিকবিদ্যা প্রসঙ্গে তৃতীয় অধ্যায়ে বরাহমিহির ও বৃহৎসংহিতার কথা এসেছিল। এগুলি ছাড়াও বৃহৎসংহিতায় আছে নিসর্গ ভূবিদ্যার বিস্তারিত আলোচনা। তিনটি অধ্যায়ে ছড়িয়ে আছে এসম্বন্ধে বিভিন্ন প্রসঙ্গ। এই অধ্যায়গুলি হলো : 32 (ভূকম্পলক্ষণাধ্যায়:) 33 (উল্কালক্ষণাধ্যায়:) ও 54 (দকার্গলাধ্যায়:)। শেষেরটি ভূজলসম্পর্কিত প্রযুক্তিবিদ্যা।

ভূকম্পলক্ষণাধ্যায় ঃ

ভূমিকম্পের কারক যে রুদ্রের সঙ্কর্ষণরূপ তা বরাহমিহিরের পূর্ববর্তী রচনায় আমরা দেখেছি। বৃহৎসংহিতায় শুধু tectonic ভূকম্পনই নয়, আরো নানাধরনের ভূকম্পন (বোধহয় ভূমিকম্প বলাই ঠিক হবে) আলোচিত হয়েছে। খানিকটা অতিরঞ্জন আর কিছুটা ভূমিকম্পের ফলাফল্ থেকে সেগুলিকে আলাদা আলাদা করে চিহ্নিত করার কাজে নানারকম বিভ্রান্তির অবকাশ আছে। তবু এসম্বন্ধে চেষ্টা করা যেতে পারে।

প্রথম শ্লোকে কোনো মুনি সাগরতলে বসবাস করে মাঝে মাঝে ভূগোলককে কাঁপিয়ে থাকেন এরূপ কথিত আছে। মুনি অর্থ শুধু ঋষি নয়, জিনও বটে। সুতরাং, প্রথম শ্লোকে সংকর্ষণাত্মক ভূকম্প, কিন্তু সাগরগর্ভে উৎপত্তি (submarine earhtquake) এরকম ভূকম্পন বর্ণনা করা হয়েছে বলে মনে হয়। কিন্তু কথাটা কে বলেছেন ? কোনো পূর্বাচার্য নিশ্চয়ই ! এরকম ভূকম্প tsunamiর জনক। এদেশে বসে বরাহমিহিরের পক্ষে এরকম ভূকম্পন দেখা সম্ভব নয়। এর বর্ণনা মিলতে পারে ভূমধ্যসাগরীয় কিংবা ক্যাস্পিয়ান হ্রদের ধারের জনবসতিতে। সম্ভবত এ বর্ণনা বহু প্রজন্ম ধরে সঞ্চারিত বর্ণনা, তার অভিজ্ঞতা ভারতের বাইরে। ব্যাপারটা বরাহমিহির বুঝতে পারেননি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাবে। তাই ঐ শ্লোকেই সামান্যীকরণ করেছেন এই বলে—মকর, মাছ, বড় মাছ, কুমীর, কচ্ছপ, শুশুক প্রভৃতির

উৎপাতে এইভাবে ভূকম্পের উৎপত্তি ঘটে। এই উৎপত্তির সমর্থনে বলা হয়েছে কাশ্যপও এই মত সমর্থন করেছেন। কিন্তু কোন মতটা, পূর্বাচার্যের না বরাহ-মিহিরের, তা কিন্তু স্পষ্ট নয়।

2—6 শ্লোকে নানাভাবে ভূকম্পের যে কারণ বর্ণনা করা হয়েছে তা আমরা প্রায় সবাই ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি। পুরাকালে পর্বতের পাখা ছিল। তারা প্রায়ই ভূতলের বিভিন্নস্থানে হঠাৎ হঠাৎ বসে পড়ত, আবার হঠাৎ হঠাৎ উড়ে যেত। তাদের নামা আর ওঠার বেগে পৃথিবী কেঁপে কেঁপে উঠত। এতে বিরক্ত, বিব্রত, অপমানিত হয়ে ব্রীড়াবনতা পৃথিবী অভিযোগ জানাতে দেবসভায় উপস্থিত হলেন। পিতামহ ব্রহ্মা সাশ্রুলোচনা বসুমতীর কাছে সব শুনলেন। তারপর ইন্দ্রকে কুলিশ নিক্ষেপ করে পর্বতের পক্ষছেদন করতে নির্দেশ দিলেন। ইন্দ্র তখন পৃথিবীকে বললেন, মা ভৈষী! ভয় করোনা! আমি তোমার এ ভয় দূর করছি।

শব্দ ধরে অর্থ করতে গেলে অবিশ্বাস্য এ বর্ণনা। বৃহৎসংহিতায় বাস্তুবিদ্যার অধ্যায়ে বাড়ীর ভিত্তির প্ল্যান নিয়ে আলোচনা আছে বিশদভাবে, আর প্রাসাদলক্ষণাধ্যায়ে internal decoration-এর চূড়ান্ত করা হয়েছে, সেখানে এমন একটা কারণের বর্ণনা আপাতদৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু বরাহমিহিরের বৈজ্ঞানিক সত্তার কথা ভেবে আর-একটু তলিয়ে দেখা যেতে পারে এই কথা মনে রেখে যে প্রচলিত কাহিনীর পিছনেও কিছুটা সত্য থাকে।

এই কারণ বলা হয়েছে বশিষ্ঠ আর পরাশরের বর্ণনা থেকে। অর্থাৎ অনেকটা আগের আর একযুগের। বশিষ্ঠের যুগে সংকর্ষণাত্মক ভূকম্প জানা ছিল। আমরা জানি tectonic earthquake মাত্রই চ্যুতি (fault)-এর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। যাঁরা ভূকম্পবলয়ে থাকেন তাঁদের কাছে বড় একটা ভূকম্পনের পর কোন অঞ্চল বেশ ক-মিটার উঠে পড়া বা বসে যাবার অভিজ্ঞতা তেমন কিছু নতুন নয়। হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন সেই জায়গা থেকে পর্বতটা উড়ে গিয়ে জায়গাটা ফাঁকা হয়ে গেছে, কিংবা হঠাৎ একটা পর্বত উড়ে এসে বসে জায়গাটা ভরিয়ে দিয়েছে। বস্তুত এটাও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নয়, বারবার শোনার আর বলার ফলে অতিরঞ্জিত।

ইন্দ্র যে পর্বতের পক্ষছেদন করে বসুমতীর অস্বস্তি দূর করলেন সেটার তাৎপর্য সম্ভবত সেযুগের মানুষের ভূকম্পবহুল আদি বাসস্থান ছেড়ে নতুন জায়গায় প্রব্রজন

(migration)। ইন্দ্রর এক অর্থ তো নেতাও বটে, শুধু শুধু দেবরাজ বলে ভাবার কি দরকার !

বশিষ্ট আরো একটা কারণ নির্দেশ করেছেন। শ্লোক 2তে বলা হয়েছে বায়ুতাড়িত হয়ে ভূমি (সম্ভবত আলগা মাটি) বিতাড়িত হয়। এও ভূকম্পন, তবে ভূকম্পন বলতে আমরা যা বুঝি তা অবশ্যই নয়। তবে এটা ল্যাণ্ডস্লাইড-জাতীয় ধস নামাও হতে পারে। কথিত আছে, এভাবে ভূকম্পের উৎপত্তি দেখেছিলেন কোন এক বৃদ্ধ গর্গ (কেচিৎবৃদ্ধগর্গাদয়ঃ ইদং ভূকম্পদৃষ্টকারিতং প্রাহুঃ)—একথা বলেছেন বশিষ্ট। তাই গর্গাদি ঋষির অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র হতে পারে মধ্যএসিয়া-মধ্যইওরোপের ভূকম্প-বলয়, যে অভিজ্ঞতার রেশ ছিল হিমালয়ের কোলে তক্ষশিলা-সিরকাপ অঞ্চলে উপনিবেশ পর্যন্ত। তাই এখানে retaining wall-এর অনুরূপ গঠন আর ভূকম্পরোধক ভিত্তি দুইই পাওয়া গেছে এই অঞ্চলে।

কিন্তু 8-9 শ্লোকে পৌঁছে আবার বক্তব্য অস্পষ্ট হয়ে আসছে। এখানে বলা হয়েছে ইন্দ্রের কুলিশনিক্ষেপের ফলে আকাশে ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে। সূর্যের আলো ক্ষীণ হয়ে আসছে, এমনকি সূর্য ও চন্দ্রের গ্রহণ লাগছে। জল কম্পিত হচ্ছে, অগ্নি কম্পিত হচ্ছে। এ ভূকম্পের নাম বায়ব্য ভূকম্প। এই অবস্থা সপ্তাহকাল চলে আবার পূর্বাবস্থা ফিরে আসে (পূর্বলিঙ্গানি ভবন্তি, শ্লোক 8)। আবার বলা হয়েছে আকাশ থেকে উল্কাপাত হয়, তারকাপাত হয়। সপ্তাহকাল ধরে অগ্নি বাতাসের সঙ্গে যদৃচ্ছা বিচরণ করে বেড়ায় (13)। গর্গও অনুরূপ বর্ণনা করে গেছেন। এর আগের শ্লোকে (12) বর্ণনা আছে আগ্নেয় ভূকম্পের। তার সপ্তাহকাল আগে থেকে নানারকম অজশব্দ, অজাতশব্দ (অর্থাৎ যে শব্দের উৎপত্তির কারণ বোঝা যায়না) ও আগ্নেয়মণ্ডল সৃষ্টি হয়। বায়ব্য ভূকম্পের ফলে গাছপালা ভেঙে পড়ে, চিত্ত উন্মত্ত হয়, জ্বর কাশি হয়, বণিকের লোকসান হয়। ওদিকে, আগ্নেয় ভূকম্পে জলবাহী মেঘ, জলাশয় ইত্যাদি ধ্বংস হয়, লোকে উদরাময়ে ভোগে। বায়ব্য আর আগ্নেয় ভূকম্পের যে বিবরণ এই অংশে উদ্ঘাটিত হয়েছে তা মেলানো যায় 1755 সালের লিসবন ভূকম্পের সঙ্গে। তবে প্লিনির[22] পম্পেই-বিধ্বংসী ভিসুভিয়াসের অগ্ন্যুৎপাতের বর্ণনা বৃহৎসংহিতার আগ্নেয় ভূকম্পের আরো কাছাকাছি :

A cloud...was ascending, the appearence of which I cannot give you description than by likening it to that of a pine tree,

for it shot up to a great helght in the form of a very tall trunk, which spread itself out at the top into a sort of branches......... it appeared sometimes bright and sometimes dark and spotted, according as it was either more or less impregnated with earth and cinders··· He was now so close to the mountain that cinders...which grew more abundant and hotter the nearer he approached, fell into ships, together with pumice stones, and black pieces of burning rock...they were in danger too not only of being aground by the sudden retreat of the sea, but also from vast fragments which rolled down from the mountain, and obstructed all the shore...Meanwhile the broad flames shone out in several places from Mount Vesuvius, which the darkness of night contributed to render still brighter and clearer... It was now day everywhere else, but there a deeper darkness prevailed than in the thickest night...(p.46-47).

অগ্নির যদৃচ্ছা বিচরণ, আগ্নেয়মণ্ডলের উৎপত্তি, অগ্ন্যুৎপাত, তারকাপাত সবই বোঝা যায় এ-বর্ণনা থেকে। আর বর্ণনার স্পষ্টতায় এটা যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আর বৃহৎসংহিতারটা যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নয় তাও বোঝা যায়।

বিভিন্ন শ্লোকে দেওয়া আগ্নেয় ভূকম্পের বর্ণনা পড়তে গিয়ে মনে হয়েছে, এগুলি Volcanic eruption-এর এক-একটি phase। 19 শ্লোকে ইষ্টক বৃষ্টির কথা আছে। এটি অগ্ন্যুচ্ছাসের সময় বিচ্ছিন্ন পাথরের টুকরো, বা pyroclastics-এর বর্ষণ। অথচ এখানে কিন্তু আগ্নেয়গিরির কোনো বর্ণনা নেই। তাই আরো মনে হয় যে এই বর্ণনাগুলি স্মৃতিরূপে আর্যদের আদি বাসস্থান থেকে বংশ-পরম্পরায় সঞ্চারিত। ভূকম্পের ফলে মেঘ জমে ধারাবর্ষণের কথা আছে, সে মেঘ নীলবর্ণ। আবার কোথাও কোথাও বিদ্যুত চমকাচ্ছে, তাতে সেই মেঘপুঞ্জ হঠাৎ হঠাৎ ঝলসে উঠছে। ইদানীং অগ্ন্যুৎপাতের বহু চলচিত্র থাকায় এ দৃশ্যটা অনুভব করতে অসুবিধা হয়না। এটা আকাশের বিদ্যুত নয়, জলন্ত গাছপালার আগুন। অগ্ন্যুৎপাতে লাভা বেরোলে তার তাপে বহুদূর পর্যন্ত গাছপালা আর দাহ্যবস্তু হঠাৎ এমনি দপ্ করে জ্বলে ওঠে।

আবার বলা হয়েছে, ভূকম্পনের মেয়াদ ছ-মাস, কিন্তু বায়ুজনিত শব্দের মেয়াদ দুমাস (নির্ঘাতো দ্বাভ্যাং মাসাভ্যাং পাকং যতি...32/23)। আবার কোনো কোনো মুনি, যেমন গর্গ বলেছেন, শব্দ আর উল্কাপাতাদি উৎপাত প্রায় সমান সময় ধরে চলে। বরাহ বলছেন, সমাস-সংহিতার আচার্যও একথা সমর্থন করছেন।

বিভিন্ন ভূমিকম্পের যেসব ফলাফল বলা হয়েছে তা থেকে সঙ্ঘর্ষণাত্মক ভূকম্পন আলাদা করা যায়। পর্বতের ওড়ার অতিশয়োক্তিতে প্রকাশিত জমির ওঠা বা বসে যাওয়া (emergence বা subsidence) তার প্রধান লক্ষণ। Tectonic earthquake বলে চিনতে অসুবিধা হয়না। আগ্নেয় ভূকম্প Volcanic eruption এবং Volcanic earthquake দুটোই। কিন্তু বায়ব্য-ভূকম্প আদৌ ভূকম্প কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহ হয়। অবশ্য কম্প যদি movement হয়, তবে বায়ব্যভূকম্প earth movement অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকতে পারে। অর্থাৎ ধসনামা থেকে শুরু করে কাদাপ্রবাহ (earthflow, mudflow) সব কিছুই হতে পারে।

বায়ব্যভূকম্প সম্বন্ধে এ অনুমান আরো দৃঢ় হয় যখন দেখি ভারতীয় উপদ্বীপে বেশ ক-টি জায়গা (শ্লোক 9) সম্বন্ধে বরাহ বলেছেন···এষাং পীড়াকরম্। তথা ইষ্টকবৃষ্টিং। ইষ্টমভিমতাং বৃষ্টিং করোতি। এই অঞ্চলগুলির মধ্যে আছে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, দ্রাবিড়, শবর (শ্লোক 15)··· । আরো অনেক নামের পর রয়েছে মালব (শ্লোক 19)। ভূবিদমাত্রেই জানেন এসব জায়গা উপমহাদেশের সুস্থিত Peninsular shield এর মধ্যে, যেখানে ভূকম্পের প্রাচুর্য ও তীব্রতা, দুটোই খুব কম। তাহলে ভূকম্প বলে যা বর্ণিত হয়েছে তা কি ? বর্ষাশেষের ঘূর্ণিঝড় নয় তো ? কারণ ঘূর্ণিঝড় ধরে নিলে একদিকে যেমন জলবাহী মেঘ, মেঘমধ্যে বিদ্যুৎ, পর্বতের মতো স্থির মেঘ, গম্ভীর শব্দ (শ্লোক 17) ইত্যাদির কারণ পাওয়া যায় তেমনি উপদ্বীপ ভারতের মধ্যবর্তী অঞ্চলগুলিতে ভূকম্পন ঘটারও যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা সম্ভব হয়।

উল্কালক্ষণাধ্যায় ঃ

প্রথম শ্লোকে আছে উল্কা কাকে বলে। শুভফল অর্থাৎ পুণ্য ক্ষয় হলে স্বর্গবাসীরা উল্কারূপে ভূতলে পড়ে। বরাহমিহির বলছেন, এটাই চলতি মত। কিন্তু গর্গাদি ঋষিরা অন্যকথা বলে গেছেন। তাঁদের মতে লোকপাল ও মানুষের

শুভাশুভের সূচনারূপে প্রোজ্জ্বল উল্কার উৎপত্তি। গর্গদের মতটা অনেক বেশি স্পষ্ট। অজ্ঞ প্রাচীন মানুষের কাছে এটা ভূকম্পন, ঝড় ইত্যাদির মতোই একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগ। শুভ কথাটার সেখানে ধ্বন্যাত্মক প্রয়োগ, যেমন চলতি কথায় বলে 'অমুকের যদি ভালোমন্দ কিছু ঘটে যায়', যদিও মন্দটাই সেখানে বোঝানো হয়। গর্গাদি ঋষির মত সমর্থিত হয়েছে স্বল্প সংহিতায়।

উল্কা পাঁচ রকমের: ধিষ্ণ্য, উল্কা, অশনি, বিদ্যুৎ ও তারা। এগুলোর লক্ষণও আলাদা আলাদা করে বলা হয়েছে। যেমন অশনি পড়ে ভীষণ শব্দ করতে করতে। আর তার আঘাতে সব প্রাণী, গাছপালা, পাথর এমনকি ধরাতল বিদীর্ণ হয়। এগুলো নাকি চাকার মতো গোলাকার আর চাকার মতো ঘুরতে ঘুরতে পড়ে (14)। অশনিকে বাজ-এর সঙ্গে মেলানো যেত যদি এই চাকার মতো ঘোরার কথা না থাকত। ওটুকু আছে বলেই fire-ball এর কথা মনে পড়ে। মাত্র ক-বছর আগে উত্তর চব্বিশ পরগণার কোনো গ্রামে fire-ball এর অভিজ্ঞতা কিন্তু ঠিক এই ধরনের।

বিদ্যুৎ প্রচণ্ড ভীতিজনক, আর সবকিছু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে। অশনির মতো বিদীর্ণ করার কথা কিন্তু কোথাও নেই (5)। সুতরাং এটা নিশ্চয়ই বাজ।

ধিষ্ণ্য অপেক্ষাকৃত দুর্বল বলা হয়েছে। তার দুহাত বিস্তৃত প্রোজ্জ্বল পুচ্ছ (6)। বর্ণনা থেকে মনে হয় শ্রাবণ আর কার্তিক মাসের আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকলে মাঝে মাঝে যে, তারা-খসা দেখা যায়, তাই। shooting star-এর মতোই এর উৎপত্তি ধনুরাশির দিকে। অর্থাৎ এটা ভূপৃষ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছয়ই না, তাই দুর্বল।

এপর্যন্ত তো বোঝা গেল। গোলমাল বাধে এসে উল্কাতে। কারণ, বলা হয়েছে যথা যথা নিপততি তথা তথা বৃদ্ধিং যাতি (8), অর্থাৎ যেখানে যেখানে পড়ে সেখানে সেখানে পড়ার পর বৃদ্ধি পায়। আরো বলা হয়েছে, তা যেমন ছোট হয়, আবার তেমনি সাড়ে তিন হাত লম্বা অর্থাৎ প্রমাণ মানুষের সমান লম্বাও হতে পারে।

উল্কার উৎপত্তি:

উল্কার উৎপত্তি সম্বন্ধে বরাহ নিজের কথা কিছু বলেন নি, কিন্তু আলোচনা করেছেন কাশ্যপ ও অন্য আচার্যের (?) মতবাদের।

কাশ্যপ বলছেন রাজা ও রাষ্ট্রের ধ্বংসের জন্য বহ্নি থেকে এর উৎপত্তি। যা

জ্বলে তাই আগুন, সুতরাং বহ্নি থেকে উৎপত্তির কথাটা বোঝা যায়। বলা হয়েছে উল্কা চন্দ্র ও সূর্যকে বিশেষরূপে স্পর্শ করে। তারপর চন্দ্র ও সূর্য থেকে বেড়িয়ে ভূতলে পড়ে ও ভূকম্পের কারণ হয়। রাজার ভয়ের কারণ দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টি উল্কাপাতের সম্ভাব্য ফল।

অন্য আচার্যের বিবরণে বলা হয়েছে উল্কা দক্ষিণাবর্তে (অপসব্য) ঘোরে সূর্যের চারিদিকে। এই অংশটা লক্ষ্যণীয়। অপসব্য কথাটার অর্থ বিপরীত-ক্রমে। প্রশ্ন হলো—কার বিপরীতক্রমে? মনে হয় সূর্যের বিপরীতক্রমে। অর্থাৎ আমরা সূর্যকে যেমন দেখি পূব থেকে পশ্চিমে যেতে, উল্কাকে তেমনি দেখব পশ্চিম থেকে পূবে যেতে।

জ্যোতির্বিদ্যা বরাহমিহিরের অনেক আগে থেকেই যথেষ্ট উন্নত। সুতরাং উল্কার গতিপথের বর্ণনা কাকতালীয় হবার সম্ভাবনা কম। উল্কার বর্ণনায় বারবার তার পুচ্ছের কথা বলা হয়েছে। আবার 16 শ্লোকে বলা হয়েছে যে অন্য আচার্যও বলেছেন যে অপঘাতে পড়ে নক্ষত্রের ক্ষয় হয়ে নক্ষত্রব্যূহ থেকে গ্রহদের এবং উল্কার সৃষ্টি হয়। গ্রহ ও উল্কার তাহলে catastrophic origin বলে মনে করা যেতে পারে। তাছাড়া এই উল্কা আধুনিক ধূমকেতুও হতে পারে। খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে গ্রীক বর্ণনায় পাওয়া ধূমকেতুকে হ্যালির ধূমকেতু বলে চিহ্নিত করা গেছে। ভারতে তা কারো নজরে পড়েনি এটা বোধহয় বিশ্বাসযোগ্য নয়। 16 শ্লোকের বর্ণনায় বিশেষ করে বাঁকা-লেজওলা পুচ্ছ, দলিত খণ্ডিত পুচ্ছ ইত্যাদি কথাগুলি তারা-খসার চেয়ে ধূমকেতুর বর্ণনারই বেশি কাছাকাছি। অন্য কোথাও আলাদা করে ধূমকেতুর বর্ণনা চোখে পড়েনি বলেই আরো মনে হয় ধূমকেতুকে উল্কার একটা শ্রেণী বলেই ধরা হয়েছিল। তবে 11 অধ্যায়ে কেতুচরা বলে যা বলা হয়েছে, সম্ভবত তা জ্যোতিষের কেতু'র সঞ্চার সম্বন্ধে। ধূমকেতু নয়।

কিন্তু ধূমকেতু কথাটা তাহলে কি বোঝাত স্বভাবতই এরকম প্রশ্ন ওঠে। কথাটা এসেছে আরো পরের যুগে কোনো সময়ে। শব্দার্থ ধরলে দাঁড়ায় এমন এক বস্তু যার ধোঁয়ায় তৈরি লেজ। Comet-এর অবশ্যই ধোঁয়ায় তৈরি লেজ নয়। অন্যান্য ভাষায় Comet-এর* সমার্থক শব্দ কিন্তু ধূমকেতুর সমার্থক নয়।

---

* Kometes (Gr. ও L.) অর্থ long-haired star (C.O.D)। এ বর্ণনা গ্রহণযোগ্য। তবে ধূমে তৈরি পুচ্ছ (কেতু)...একথাটা বোধ হয় ঠিক নয়।

আমার মনে হয় হর্ষচরিত ইত্যাদি কাব্যে ধূমকেতু বলতে বোঝানো হয়েছে হাউই (বাজি, rocket)কে। চীনে খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে এই হাউই উৎসবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ভারতের সঙ্গে চীনের যোগাযোগও বহুদিনের। চীনা ব্যবসায়ীরা এদেশের কোনো উৎসবে, রাজার বিজয়োৎসবে, অভিষেকে, রাজপুত্র রাজকন্যার জন্মে হাউই ছেড়ে আনন্দ করত নিশ্চয়ই। মহার্ঘ্য এই বাজি সাধারণ লোকে দেখে হতবাক হয়ে যেত। সেই থেকেই ধূমকেতু কথাটা এসেছে কাব্যে বেশ পরের যুগে। যতদূর দেখেছি, কালিদাসের রচনায় বহু উৎসবের বর্ণনা থাকলেও কোথাও ধূমকেতুর কথা নেই।

দকার্গলাধ্যায়ঃ

মহাভারতে ব্যাসকূটের কথা সবাই জানেন। বলা হয়, গণেশকে এইসব ব্যাসকূট মাঝে মধ্যে দিয়ে ব্যাসদেব সময় করে নিতেন নূতন শ্লোক রচনার, কারণ মহাভারতের লিপিকাররূপে কাজ করতে গণেশ রাজি হয়েছিলেন মাত্র একশর্তে যে, না-থেমে রচনা করে যেতে হবে। আর ব্যাসদেব তার পাল্টা শর্ত করেছিলেন যে অর্থ না-বুঝে লেখা চলবেনা। ব্যাসকূটের অর্থ বুঝতে গণেশ যে সময় নিতেন সেই ফাঁকে ব্যাসদেবের রচনা অনেকটা এগিয়ে যেত। শুধু ব্যাসদেবই নন, সংস্কৃতে অনেক শাস্ত্রকারই এরকম কূট শ্লোক রচনা করে গেছেন যার বহু অর্থ হয়। লোহাকে সোনা করার কিমিতিবিদ্যার আলোচনায় এরকম কূটশ্লোকের ব্যবহার আছে।

দকার্গলম্ শব্দটি এরকম কূট শব্দ বলে মনে করেছেন টীকাকাররা। আসল কথা (উ) দক+অর্গলম্। উদক শব্দের অর্থ জল, আর অর্গল শব্দের অর্থ খিল, আবার কারো কারো মতে বাসস্থান।

দকার্গলাধ্যায়ের বক্তব্যে আসা যাক। 1, 2 শ্লোকে ভূমিকাঃ এবার ভূজল অনুসন্ধানের বিজ্ঞান ব্যাখ্যা করা হবে যা আধ্যাত্মিক উন্নতি ও যশের কারক, কারণ এ-বিজ্ঞান জলের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে সাহায্য করে। ভূগর্ভের জলবাহী শিরাগুলি নরদেহে ধমনীর মতো, কোথাও উপরে আবার কোথাও নীচে প্রবাহিত। মাটির বৈচিত্র্যের ফলে বৃষ্টির জলের স্বাদ এক এক জায়গায় এক এক রকম হয়। তাই পরিবেশ অনুযায়ী ভূজল পরীক্ষা করে দেখা দরকার।

3, 4, 5 শ্লোকে বিভিন্ন দিকের অধিপতি দেবতাদের নামঃ **ইন্দ্র, অগ্নি, যম,**

নিরিত্তি, বরুণ, পবন, চন্দ্র ও শিব। বিভিন্নদিকে বহমান জলের শিরাগুলির নাম সেইসব দেবতাদের নামে। নবম দেবতা ভূগর্ভের প্রধান শিরা, যার শাখাপ্রশাখা শত শত শিরা। ভূগর্ভ থেকে আসা শিরা যেখানে ভূপৃষ্ঠকে ছেদ করে সেখানে উদ্ভব হয় প্রস্রবণ। প্রধান চারটি দিকের জল ভালো ও শুভকারক হয়। অন্যসব দিকের জল অপকারী ও অশুভকারক।

অসংসক্ত শিলায় ভূজল ঃ

অধ্যায়ের পরবর্তী শ্লোকগুলিতে ভূজলের অনুসন্ধান সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হয়েছে। এযুগে ভূজলের অনুসন্ধান প্রধানত শিলার স্থূল গঠন (mesostructure), শিলালক্ষণ, ভূপৃষ্ঠের নিচু জায়গায় ও কাছাকাছি নদীখাতে বছরের বিভিন্নসময় জলতলের (water level-এর) অবস্থান ইত্যাদি থেকে নির্ণয় করা হয়ে থাকে। বরাহমিহিরের যুগে প্রথম দুটি, গঠন ও শিলালক্ষণ সম্বন্ধে মানুষের তেমন কোনো ধারনা ছিল না। তবে তৃতীয়টি সম্বন্ধে তারা যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিল। কিন্তু পাশাপাশি আর একটি বিজ্ঞান, বা প্রযুক্তিবিদ্যা বিশেষ উন্নত হয়েছিল—জমি আর তার নিচে ভূজলের সঙ্গে বিশেষ বিশেষ গাছ, ঘাস ও লতা আর পোকার সম্পর্ক। কয়েকটা উদাহরণ পরীক্ষা করে দেখা যাক।

শ্লোক 6 ও 7 এ বলা হয়েছে শুকনো (arid) জায়গায় সুপুষ্ট বেতসগাছ (বেতগাছ) নির্দেশ করে গাছের গোড়া থেকে $1\frac{1}{2}$ পুরুষ (9 ফুট) নিচে 3 হাত (4´6´´) পশ্চিমে জলের অস্তিত্ব। বলতে গেলে গ্রন্থে এটিই প্রথম ভূজলের নির্দেশক-সূত্র। তারপর আছে তা সঠিকভাবে প্রমাণ করার পদ্ধতি বা confirmatory test। বলা হচ্ছে, জায়গাটা খুঁড়লে $2\frac{1}{2}$ হাত (3´9´´) নিচে পাওয়া যাবে সাদা মণ্ডুক (চিহ্নমপি চার্দ্ধপুরুষে মণ্ডুকাঃ পাণোতুরোথ মৃৎপিতা ইত্যাদি)। তার নিচে হলদে কাদা, তার নিচে কঠিন শিলা। হলদে কাদা মৃৎপরিলেখ-এ (soil profile-এ) Zone of enrichment। জায়গাটা পুরোপুরি আর্দ্র (কলকাতা হাওড়ার মতো নয়), বরং কিছুটা শুকনো (দুর্গাপুর, আসানসোলের মতো)।

মণ্ডুক কথাটার অর্থ ব্যাঙ, এবং শ্লোকে এই কথাটার অস্তিত্ব আপাতদৃষ্টিতে তার তাৎপর্যকে হাল্কা করে দেয়। শুধু মণ্ডুক নয়, দর্দুর গোধিকা মীন ইত্যাদি কথা ব্যবহৃত হয়েছে পরবর্তী অনেক শ্লোকে মৃৎপরিলেখের বৈশিষ্ট্য বোঝাতে গিয়ে। সংস্কৃতভাষার শব্দের উৎপত্তির (ব্যুৎপত্তির) ধাঁচ মনে রাখলে এগুলি

যে ব্যাঙ, গিরগিটি বা মাছ নয়, বিভিন্ন আকার ও আকৃতির পিণ্ড, ভূবিদের ভাষায় concretion, তা বোঝা যাবে।*

শ্লোক 8-এ বলা হয়েছে শুষ্ক জমিতে জামগাছ নির্দেশ করে 3 হাত উত্তরে 2 পুরুষ নিচে জলের অস্তিত্ব। এখানে মাটির গন্ধ লোহার মতো। একপুরুষ নিচে সাদাটে কাদা ও একটি ব্যাঙ। অবশ্য যদি (9, 10) জামগাছের পুবে কাছাকাছি উইঢিবি থাকে তবে গাছের তিনহাত দক্ষিণে দুই পুরুষ নিচে প্রচুর জল পাওয়া যাবে। আধপুরুষ গর্ত খুঁড়লে এখানে প্রথমে পাওয়া যাবে মাছের রঙের (বোধহয় অভ্রাল, micaceous), তারপর ঘুঘুর রঙের (ঘুঁটের ছাই-এর মতো) সবশেষে নীলরঙের কাদা। মৃৎপরিলেখ-এর বর্ণনা বেশ কিছুটা বাস্তবানুগ। শুকনো জায়গা বলতে মরুভূমি নয়—এমন জায়গা যেখানে গাছপালা আছে, কিন্তু শীত ও গ্রীষ্ম চরম। এমন জায়গায় পাঁক জমতে পারে গাছপালা পচে। এই পাঁকের গন্ধটা গন্ধকের গন্ধের কাছাকাছি। এই গন্ধকের গন্ধ মাক্ষিক (pyrite) এর অস্তিত্বের জন্য। আর প্রাচীনকাল থেকেই মাক্ষিকের সঙ্গে লোহাকে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত অনুমান করা হতো। সুতরাং লোহার মতো গন্ধ অর্থ জমিটা পাঁকালো। এ-যুগের বর্ণনায় humus bearing। তেমনি অভ্রাল জমি নির্দেশ করে হঠাৎ বাধা পেয়ে নদীর পললের অবক্ষেপণ যার ফলে বালুর সঙ্গে অভ্রও থিতিয়ে পড়ে।

এ পর্যন্ত বোঝা যায়, কিন্তু অসুবিধা হয় নীল রঙের কাদার ব্যাখ্যা দিতে গেলে। এটা স্থানবিশেষের বৈশিষ্ট্য হতে পারে।

জামগাছ দিয়ে শুরু করে পরপর এসেছে অর্জুন, নির্গুণ্ডি, বদরি (কুলগাছ), পলাশ, বেল, উদুম্বর (যজ্ঞডুমুর), কাকোদুম্বর, কম্পিল্লিক, শোণক, সপ্তপর্ণী (ছাতিম), মধুক (মহুয়া), কদম্ব, তাল ইত্যাদি যে গাছগুলির বর্ণনা, তার মধ্যে পরিচিত গাছগুলিকে এ-যুগের ভারতবর্ষের বৃক্ষবৈচিত্র্যের সঙ্গে মেলাতে বসলে দেখছি আসমুদ্র-হিমাচল প্রায় সব জায়গার গাছ আছে এ-তালিকায়। আর তার সঙ্গে আছে সেসব জায়গার মৃৎপরিলেখ। এ বিদ্যার যে নিয়মিত অনুশীলন হতো তার প্রমাণ এই তালিকা।

শুধু গাছের বর্ণনা ছাড়া আছে গাছ আর উইঢিবির সংস্থানের combina-

---

* সংস্কৃত অভিধানে (Monier Williams) দেখছি মণ্ডুক শব্দের একটা প্রতিশব্দ সংগ্রাহ, যার অর্থ তলোয়ারের মুষ্টি (handle)। বস্তুত এই অর্থ আমাদের অনুমানের সমর্থক।

tion। যেমন 70—71 শ্লোকে বলা হয়েছে: স্বর্ণ গাছের উত্তরে যদি উইঢিবি থাকে তবে তা দক্ষিণপ্রবাহী ক্ষারজলের ধারা নির্দেশক। উইঢিবির দু'হাত দক্ষিণে আর 15 পুরুষ (90 ফুট) নিচে জলের নির্দেশক। এখানে পিণ্ডক (concretion) অনেক বড়, অনেকটা বেজির মতো।···ক্ষারম্ পয়োত্র নকুল-ধম্মনিভে তাম্রসন্নিভশ্চাসমা রক্তা চ ভবতি বসুধা···। ভেঙ্কটেশ্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রসাদ[53] এর অনুবাদ করেছেন; ···flowing brackish water two *hastas* to the south at a depth of 15 *purushas*. The signs are a mongoose at a depth of half a *purusha*, copper coloured rock followed by a red soil।* জানিনা এরকম আক্ষরিক অনুবাদ (literal translation) তিনি কেন করলেন। কারণ নকুল শব্দের যেমন একটা অর্থ বেজি, তেমনি অন্য অর্থ কুলহীন, শিব ও চতুর্থ পাণ্ডব। শিব যে স্বয়ম্ভূ সে হিসাবে শিবলিঙ্গের কথা আলোচনা করেছি পূর্ববর্তী অধ্যায়ে। Concretionও সেই অর্থে শিব (লাতিনে *concrescere* অর্থে grow)।

উইঢিবি ছাড়াও গভীর জলপীঠের নির্দেশক গাছের কথা আছে। যেমন 72-73 শ্লোকে বলা হয়েছে বদরি ও রোহিতগাছ যদি থাকে তবে তার 3 হাত পশ্চিমে 16 পুরুষ নীচে স্বাদু জল পাওয়া যাবে। এই জলবাহী শিরা প্রথমে দক্ষিণবাহী, তারপর উত্তরবাহী। এখানে $2\frac{1}{2}$ হাত নিচে পাওয়া যাবে একটি বৃশ্চিক। বৃশ্চিক যে বিছে সে তো সবাই জানি! কিন্তু এছাড়াও এর সংস্কৃত অর্থ ওষধিবিশেষ, একবিশেষ ধরনের ওষধি, নালিকা (tubular body)। ভূতলে প্রবাহের দিক নির্দেশ করছে ঔদক অবক্রম (hydraulic gradient) কোনদিকে।

আরো বেশি গভীর জলপীঠের নির্দেশ আছে পরবর্তী শ্লোকগুলোয়। যেমন 82 শ্লোকে 55 পুরুষ, 83 তে 60 পুরুষ, 84-তে 70 পুরুষ। 85-তে 75 পুরুষ (=480 ft)। শ্লোকগুলি পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে জলপীঠের গভীরতা যতই বাড়ছে ততই ভূপৃষ্ঠে গাছপালা বদলে যাচ্ছে। আর্দ্র জলবায়ুর আম, জাম, বেল, কদম্ব ইত্যাদি গাছের বদলে আসছে কাঁটাওয়ালা গাছপালা—শমী, পলাশ, বাবলা, শিরীষ, কুল ইত্যাদি। তার সঙ্গে আরো সূক্ষ্ম নির্দেশের জন্য উইঢিবির combination তো আছেই।

---

* Italics অধ্যাপক প্রসাদের।

অগভীর জলপীঠের নির্দেশক মৃৎপরিলেখ না হয় কুয়ো থেকে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু 300-400 ফিট গভীর কুয়ো তো আর হয় না যে এতদূর পর্যন্ত মৃৎপরিলেখ পাওয়া যাবে! একধরনের সন্ধানীকূপ (exploratory borehole) করার পদ্ধতি নিশ্চয়ই ছিল। গতশতকে ভ্যালেন্টাইন বল মধ্যপ্রদেশের পান্না অঞ্চলে কূপের আকারে গভীরে গর্ত খুঁড়ে হীরা তোলা দেখে যে অবাক হয়েছিলেন, তার প্রক্রিয়া ভারতের নিজস্ব। পরবর্তীকালে অসুরবিবর নামে ভূগর্ভস্থ যেসব সুড়ঙ্গ ইত্যাদির বিবরণ আছে কাব্যে আর নাটকে, তার সবই এধরনের গভীর কূপ ও পরিত্যক্ত ভূগর্ভস্থ খনি।

সংসক্ত শিলায় ভূজল :

শুধু আল্গা মাটিই নয়, সংসক্ত শিলা (coherent rock)-এর মধ্যেও ভূজলের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আলোচনা আছে এই দকার্গলাধ্যায়ে। যেমন শ্লোক 107-এ আছে যে শিলার রঙ বৈদূর্যমণির মতো, কাঁচা ছোলার মতো, কিংবা মেঘ, মৌমাছি, বা (শ্লোক 108-এ) পায়রা, মধু, ঘি, রেশম ইত্যাদির মতো, তাতে অপর্যাপ্ত জল পাওয়া যাবে।

শিলার রঙ বলতে এখানে ঠিক কি বোঝানো হয়েছে তা অবশ্য ভেবে দেখার আছে। কারণ 109 শ্লোকে বলা হয়েছে যে শিলা গোলদাগওয়ালা নানাবর্ণের, সে শিলায় জল পাওয়া যাবে না। বর্ণনা থেকে রূপান্তরিত শিলার পরফিরোব্লাস্ট বিশেষ করে গারনেট পরফিরোব্লাস্টের কথা মনে হয়। আর তা মেনে নিলে শিলাটি হয়ে দাঁড়ায় মোটামুটি উচুঁ মানের রূপান্তরিত শিলা। বলা বাহুল্য, এরকম শিলায় ভূজল পাবার সম্ভাবনা খুবই কম।

এই শ্লোকেই আছে—বানরের মতো (শ্লেট ?), সূর্যের মতো (চুনাপাথর ?), আগুনের মতো (red shale ?) অথবা অঙ্গুষ্টিক লতার মতো রঙের (শ্যাওলা-সবুজ, chlorite phyllite) পাথরে জল থাকেনা। এধরনের শ্লেট বা চুনাপাথর ভারতের সর্বত্র পাওয়া যায় না, কয়েকটি অঞ্চলে মাত্র সীমিত তাদের উদ্ভেদ। হতে পারে শুধু রঙ দেখে শিলা চিনতে গিয়ে এভাবে একই শিলা বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়েছিল। বৈদূর্যমণি (chrysoberyl) ও কাঁচাছোলার মতো সবুজ পাথর গণ্ডোয়ানা মহাসঙ্ঘের সর্বনিম্ন সবজে কাদাপাথর হতে পারে, কিংবা বেলে পাথরও হতে পারে। দ্বিতীয়টিতে জল থাকা সম্ভব হলেও প্রথমটিতে কোনো সম্ভাবনা নেই। অর্থাৎ সংহিতাকারের প্রথম শিলাটির কথা জানা নেই।

অথচ উড়িষ্যার তালচের-এ, আর রাজগীর থেকে পরেশনাথের মাঝামাঝি এই সব্‌জে কাদাপাথরের উদ্ভেদ আছে। রাজগীর আর পরেশনাথ দুইই অতি-প্রাচীন স্থান। অথচ বেশ ক-শতক পরের বৃহৎসংহিতায় এই শিলাটির উল্লেখ না-থাকার অর্থ পরেশনাথ থেকে রাজগীর যাবার সোজা কোনো পথ ছিলনা, এবং তালচের-এ কোনো সমৃদ্ধ জনপদ ছিলনা। ভারতের ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র নিয়ে এ-ভাবে মেলাতে বসলে শুধু যে প্রাচীন ভারতীয় ভূবিদ্যা সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যাবে তাই নয়, প্রাচীনযুগের ইতিহাস, বিশেষ করে বাণিজ্যপথ সম্বন্ধেও অনেক নতুন তথ্য উদ্ঘাটিত হবে।

দকার্গলাধ্যায়ে শিলা বিস্ফারণ পদ্ধতি :

পাথর ফাটাবার নানান পদ্ধতিরও বর্ণনা আছে এই অধ্যায়ে। যেমন, 112 শ্লোকে বলা হয়েছে : কোনো শিলা হাতুড়ির আঘাতে ভাঙ্গা না গেলে, পলাশ আর টিণ্ডুকগাছের আগুন জ্বেলে সেই শিলা উত্তপ্ত করে তার উপর ছিটিয়ে দিতে হবে চুণগোলা জল। চুনগোলা জলের হয়তো পাথর ফাটাবার মতো আলাদা কোনো গুণ থাকতে পারে। কিন্তু পলাশগাছের সেরকম কোনো গুণের কথা জানা নেই। টিণ্ডুক গাছ অবশ্য চিনতে পারিনি। তবে পলাশ প্রসঙ্গে মনে হয় যেখানে এভাবে শিলা ফাটানো হতো সেখানে বোধহয় পলাশগাছের প্রাচুর্য। তুলাচাষের উপযোগী কালো মাটিতে পলাশ ভালো জন্মায়।[54] এরকম কালোমাটির অঞ্চলে সংসক্ত শিলা বলতে বেসল্ট। তাই অনুমান করা যেতে পারে বেসল্ট ফাটাবার জন্য পলাশকাঠের ব্যবহার হতো। টিণ্ডুক গাছটা জানা থাকলে শ্লোকের অর্থ আরো স্পষ্ট হতো।

113-117 শ্লোকে আরো নানাধরনের দ্রবণ ও গাছের কাঠ, বাকল, পাতা ইত্যাদি জ্বেলে আগুন করার কথা বলা হয়েছে। দ্রবণ ছাড়াও বলা আছে নানা-রকম আরক ও লৌহের ব্যবহার। যেমন 117 শ্লোকে বলা হয়েছে লোহার যন্ত্র কলাগাছের ছাই আর ঘোল মিশিয়ে তা দিয়ে ধার করে নিলে আর সে যন্ত্র পাথর কাটতে গিয়ে ভোঁতা হবেনা।

এ শ্লোকগুলি সম্ভবত পরবর্তী আলকেমির যুগের প্রক্ষিপ্ত শ্লোক।

জলাধারে জল রক্ষা পদ্ধতি :

জলাধার বানালেই যে জল থাকবে এমন কথা নেই। অনাদ্র´ অঞ্চলে,

যেখানেজল পীঠ ভূপৃষ্ঠ থেকে অনেক নিচে, সেখানে জলাধার থেকে চুঁইয়ে জল বেড়িয়ে যায়। দুভাবে এ জল-চোঁয়ানো বন্ধ করতে বলা হয়েছে। 118 শ্লোকে বলা হয়েছে জলাশয়ের বিস্তার হতে হবে পূর্ব-পশ্চিম বরাবর। তা না হলে বিশেষ করে উত্তর-দক্ষিণ হলে বায়ু তাড়িত হয়ে ঢেউ উঠে জলাধার নষ্ট হয়ে যাবে। আর তাছাড়া, তার চারপাশের দেওয়ালে কাঠ, শিলা ইত্যাদি পুঁতে হাতী ও ঘোড়ার পদাঘাতে জলাধারের lining কে সুদৃঢ় করতে হবে।

119 শ্লোকে বলা হয়েছে জলাধারের তীরে বট, কদম, জাম, অশোক, মহুয়া, কুরুবক, বকুল ইত্যাদি গাছ লাগাতে। গাঁয়ের বড় বড় পুকুরের ধারে এসব গাছই আমরা দেখে আসছি। হয়তো এই গাছ লাগাবার নির্দেশ সেই বরাহ-মিহিরের যুগের, বংশপরম্পরায় সমানে অনুসৃত হয়ে আসছে।

120 শ্লোকে বলা হয়েছে পুকুরে জল ঢোকার পথটা পাথর গেঁথে সুদৃঢ় করতে হবে।

কূপের জল পরিস্রবণ পদ্ধতি :

121 ও 122 শ্লোকে বলা হয়েছে যে-কূপের জল কাদাময়, তেতো কিংবা লোনা, বিস্বাদ ও দুর্গন্ধযুক্ত, তা পরিষ্কার ও সুগন্ধী করা যাবে অঞ্জন, আমলকী, রাজকোসাতক (বাঙলা—ঘোষালথ, হিন্দি-তোরাই) ইত্যাদি কূপের মধ্যে ফেলে।

সাত ঃ ভৌগোলিক বিবরণ

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে বারবার অবধারিতভাবে এসে পড়েছে এক হারিয়ে যাওয়া ভৌগোলিক বিবরণ, অনেকটা গ্রীক দার্শনিক প্লেটো বর্ণিত আটলান্টিসের ঢঙ-এর, অন্যদিকে রয়েছে খ্রীস্টপূর্ব বেশ ক-শতাব্দীর পুরানো খনির, বিশেষ করে ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গের ধ্বংসাবশেষ, যা জরিপের কাজে উৎকর্ষের এক বিশ্বাসযোগ্য নিদর্শন। ভূবিদ্যার ক্রমবিকাশ আলোচনা করতে গিয়ে সে যুগের মানুষের ভৌগোলিক জ্ঞান, জরিপ পদ্ধতি ইত্যাদি সম্বন্ধে একেবারে কিছু না বললে এ আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভারতীয় উপমহাদেশের পুরাভৌগোলিক পটভূমি আলোচিত হয়েছে। সেই ভৌগোলিক প্রেক্ষাপটে রামায়ণের তিনটি ঘটনাকে অভিযান বলে মনে হয়, তিনটিরই উদ্দেশ্য উপনিবেশের প্রসারণ, নতুন নতুন সম্পদ অন্বেষণ, কারণ পুরানো বসতিগুলি জনসংখ্যা বাড়ায় নানারকম সমস্যার সম্মুখীন। বলা হয়েছে রাম এসব শুনেছেন ঋষিদের কাছে। ইক্ষাকু বংশের বংশপঞ্জি ধরে রামের বয়স পাওয়া যায় 2124 B.C., অর্থাৎ এখন থেকে প্রায় 4000 বছর আগে। অভিযানগুলির প্রাচীনত্ব সহজেই অনুমান করা যায়।

সমুদ্রমন্থন ঃ

সমুদ্রমন্থনের বর্ণনা আছে রামায়ণের বালকাণ্ডে 45 সর্গে।[55] বর্ণনাটি এরকম : পূর্বে সত্যযুগে ধর্মপরায়ণ সুরগণ এবং মহাবলপরাক্রান্ত অসুরগণের মনে উদয় হইল যে আমরা ক্ষীরসমুদ্র মন্থন করিলে অমৃতরস প্রাপ্ত হইব। দেবাসুরগণ এইরূপ অবধারণ করিয়া সমুদ্রমন্থনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা মন্দারগিরিকে মন্থনদণ্ড এবং নাগরাজ বাসুকিকে রজ্জু করিয়া ক্ষীরসমুদ্র মন্থন করিতে লাগিলেন। সহস্র বৎসর অতীত হইল ···।

এই মন্দার কালিদাসের মন্দার পাহাড় ধরলে দাঁড়ায় ভাগলপুর জেলায় হিমালয়ের পাদদেশে বঙ্কা মহকুমার অন্তর্গত[12]। আগেই বলেছি সে জায়গাটা

সেযুগে ছিল নরওয়ে-স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার মতো। কোন দীর্ঘ নদীপথকে যদি মন্থন-রজ্জু বলে ধরি, তবে তার মধ্যে একটা উঁচু পাহাড়, যা দিক ঠিক করতে সাহায্য করতে পারে (অর্থাৎ ভূবিদ এবং অভিযানকারীদের ভাষায় bearing-এর কাজ করতে পারে), তাহলে সেই পাহাড়টি কাব্যে মন্থনদণ্ড বলে বর্ণিত হতে পারে। তেমনি কোন বড় নদীপথে ধস নেমে তৈরি হতে পারে খুব বড় হ্রদ, যা কাব্যের বর্ণনায় হবে সাগর। আজও ভারতের নানা জায়গায় বড় বড় হ্রদগুলো (যেমন উদয়পুরের উদয়সাগর, ফতেসাগর ইত্যাদি) সাগর নাম বহন করে। পরবর্তী বুদ্ধ-মেগাস্থিনিসের যুগে এই ভৌগোলিক সংস্থানের কিছুমাত্র অবশিষ্ট না থাকারই কথা। কারণ তার অনেক আগেই আবহাওয়া সাম্যাবস্থায় এসে গেছে।

এ ভাবে চিন্তা করলে সমুদ্রমন্থন এমনি একটি সাগর, অর্থাৎ হ্রদ পেরিয়ে উল্টোদিকে কি আছে তা অনুসন্ধানের জন্য অভিযান।

সমুদ্রমন্থনের রঙ্গমঞ্চ যে হিমালয়ের পাদদেশের কোন হ্রদ তার আর একটি ইঙ্গিত আছে ক্ষীরসমুদ্র কথাটিতে। গ্রানাইট চূর্ণ ভর্তি সাদা বা ঘোলাটে জল (গঙ্গাজলের মতো) হিমালয়ের ধারে কাছেই হওয়া সম্ভব, দাক্ষিণাত্যে নয়। দাক্ষিণাত্যের নদীর জল হয় পরিষ্কার (শোণ, চম্বল), অথবা ঈষৎ নীলচে মাইকাসিস্ট বিচূর্ণিত হয়ে বায়োটাইট থাকায় (গোদাবরী, মহানদী, কৃষ্ণা, কাবেরী, তাপ্তি, পেনার, তুঙ্গভদ্রা)। গঙ্গোত্রীর পথে জঙ্গলা চটির কাছে জাহ্নবী নদীর নীল জল ঠিক এভাবেই তৈরি হয়ে এপথের পর্যটকদের বিস্ময়ের বস্তু। তবে নর্মদার জল কোথাও কোথাও বক্সাইট বা কেওলিন থাকায় সাদা। কিন্তু কোন বিবরণে দাক্ষিণাত্যে মন্দার পর্বতের অবস্থানের কথা পাইনি। তাই নর্মদাকে মন্থন রজ্জু ধরার কোন যুক্তি নেই।

সমুদ্র মন্থন করে অনেক কিছুর সঙ্গে উঠল ষাট কোটি অপ্সরা। ষাট কোটির অত্যুক্তি অবশ্যই বেশি সংখ্যা বোঝাতে। এটা কি ইউলিসিসের সেই আমাজনদের দেশের মতো এমন কোনো দেশ হতে পারে না, যেখানে পুরুষের চেয়ে নারীর অনুপাত অনেক বেশি ?

সুর ও অসুর পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী। রামায়ণ সুরদের রচনা, সুতরাং তারা ধর্মপরায়ণ তো বটেই। অসুরগণ Sons of the soil, কিন্তু আবহাওয়ার পরিবর্তনে তারা উদ্বাস্তু। তবে ফেলে-আসা বাসস্থানের পাশাপাশি অঞ্চলগুলির অন্ধিসন্ধি তাদের সুরদের চেয়ে অনেক ভালো জানা। তাই পথ-দেখানোর কাজে তাদের সাহায্য দরকার হয়েছিল।

এভাবে খুঁজলে ঐরাবত, কৌস্তভমণি, হয়তো অমৃতেরও তাৎপর্যের আভাস মিলবে, তবে বর্তমান আলোচনায় তা অপ্রাসঙ্গিক।

ভগীরথের গঙ্গানয়ন ঃ

সগরসন্তান ও ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের বিবরণে পড়লে মনে হয় সগর খাল কেটে গঙ্গার গতিপথের কিছুটা পরিবর্তন সাধনের পরিকল্পনা করেছিলেন। কাহিনীর পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই, কপিল কথাটার অর্থে আসছি। এর একটি অর্থ পিঙ্গলবর্ণ, যা বাঁকুড়া পুরুলিয়ার মতো ল্যাটেরাইট মাটির কথা মনে পড়িয়ে দেয়। তাহলে কপিলমুনির আশ্রম এমন, অর্থাৎ প্রায়-শুকনো (semi-arid) জায়গা হতে পারে।

এবার জহ্নুমুনির কর্ণের কথায় আসি। কর্ণের আর-এক অর্থ অঙ্গরাজ, পঞ্চপাণ্ডবের অগ্রজ। রাজাকে রাজ্যের প্রতীক ধরলে কর্ণ হলো অঙ্গরাজ্য। বৌদ্ধপুরাণ দীঘনিকায় অনুযায়ী অঙ্গ প্রাচীনভারতের ষোলটি মহাজনপদের একটি।[56] এই বিস্তীর্ণ জনবহুল অঞ্চল কয়েক শতাব্দীর খরায় ধীরে ধীরে মৃতের জায়গা হয়ে উঠেছিল, অর্থাৎ জায়গাটাই মরে যেতে বসেছিল। জহ্নুর আশ্রমকে চিহ্নিত করা গেছে প্রাচীন মোদাগিরি বা বর্তমান মুঙ্গেরের সঙ্গে।[21]।

এরকম একটা জায়গার পুনরুজ্জীবন (reclamation)-এর জন্যই বোধহয় সগরের গঙ্গা থেকে খাল কেটে আনার পরিকল্পনা। কিন্তু তাতে প্রথমেই ঘটল দুর্ঘটনাটা। সগরের ষাট হাজার সন্তান কপিলের শাপে মারা পড়ল। ষাট হাজার (বহুসংখ্যক) সন্তান যে ঔরসজাত সন্তান হতে হবে তা ধরে নেওয়ার চেয়ে বোধহয় রাজা অন্নদাতা বলে পিতা, সেটা ভাবা বেশি যুক্তিযুক্ত। তাহলে ষাট হাজার শ্রমিক যারা সগরকর্তৃক নিযুক্ত হয়েছিল তারা খরার কবলে পড়ে প্রাণ হারাল। এই পরিকল্পনাটা দীর্ঘমেয়াদী। শুরু করেছিলেন সগর, তার পর অসমঞ্জস, অংশুমান, দিলীপ ও শেষে ভগীরথের সময় এসে শেষ হলো। পানামা খাল কাটতে এযুগে কতদিন লেগেছে সেটা মনে করলে আর পাঁচ পুরুষ ধরে খাল কাটা অবিশ্বাস্য মনে হয়না।

রামের অহল্যা উদ্ধার (বালকাণ্ড, 49 সর্গ)[55] অনেকে অনুর্বর ভূমিকে শস্যশ্যামল করে তোলার সার্থক প্রচেষ্টা মনে করেন। অর্থাৎ উত্তর গাঙ্গেয়-সমভূমিতে যে একটা খরার যুগ এসেছিল, বিবরণগুলো থেকে তাই মনে হয়।
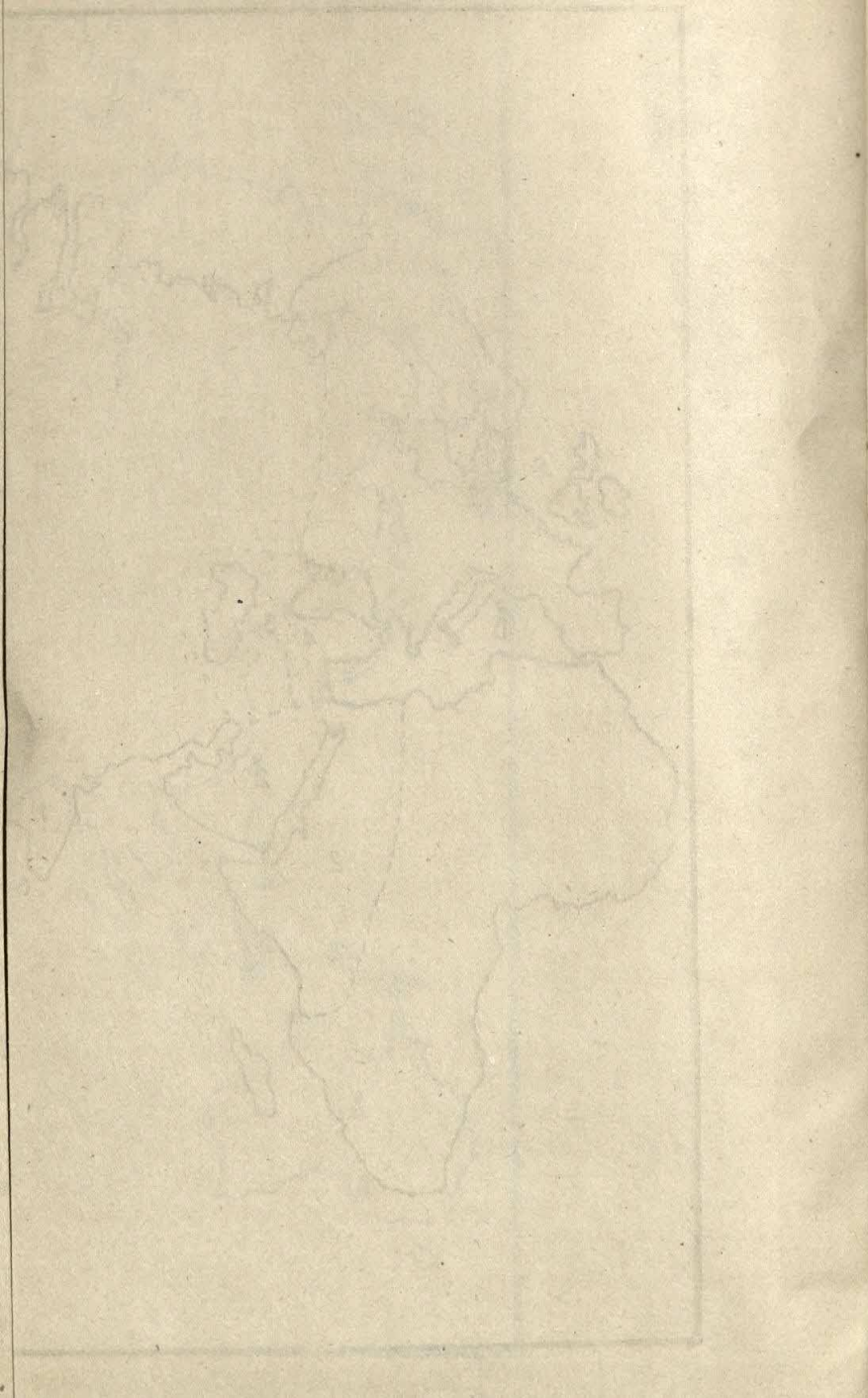
নিম্নহিমালয়ের সব হিমবাহ বেশ কিছুদিন (দশকের হিসাবে) গলে গেছে, অথচ সহ্যাদ্রি, বিন্ধ্য, কিরথর ইত্যাদি অঞ্চলে মেঘ ঘনীভূত করে বৃষ্টি নামাবার মতো যথেষ্ট শীতলতা আছে, আবহাওয়ার সাম্য ও অসাম্য অবস্থার অন্তর্বর্তী কিছুটা সময় (দুচার প্রজন্মের মতো) উত্তর গাঙ্গেয়-সমভূমিতে সেই খরার যুগ। প্রজন্মের হিসাবে (পরিশিষ্ট-ক) সগরের কাল 2958 খ্রীস্টপূর্ব অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় পাঁচহাজার বছর আগে। উত্তরগাঙ্গেয়-সমভূমির ডাঙা, অর্থাৎ উঁচু-অঞ্চলে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট (ঘুটিঙ) মিশ্রিত অর্ধসংসক্ত পললে পোড়ামাটির জিনিষ-পত্রের টুকরো অনেক জায়গায় পাওয়া গেছে। C^{14} পদ্ধতিতে তার বয়স বেড়িয়েছে আজ থেকে প্রায় পাঁচ ছ হাজার বছর। অর্থাৎ এই সময়ে উত্তর-ভারতে প্রবল খরা দেখা দিয়েছিল মনে করা যেতে পারে।

অগস্ত্যযাত্রা ঃ

রামায়ণের আর একটি অভিযান অগস্ত্যের দক্ষিণাপথ যাত্রা। বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণঢাল বরাবর খাড়া চড়াই (escarpment), নামা-ওঠা দুষ্কর। কিন্তু উত্তরে আর্যাবর্তের দিকটা দুর্গম নয়। যদিও এই চড়াই উত্তরদিক থেকে এসে দক্ষিণা-পথে নামার প্রধান বাধা, তবু মনে হয় অগস্ত্য এই বাধা অপসারণের হোতা নন। পুরাভৌগোলিক সংস্থানের আলোচনা (প্রথম অধ্যায়) থেকে মনে হয় অগস্ত্যের ঠিক আগের যুগে বিন্ধ্যর ঠিক দক্ষিণে একটা গহন অরণ্যের বলয় ছিল এযুগের তরাই-এর মতো, শ্বাপদ ও বিষাক্ত কীটপতঙ্গে ভরা। উত্তরাপথের লোক এই দুর্ভেদ্য জঙ্গল ও দুর্লঙ্ঘ্য পাহাড় পেরিয়ে যার নেতৃত্বে দক্ষিণাপথে এল সেই ব্যক্তিই অগস্ত্য। র‍্যাপসনের মতে [17] অগস্ত্যযাত্রা উত্তরাপথে লোহার ব্যবহারের শুরু সূচিত করে, এবং ঘটনাটি নাকি খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রকের শেষার্ধের। প্রসঙ্গটা এখানে অবান্তর বলে এবিষয়ে কোনো বিতর্কে আনছিনা।

রামায়ণের এই তিনটি অভিযান বর্ণনার পর সুর আর অসুরের প্রশ্নটা আবার মনে পড়ে। সুর কারা? যারা সংস্কৃত ভাষায় কথা বলত। তাহলে যারা অসুর তারা নিশ্চয়ই সেই একই ভাষার অসংস্কৃত রূপ ব্যবহার করে চলেছিল। যদি সুররা আর্য ঔপনিবেশিক হয় তবে তাদের পিতৃভূমিতে যারা থেকে গিয়েছিল তারা অসুর। মধ্যপ্রাচ্যের আসিরিয়ার লোক অসুর হতে পারে। রাক্ষসদের কিন্তু সুরদের সম্বন্ধে ধারনাই নেই কোনো। রামায়ণের বর্ণনায় রাবণের লঙ্কা একটি স্বয়ম্ভর রাজ্য। রাম লক্ষ্মণ সীতার সম্বন্ধে কোনো খবরই সেরাজ্যের

কেউ রাখেনা, যদিও উত্তরভারতে রামলক্ষ্মণের বীরত্বের খ্যাতি যথেষ্ট। স্বর্ণলঙ্কা কথাটা রূপক ধরলেও সমৃদ্ধির প্রতীক। এ-সমৃদ্ধি কৃষিজ হতে পারে, আবার খনিজও হতে পারে। সেক্ষেত্রে রাবণের রাজ্য আর রামরাজ্যে প্রভেদটা দাঁড়ায় এ-যুগের উন্নয়নশীল আর উন্নত দেশের মতো।

রামায়ণের ভৌগলিক বিবরণ :

এই ব্যাখ্যা স্বীকার করে নিলে লঙ্কাজয় একটা উন্নত দেশে অভিযানের সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়। এই সমৃদ্ধদেশ কোথায় সে সম্বন্ধে রামায়ণের ইঙ্গিত যে দেশটা ভারতবর্ষের দক্ষিণে। সিংহল ও স্বর্ণলঙ্কা যে এক নয় সে সম্বন্ধে মহাভারতের বনপর্বে শ্রীকৃষ্ণের একটা কথা থেকে বোঝা যায়। রাজসূয় যজ্ঞে যেসব রাজারা পাণ্ডবদের সাহায্যের জন্য এসেছিলেন তাঁদের কথা বলতে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ সিংহল ও লঙ্কার রাজাদের কথা আলাদাভাবে উল্লেখ করেছিলেন। আর্যভট্টের রচনায় নক্ষত্রের আপাতগতির আলোচনা থেকে অনেকে মনে করেন যে লঙ্কা নিরক্ষরেখার উপরে অবস্থিত ছিল। এযুগের সিংহল কিন্তু নিরক্ষরেখার অনেকটাই উত্তরে। সূর্যসিদ্ধান্তের (সম্ভবত খ্রীস্টীয় একাদশ শতাব্দী) একটি সূত্রে বলা হয়েছে যে লঙ্কা ও সুমেরুপর্বত যে মধ্যরেখা (দ্রাঘিমা)র উপর অবস্থিত সেই রেখার উপর অন্য দুটি জায়গা রোহিতকনগর (রোটাক, হরিয়ানা), কুরুক্ষেত্র ও উজ্জয়িনী অবস্থিত। কুরুক্ষেত্র বলতে পাঞ্জাবে আম্বালা ও কর্ণল জেলার থানেশ্বর ও তার সন্নিহিত অঞ্চল। এই জায়গাগুলির উপর দিয়ে দ্রাঘিমারেখা টানলে তা যায় প্রায় মালদ্বীপের কাছাকাছি কোনো জায়গা দিয়ে। এই তথ্য থেকে অনেকে অনুমান করেছেন যে স্বর্ণলঙ্কা মালদ্বীপের কাছাকাছি কোনো অঞ্চল, এবং প্রত্নইতিহাসের কল্পিত লেমুরিয়া মহাদেশের অংশ। এ ব্যাপারে প্রমাণের অভাবে বিস্তারিত আলোচনা নিষ্ফল, তবে একটা তথ্য বোধহয় উল্লেখ করা যেতে পারে। নরওয়েজীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ থর হেয়ারডাহ্‌ল্ ভারতমহাসাগরের মালদ্বীপে প্রায় 4000 বছরের প্রাচীন এক ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পেয়েছেন যার সঙ্গে সুমের ও সিন্ধুসভ্যতার অনেক সাদৃশ্য আছে।

তুষারযুগের তুঙ্গে যখন গাঙ্গেয় সমভূমিতে নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া, লঙ্কায় তখন চিরবসন্ত : এ থেকে একটা কথা অন্তত বোঝা যায়—সাগরবেষ্টিত এই অঞ্চলে বহুকাল মানুষকে কোনো আবহাওয়া পরিবর্তনের মুখোমুখি হতে হয়নি। মোহেঞ্জোদারো, হরপ্পা, লোথাল ইত্যাদি অঞ্চলে যে সভ্যতার উৎকর্ষতা আমাদের

হতবাক করে, তারই আরো অনেক বেশি উৎকর্ষতা সম্ভব হয়েছিল এই স্বর্ণলঙ্কায়। রামায়ণে আরো যেসব দেশের বর্ণনা আছে তাও কৌতূহলোদ্দীপক।

যেমন – অনন্তর সুগ্রীব…বিনতাকে আহ্বানপূর্বক কহিলেন…সপ্তরাজ্যে বিভক্ত যবদ্বীপ, স্বর্ণকারবহুল স্বর্ণদ্বীপ ও রৌপ্যদ্বীপে যাও।… পরে মহারৌদ্র ইক্ষুসমুদ্র, তথায় মহাকায় অসুরগণ বহুকাল বুভুক্ষিত আছে। …তোমরা কোনো সুযোগে এই ইক্ষুসমুদ্র পার হইয়া ভীষণ লোহিতসাগরে যাইও। পরে ক্ষীরোদ সমুদ্র, অনন্তর ভীষণ জলোদ সমুদ্র।… উহাতে ঔর্বনামা ব্রহ্মর্ষির ক্রোধানল বিশাল বড়বামুখরূপে পরিণত আছে। ঐ অগ্নি যুগান্তরকালে এই বিচিত্র স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ আহার করিয়া থাকে।[55]

এই বর্ণনার মধ্যে দুটি জায়গা এযুগে পরিচিত—একটি সপ্তরাজ্যে পরিচিত যবদ্বীপ অন্যটি লোহিতসাগর। যবদ্বীপের সপ্তরাজ্যকে সাতটা দ্বীপ মনে করলে ইন্দোনেসিয়ার সঙ্গে মিলানো যায়। এটি পেরিয়ে স্বর্ণদ্বীপ ও রৌপ্যদ্বীপ বলতে স্বভাবতই অস্ট্রেলিয়ার কথা মনে হয়। অস্ট্রেলিয়ায় কুনাল্ডা (kunalda) গুহায় উন্নতমানের মধ্যপ্রস্তরীয়যুগের গুহাচিত্র পাওয়া গেছে, যা মানের দিক দিয়ে স্পেনের আল্‌টামিরার গুহাচিত্রের সঙ্গে তুলনীয়। তাছাড়াও দেশটা নিরক্ষীয় অঞ্চলে, অর্থাৎ তুষারযুগের শীর্ষেও সেখানে নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া। হিমযুগে সাগরপৃষ্ঠে নেমে গেলে এটা এসিয়ার মূলভূখণ্ডের সঙ্গে ইন্দোনেসিয়ার দ্বীপগুলির মধ্য দিয়ে যুক্ত হয়ে যাবার কথা। সুতরাং, নব্যপ্রস্তরীয় যুগে এখানে ঠিক উপদ্বীপ-ভারতের মতোই একটি সভ্যতার বিকাশ ঘটে থাকা অসম্ভব নয় কিছু। অস্ট্রেলিয়া পার হয়ে ইক্ষুসমুদ্র। এটা আধুনিক সারগাসো সি হতে পারে। তারপর লোহিত ক্ষীরোদ ও জলোদসমুদ্র* নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। এই যে পথটা এটা দিয়ে এগোলে প্রশান্ত মহাসাগর পেরিয়ে হাজির হতে হয় দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে। এ সম্বন্ধে সম্প্রতি (The Stateman, 12 July' 85) একটা মন্তব্য রাখতে দেখছি শ্রী বলরাম চক্রবর্তীকে †। তিনি বলছেন প্রাচীনকালে (Pre-Dravidian Period) এইপথে বাণিজ্য হতো, এবং আধুনিক লাতিন

---

* জলোদ যেহেতু মেঘ, সুতরাং জলোদসমুদ্র বলতে প্রশান্ত মহাসাগরের মেঘাবৃত অঞ্চল বোঝায়।

† ইনি Deputy Programmes Adviser, Nationol Service Scheme, Regional Centre.

আমেরিকার দেশগুলি ভদ্রাশ্ববর্ষ, সিদ্ধপুর ও পাতালদেশ নামে পরিচিত হয়েছিল। তাঁর মতে মায়া ও পেরুর সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতার সাদৃশ্য এই যোগসূত্র সপ্রমাণ করে। আর ময়দানব তাঁর মতে মায়ার অধিবাসী।

অন্যদিকে, লোহিতসাগরকে সূত্র ধরলে কিন্তু সপ্তরাজ্যে বিভক্ত যবদ্বীপ আর চেনা যায়না। স্বর্ণকারবহুল স্বর্ণদ্বীপ ও রৌপ্যদ্বীপও খুঁজে পাওয়া যায় না। ইক্ষুসমুদ্র মধ্যে Dead Sea হতে পারে। লোহিত সাগর খুব গরম জায়গা বলে এযুগের লোহিতসাগর হতে পারে। কিন্তু তারপর আবার রামায়ণের ভূগোল হারিয়ে যায়। এ পথটার কথা অবশ্য মনে হয়েছিল ক্যাস্পিয়ান থেকে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত মধ্যপ্রস্তরীয় যুগে মানুষের অভিযোজনের কথা ভেবে।

অন্য আর এক জায়গায় সুগ্রীবের বর্ণনায় আছে—সূর্য সুমেরু পর্বত পর্যন্ত বিচরণ করিয়া অস্ত যান।…এই স্থান অন্ধকারাচ্ছন্ন ও অসীম।…অনন্তর উত্তরসমুদ্র। উহার মধ্যে স্বর্ণময় সোমগিরি আছে। সেই স্থানে সূর্যোদয় না হইলেও সোমগিরি সমস্ত আলোকিত করিতেছে। তদ্দৃষ্টে বোধ হয় যেন ঐ প্রদেশ সূর্যশ্রীশূন্য নয়।...উহার পর অন্ধকারাচ্ছন্ন অসীম স্থান।

ছ' মাস অন্ধকারের জায়গা আর মেরুজ্যোতি বা aurora দেখা না থাকলে শুধু কল্পনায় কি তার সৃষ্টি সম্ভব? বোধহয় দ্বিতীয় সূর্য কল্পনায় সম্ভব, কিন্তু সূর্যছাড়া আলো? তাই অনুমান করা যেতে পারে যে কোন সময়ে প্রত্নমানবের দল মেরুবৃত্ত পেরিয়ে নিশীথ সূর্যের দেশে গিয়েছিল। সম্ভবত দশ-বারো হাজার বছর আগে ব্যুর্ম্ (W II C) তুষারযুগে। ভূবিদদের ধারনা[57] তুষারযুগে মেরু থাকে তুষারহীন আর চারপাশের ভূভাগে পুরু হিমবাহে ঢাকা, আর এখনকার মতো আন্তর্হিমযুগে চারপাশের ভূভাগ তুষারমুক্ত, আর মেরু তুষারাবৃত।* হিমযুগে সাগরপৃষ্ঠ বেশ কিছুটা নেমে গেলে উত্তরমেরুর চারিদিকে মেরুবৃত্তের (60´30´N) উত্তরের দ্বীপগুলি (যেমন নোভায়া জেমলিয়া স্ভেরনায়া জেমলিয়া ইত্যাদি) এসিয়ার মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে জুড়ে যাওয়া স্বাভাবিক। তুষার যুগে এই দ্বীপগুলি তুষারমুক্ত থাকার কথা। অথচ, আরো দক্ষিণে সাইবেরিয়ার সমতল-ভূমি তখন পুরু বরফে ঢাকা। সম্ভবত প্রত্নমানবের কোন গোষ্ঠী এসে হাজির হয়েছিল এরকম কোন দ্বীপে, আর সেখানে কাটিয়ে গেছে বেশ কয়েক প্রজন্ম। তারই স্মৃতি সঞ্চারিত হয়েছে পরবর্তীকালের মানুষে।

---

* অবশ্য এটা উত্তরমেরু সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, দক্ষিণমেরু সম্বন্ধে নয়।

রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণে ভূচিত্র ঃ

এই চারটি গ্রন্থে যে ভৌগোলিক বিবরণ রয়েছে তা সাজাবার চেষ্টা করলে দাঁড়ায় : পৃথিবীর কেন্দ্রে জম্বুদ্বীপ, তারপর কেন্দ্র থেকে পরিধির দিকে যথাক্রমে লবণসাগর, প্লক্ষদ্বীপ, ইক্ষুসাগর, শাল্মলদ্বীপ, সুরাসাগর, কুশদ্বীপ, ঘৃতসাগর, ক্রৌঞ্চদ্বীপ, দধিসাগর, শকদ্বীপ, দুধসাগর, পুষ্করদ্বীপ, মিষ্টসাগর, সুবর্ণদ্বীপ / সুবর্ণদেশ। এই ভূচিত্র নিরক্ষীয় তলের সমকোণে কোন মহাবৃত্তের তলক বরাবর। আধুনিক যুগের এরকম মানচিত্র নিরক্ষীয় তলক (equatorial plane) বরাবর হয় উত্তর গোলার্ধের (যার কেন্দ্রে উত্তরমেরু) অথবা দক্ষিণ গোলার্ধের (যার কেন্দ্রে দক্ষিণ মেরু আর সেই দক্ষিণমেরুর কেন্দ্রবিন্দুকে ঘিরে আন্টার্কটিকা)। তাহলে, রামায়ণের এই ভূচিত্রের একটা পিছনদিক, অর্থাৎ আর-একটা সম্পূরক ভূচিত্র থাকা উচিত। হয়তো আমেরিকার কোন ধ্বংসাবশেষে এর সম্পূরক ভূচিত্রটি কোনোদিন বেরোবে।

রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশে বর্ণিত ভূচিত্রকে আধুনিক ভূচিত্রের সঙ্গে মেলাবার চেষ্টা করেছেন অনেকে। এঁদের মধ্যে আছেন W.T. Wilford, যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি, হারীতকৃষ্ণ দেব, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও আরো অনেকে। ত্রিপাঠি এগুলির ভিত্তিতে একটি মানচিত্রে অঞ্চলগুলির সংস্থান দেখিয়েছেন।

রামায়ণ প্রসঙ্গ শেষ করার আগে একটা কথা লক্ষ করা যেতে পারে। রামায়ণই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের hierarchyর বাইরে একমাত্র পৌরাণিক গ্রন্থ। এর বিষয়বস্তু চারণকবির বিষয়বস্তু। মহভারতে দানব আছে, অনাচারী লোভী রাক্ষস আছে কিন্তু রাবণের মতো যোগসিদ্ধ রাক্ষস নেই, আর নেই অসুর। তেমনি রামায়ণে দানব নেই। বোধহয় রামায়ণ সম্পূর্ণ যাযাবর, আর জমির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল, এই দুধরনের মানবসমাজের মাঝামাঝি (transtional)।

দিক্‌-নির্ণয় যন্ত্র ঃ

দুহাজার বছর আগে আধুনিক কম্পাসের মতো কোন যন্ত্র ছিল কিনা বলা মুশকিল, কারণ কম্পাস ছাড়া ভূগর্ভে পরিকল্পনা-মতো সুষ্ঠুভাবে খনন তো সম্ভব নয়! অথচ সেরকম সুড়ঙ্গের বর্ণনা তো আছেই, ধ্বংসাবশেষও আছে। স্বভাবজ চুম্বক যা অয়স্কান্ত মণি (lodestone) নামে পরিচিত, তাছাড়া আর কোনোরকম চুম্বকও তো ছিলনা! পরবর্তীকালের বৃহৎসংহিতা, জ্যোতিষগ্রন্থ,

বৃহজ্জাতক, বা তারও বেশ ক-শতক আগের বাস্তুবিদ্যার আকরগ্রন্থ মানসার, কোথাও কম্পাসের অনুরূপ কোন যন্ত্র দিয়ে জরিপ করার পদ্ধতি চোখে পড়েনি।

তবে অন্য একটি বিবরণ থেকে স্বভাবজ চুম্বক থেকে অতিশক্তি চুম্বক যে তৈরি করার মতো প্রযুক্তি প্রাচীনযুগেও ছিল তা অনুমান করা যায়। বিবরণটি ত্রয়োদশ শতাব্দীর একটি আরবী বিবরণ।[59] সোমনাথের মন্দির সম্বন্ধে। যেহেতু এটি মুসলমান ঐতিহাসিকের, এবং কাফেরের মন্দির সম্বন্ধে, তাই এটি বাস্তবানুগ ও বিশ্লেষণধর্মী বলে মনে করা বোধহয় অসঙ্গত হবেনা। সোমনাথের বিগ্রহ সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে বিগ্রহটি ছিল শূন্যে ভাসমান। গর্ভগৃহ বা বিগ্রহের প্রকোষ্ঠটি ছিল অন্ধকার। শেষবার আক্রমণের সময় সুলতান মামুদ এই অত্যাশ্চর্য মূর্তি কীভাবে শূন্যে ভেসে আছে সে সম্বন্ধে তার অনুচরদের জিজ্ঞাসা করে। কেউ কেউ বলে, প্রকোষ্ঠের অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে যাদুকরের কৌশলের মতো কোনো কৌশলে ওটাকে ছাদ থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আসল কৌশলটা বার করার জন্য দুজন অনুচর বিগ্রহের উপরে ও নিচে তলোয়ার চালিয়ে দেখল। তলোয়ার একদিক থেকে অন্যদিকে চলে গেল, মূর্তি কিন্তু স্থানচ্যুত হলোনা! তখন অন্য অনুচররা বলল, তাহলে নিশ্চয়ই বিগ্রহের উপরে নিচে চুম্বক বসিয়ে তার মধ্যে কোনো কৌশলে মূর্তিটি রাখা আছে। সুলতানের আদেশে তখন প্রকোষ্ঠের ছাদের দুটি পাথর সরিয়ে দেওয়া হলো। তাতে মূর্তিটি একপাশে হেলে পড়ল। তখন আরো কটি পাথর সরানো হলো। মূর্তিটি এবার কিছুটা নেমে এল। শেষে ছাদের সবকটা পাথর সরাতে সেটি মেঝেতে পড়ে গেল।

স্বভাবজ চুম্বক ব্যবহার করে এরকমভাবে বিগ্রহ শূন্যে ঝুলিয়ে রাখা কোনো-মতেই সম্ভব নয়। তবে কৃত্রিম উপায়ে মেরুত্ব (polarity) ওয়ালা ছোট ছোট দানাগুলোর চৌম্বক অক্ষ যদি সমান্তরালভাবে সাজিয়ে একটা বড় চুম্বক গড়ে তোলা যায় তবে তা আধুনিক কৃত্রিম চুম্বকের সমকক্ষ হতে পারে। যদিও কাজটা বিপুল সময়সাপেক্ষ বলে অবিশ্বাস্য, তবু সম্ভব।

বৈশেষিক দর্শনের প্রণেতা ঋষি উলুক, কণাদ নামে যিনি বেশি পরিচিত, প্রথম বলেন কণার সমবায়নে বস্তুর উৎপত্তির কথা। পরমাণু যে সৎস্বরূপ নিত্যপদার্থ সেকথাও প্রচার করেন তিনি। ব্রজেন্দ্রনাথ শীল কণাদের পরমণুবাদ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে Dalton এর Atomic Theoryর সঙ্গে তার তুলনা করেছেন। কণাদ-দর্শনে আধিদৈবিক ক্ষমতাসম্পন্ন কোনো ঈশ্বরের উল্লেখ নেই।

সুতরাং কণাদকে মনে করা যেতে পারে প্রাচীন ভারতের এক বিশিষ্ট জড়-বিজ্ঞানী (material scientist)। কণাদের সূত্র থেকে যদি কোনো প্রযুক্তির উদ্ভব হয়ে থাকে তবে সে প্রযুক্তিতে চৌম্বককণিকা সমচারিত করে অতিশক্তিশালী চুম্বক তৈরি কিন্তু আর অসম্ভব বলে মনে হয়না। এ প্রযুক্তি যদি সত্যই সেযুগে থেকে থাকে তবে কম্পাস ছিলনা একথা মনে করতে বাধে।

মানচিত্র ঃ

জরিপ যখন ছিল তখন নক্সা আঁকার পদ্ধতিও ছিল। সুতরাং মানচিত্র আঁকারও পদ্ধতি ছিল। জানিনা কোথায় সেসব প্রাচীন মানচিত্রের প্রতি-লিপি বা আসল মানচিত্র পাওয়া যেতে পারে। এদেশের কোনো মন্দিরগাত্রে খোদিত এরকম কোনো মানচিত্রের কথা শুনিনি।

অতি প্রাচীনকাল থেকেই আর্যাবর্তকে মধ্যদেশ বলে উল্লখ করা হয়ে আসছে। উপদ্বীপ ভারত বরাবরই দক্ষিণদেশ। যে পৌরাণিক বিবরণে ভারতবর্ষ জম্বুদ্বীপ বলে একটি অঞ্চলরূপে বর্ণিত হয়েছে, সেখানে কিন্তু আর্যাবর্তের মধ্যদেশ হবার কথা নয়। নিরক্ষীয় অঞ্চলটাই মধ্যদেশ, দক্ষিণ গোলার্ধে দক্ষিণদেশ আর উত্তর গোলার্ধে উত্তরদেশ হওয়া উচিত। তাই মনে হয় পৌরাণিক বিবরণে ভূসংস্থানের পরিচয়টুকু প্রধানত উত্তর গোলার্ধের। তবে তারও আগে সিন্ধুসভ্যতার যুগেও যে আর্যাবর্ত মধ্যদেশ ছিল তা মনে করার কোনো কারণ নেই। গত দু দশক ধরে সমুদ্রতলে যেসব অনুসন্ধান চলেছে তাতে আমাদের ইতিহাসে প্রাগৈতিহাসিক নামে চিহ্নিত সভ্যতাগুলি সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা ক্রমশ বদলাচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে হয়তো দেখা যাবে যে যেগুলিকে আমরা আধুনিক সভ্যতার প্রাথমিক স্তর মনে করে এসেছি, প্রকৃতপক্ষে সেগুলি একটি উন্নত সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ।*

বরাহমিহিরের নক্ষত্রকূর্মাধ্যায়ে (অধ্যায়ে-14) আছে এদেশের নদনদী ও পর্বতের আর দেশের অবস্থান। তারপর বিভিন্ন দেশের বা অঞ্চলের নিয়ন্ত্রক

---

* আগ্রহী পাঠক Alexander Kondratov-এর The Riddles of Three Oceans, Progress Publishers, Moscow, 1974, ও Z. Zukal-এর Atlantis in the light of Modern Research, Elsevier Science Publishers, Amsterdam, 1984. বই দুটি দেখতে পারেন।

নক্ষত্রের নাম। যে হিসাবে বারবার বিভ্রান্ত হতে হয় তা হলো যোজনের হিসাব। যোজন বলতে সাধারণত বোঝায় চার ক্রোশ, বা আট মাইল। কিন্তু জম্বুদ্বীপের পূর্ব-পশ্চিম বিস্তার 40,000 যোজন (চত্বারিংশোত্তরং যোজনসহস্রং জম্বুদ্বীপস্তত্র ইত্যাদি), তখন মাপটা আর বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়না। সংস্কৃত অভিধানে যোজন শব্দের আর-একটি অর্থ দুই অঙ্গুলি।' অর্থাৎ প্রায় তিন ইঞ্চির মতো। যখন সুমেরু পর্বতের উচ্চতা বলা হয় 84,000 যোজন তখন এই মাপ অনুযায়ী 21,000 ফিটটা আর আগের মতো অবিশ্বাস্য মনে হয়না। রামায়ণ মহাভারতের যোজনের মাপ অতিরঞ্জনের ফলে অর্থহীন। কিন্তু বরাহমিহিরের যুগে তো তা হবার কথা নয়! তাই যেটা মনে হয় তা হলো, যোজনের মাপ বারবার বদলেছে। ঠিক এরকমই হয়েছে দূরত্বের রোমান মাপ স্টেডিয়ার বেলায়। স্টেডিয়াকে যদি যোজনের সমান বলে ধরি (যদিও ব্যুৎপত্তির দিক থেকে তা ধরার কোনো কারণ নেই), তবে 40,000 যোজন হয়ে দাঁড়ায় 5000 মাইল। ব্রহ্মদেশের পূর্ব থেকে আফগানিস্থানের পশ্চিম সীমানা পর্যন্ত উপ-মহাদেশের পূর্বপশ্চিম বিস্তার তাহলে একটা বিশ্বাসযোগ্য মাপে এসে হাজির হয়। সুমেরুর (উত্তর মেরু ধরলে) উচ্চতা 84000 যোজন যদি উজ্জয়িনী কিংবা মগধ থেকে সুমেরুর দূরত্ব বলে ধরি তবে তা প্রায় 10,000 মাইলে এসে দাঁড়ায়। প্রাচীন জ্যোতিষে খ-গোলক (celestial sphere)-এ নক্ষত্রের অবস্থানের উপর দিকনির্ণয়ের জন্য নির্ভর করা হতো বলে প্রায়ই উত্তরদিককে ঊর্ধ্ব ও দক্ষিণদিককে অধঃ বলে বর্ণনা করা হতো। সেই থেকেই দক্ষিণদিকে অবস্থিত দেশগুলিকে পাতালদেশ বলে উল্লেখ করার প্রচলন।[47]

সপ্তদ্বীপ ও সপ্তসমুদ্র কথা-দুটি প্রাচীন পৌরাণিক বিবরণে বারবার আছে। কর্নেল উইলফোর্ড জার্নাল অব এশিয়াটিক রিসার্চেজ-এর বিভিন্ন সংখ্যায় বেশ কয়েকটা পৌরাণিক মানচিত্র তুলে ধরে সেগুলোর ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন : that there are seven zones, that is what is conveyed by seven continents – are really our seven climates... The seven zones of the Hindus correspond with the following countries : Jambu (জম্বু) as India, Cuśa (কুশ) answers to the countries between the Persian Gulf, the Caspian Sea and Western India, Placsha (প্লক্ষ) includes the lesser Asia, Armenia etc. S'almali (শাল্মলী) is bounded to the west by the Cronian sea, that is to say the

Adriatic and the Baltic seas. Craunch (ক্রৌঞ্চ) includes Germany, Sakam (শকম্) the British Isles, and Puskar (পুষ্কর) is Iceland। উইলফোর্ডের মানচিত্রে অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, আফ্রিকা ইত্যাদির কথা নেই।

বরাহমিহিরের নক্ষত্রকূর্মাধ্যায় বিশ্লেষণ করলে ত্রিমাত্রিক অভিক্ষেপ (stereographic projection)-এর ধারণা যে ছিল তা অনুমান করা যায়। এই অভিক্ষেপের মেরু (pole)-কে বলা হতো সুমেরু। অর্থাৎ সে যুগের সুমেরু আর আজকের সুমেরু সমার্থক নয়। এই সুমেরু কৈলাস শৃঙ্গ হতে পারে, আবার হিমালয়ের অন্য কোনো উঁচু শিখরও হতে পারে। মনে হয় পৌরাণিক যুগে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শৃঙ্গকে সুমেরু বলে অভিহিত করা হয়েছে।

খ্রীস্টপূর্ব প্রথম সহস্রকের শেষদিকে যখন উপমহাদেশের সঙ্গে গ্রীক রোমক মিশরীয় ইত্যাদি সভ্যতার নিয়মিত যোগাযোগ ও সাংস্কৃতিক বিনিময়, তখন এইসব পৌরাণিক সংজ্ঞা যে হারিয়ে যেতে বসেছে তা পণ্ডিতরা উপলব্ধি করেছিলেন। তাই পাণিণির অষ্টাধ্যায়ী ও যাস্কের নিরুক্তে বহু শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বার করার প্রয়াস দেখা যায়। ফলে, ব্যাকরণ ও শব্দকোষ ছাড়াও এ দুটিকে পৌরাণিক ভূগোলের কোষগ্রন্থ বলে মনে করা যেতে পারে। পরবর্তীকালে ভাষাশিক্ষার জন্য এ গ্রন্থ দুটির যত ব্যবহার হয়েছে, ভৌগোলিক সংজ্ঞাগুলি সংরক্ষণের জন্য তত হয়নি।

জরিপ পদ্ধতি ও শুল্বশাস্ত্র :

মহাভারতের যুদ্ধকে অনৈতিহাসিক বলে যদি বাদও দেওয়া যায় তবু অশোকের কলিঙ্গ বিজয়ের মতো বড় বড় যুদ্ধে নকসার ব্যবহার ছিল একথা মনে করতেই হয়। এছাড়াও পাটলিপুত্রের মতো বেশ কটি মহানগরীর পরিকল্পনায় জরিপের বহুল প্রচলনের নিদর্শন আছে। ক্লাইভ যেমন আলিবর্দির মুর্শিদাবাদ দেখে চমকে উঠেছিলেন, সেযুগে তেমনি চমকে উঠেছিলেন মেগাস্থিনিস পাটলিপুত্র দেখে।

যে শাস্ত্রে জরিপ ও নক্সা আঁকার পদ্ধতি আলোচিত হয়েছে তা শুল্বশাস্ত্র। ব্যুৎপত্তির দিক দিয়ে শুল্বের অর্থ হলো পরিমাপ করা। কিন্তু কথাটা চারটি অর্থে বিভিন্ন সময়ে ব্যবহৃত হয়েছে। —(1) প্রকৃত জরিপ পদ্ধতি, (2) জরিপের ফলে যে রেখা বা তল পাওয়া গেল বা topography, (3) জরিপ করার যন্ত্র ও

(4) জরিপশাস্ত্র ও মানচিত্র অঙ্কনবিদ্যা বা cartography। পরবর্তীকালে শিবদাস (1320—1380 A.D) শুল্ববিদ হতে গেলে যে গণিতের পাঠক্রম শেষ করে এ শাস্ত্র শুরু করতে হবে তা বলেছেন।

তাই বিভিন্ন গণিতজ্ঞের নাম বিভিন্ন ধারার শুল্বশাস্ত্রে পাওয়া যায়। বিভূতি ভূষণ দত্ত তাঁর The Science of Sulva গ্রন্থে এরকম সাতটি system of mensuration-এর নাম দিয়েছেন—বৌধায়ন, আপস্তম্ব, কাত্যায়ন, মানব, মৈত্রায়ন, বরাহ ও বাধুল। লুই রেনো (Louis Renou) তাঁর Table of Vedic School গ্রন্থে আরো দুটি ধারার নাম দিয়েছেন—লৌগাক্ষি ও হিরণ্য-কেশী। মূলত systemগুলি সব একই। সম্ভবত বৌধায়নের (400 B. C) শুল্বসূত্র এগুলির মধ্যে প্রাচীনতম। বৌধায়নের প্রায় সমসাময়িক ছিলেন কাত্যায়ন। তাঁর শুল্কসূত্রের একটি সূত্র হলো বর্গক্ষেত্রের নির্দিষ্টগুণ ক্ষেত্রফলের আর একটি বর্গক্ষেত্র আঁকার পদ্ধতি। অর্থাৎ কাত্যায়নের যুগে স্কেলের ব্যাপারটা জানা ছিল।

সে যুগের নক্সায় উপরের দিকটা ছিল পূর্বদিক, যেমন এ যুগের নক্সায় উপরের দিকটা উত্তরদিক। শতপথব্রাহ্মণে কারণ হিসাবে বলা হয়েছে পূর্বদিকটা স্বর্গের দ্বার। আমার কিন্তু মনে হয় মেধাতিথি (ঋগ্বেদ) ও লগধের (900 B.C) যুগে পূর্বদিকটা বার করা উত্তর দিকের তুলনায় অনেক সহজ ছিল বলেই উপরের দিকটা সর্বদা পূর্বদিকরূপে চিহ্নিত হত। আজ যেমন উত্তর দিক থেকে ঘড়ির কাঁটা অনুযায়ী আসে যথাক্রমে পূর্ব দক্ষিণ ও পশ্চিম, সেদিনের নক্সায় তেমনি ছিল পূর্বের পর যথাক্রমে দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর।

বৌধায়নের শুল্বশাস্ত্রে যে ম্যাপ আঁকার পদ্ধতি আছে তা 81 সূত্রে পাওয়া যায়। বৌধায়নের অনুবাদ করতে গিয়ে Thibaut[61] লিখেছেন—The shape of Agni is drawn on the Ground। ভাষ্যকার দ্বারকানাথ যজ্বা এই মানচিত্রকে 'রূপাণি' বলে উল্লেখ করেছেন — তত্র…পক্ষপুচ্ছাদি বিভাগেন দর্শয়েৎ ইষ্টকারূপাণ্যর্ধেষ্টক অপাদেষ্টকরূপাণি তত্রদেশে যথাস্থানং লিখিত্বা… ইত্যর্থঃ। ব্যাবিলনে গাইস্থর অঞ্চলে পোড়ামাটির ইটের উপর আঁকা ম্যাপের মতো এদেশেও ইটের গায়ে ম্যাপ আকা হতো। ক্যাত্যায়নের শুল্বশাস্ত্রে levelling-এর বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। অবাক লাগে ভাবতে যে স্কেলের ক্ষুদ্রতম এককটি ছিল এক মিলিমিটারের প্রায় তিনভাগের একভাগ, এত সূক্ষ্মভাবে জরিপের প্রচলন ছিল।

মানসার-এ আট ধরনের ম্যাপ-এর কথা আছে—আয়তক্ষেত্রাকার (দণ্ডক), বর্গক্ষেত্রাকার (সর্বতোভদ্র), নন্দ্যাবর্ত, গোলাকার (পদ্মক), স্বস্তিকার আকৃতি (স্বস্তিক), প্রস্তর, কার্মুক, চতুর্মুখ।[38] কারো কারো মতে স্বস্তিকা চিহ্নটি নাকি মায়াসভ্যতার ধ্বংসাবশেষের মধ্যেও পাওয়া যায়।

কোটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রের 20 অধ্যায়ে সার্ভেয়ার জেনারাল ও সার্ভে বিভাগের কথা বলে গেছেন। অনেক পরে এয়োদশ শতাব্দীতে মার্কো পোলোর হাতে পড়েছিল আরব ও পারসিকদের তৈরি ম্যাপের সঙ্গে দ্রাবিড়দের তৈরি ম্যাপ। মার্কো পোলোর ধারনা যে এগুলি ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের মানচিত্রের সমতুল্য তো বটেই, কোথাও আবার সেগুলির চেয়েও ভালো, অর্থাৎ সঠিক। শোনা যায় ভাস্কো ডা গামা ভারতীয় নাবিকদের হাতে এ ধরনের ম্যাপ দেখেছিলেন।

1860 সালে বৃটিশ অভিযানকারী J. H. Speke যখন নীলনদের উৎস অনুসন্ধান করছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গে যে ম্যাপটি ছিল সেটি পৌরাণিক বিবরণের উপর ভিত্তি করে ভারতীয়দের আঁকা, আর এযুগের বৃটিশ বিবরণ[62] থেকে দেখছি তা যথেষ্ট ভ্রান্তিহীন।

আট ঃ মধ্য ও আধুনিক যুগের ভূবিদ্যা

উপমহাদেশে ভূবিদ্যার ক্রমবিকাশের ধারা আলোচনা করতে গিয়ে বারবার বর্ণাশ্রম কথাটায় আসতে হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এ বর্ণাশ্রম পৌরাণিক যুগের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই চারটি বর্ণ নয়, বৃত্তিভিত্তিক অসংখ্য বর্ণ। যদিও সব বর্ণের উৎপত্তিই বৃত্তি থেকে, তবু মানবপ্রকৃতির অভিনব রসায়নে তা দাঁড়িয়ে গেল উত্তরাধিকারে, এবং অর্থনৈতিক কাঠামোতে, জাতিভেদে। ফলে আর প্রতিভার বিকাশের সুযোগ রইলনা। সমাজের এইরকম একটা অবস্থা প্রথম ঠিক কবে এসেছে অনুমান করা শক্ত, কারণ তার আগের যুগের পুরাণে পরের যুগের পরম্পরাগত ইতিহাস আজ ঢুকে পড়েছে প্রক্ষিপ্তরূপে। তবে মনে হয় মহাভারতের যুগে ব্যাপারটা অনেকদূর এগিয়েছে, নইলে সূতপুত্র বলে কর্ণের এত অবমাননা কেন! মহাভারতের যুদ্ধের সঙ্গে অধিকারভেদের এই অচলায়তন ভেঙ্গে পড়ে এল একটা অন্ধকার যুগ। মহাভারতের মৌষলপর্বে এই যুগটার সূচনা বর্ণিত হয়েছে যেখানে পাঞ্জাবের আভীর দস্যুরা অর্জুনের সামনে থেকে যাদব নারীদের হরণ করে নিয়ে গেল, কিন্তু মহাবীর অর্জুন কোন দিব্যাস্ত্র স্মরণ করে তাদের রক্ষা করতে পারলেন না। মহাকাব্যের এই বর্ণনা যুদ্ধোত্তর জার্মানি, পোল্যাণ্ড, জাপান সর্বত্রই মিলে যেত যদি মহাভারতের যুগ থেকে যোগাযোগ ব্যবস্থা সহস্রধাপ এগিয়ে না আসত।

যদি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকে বাস্তব ঘটনা বলে মেনে নিই, তবে তার প্রভাবও স্বীকার করতে হয়। আর সে প্রভাব প্রধানত বিন্ধ্যপর্বতের উত্তরাঞ্চলে সীমাবদ্ধ, দাক্ষিণাত্যে তার প্রভাব অনেকটাই কম। তবে উত্তরাপথ বলতে শুধু সিন্ধুগাঙ্গেয় সমভূমি না আরো বিস্তৃত অঞ্চল সে সম্বন্ধে সন্দেহ হয় যখন দেখি যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ উপলক্ষ্যে পূর্বে মণিপুর থেকে পশ্চিমে গান্ধার (আফগানিস্থান) ও উত্তরে কিরাতভূমি (নেপাল-তিব্বত পর্যন্ত) আলোড়িত হতে। অর্থনীতি ভেঙে পড়া ছাড়াও সামাজিক নিরাপত্তাবোধের অভাব, তা থেকে জাত সদ্য সদ্য ফললাভের আকাঙ্খায় নানারকম ক্রিয়াকলাপ, এ সবই প্রভাবিত করল

উত্তরাপথকে। এই বিশৃঙ্খলার সুযোগে ছোট ছোট দলের নেতারা নিজেদের অধিকার কায়েম করে ছোট ছোট রাজ্যের পত্তন করল। গ্রীস ও মধ্যপ্রাচ্যে, মিশরে এবং সম্ভবত আরো কোথাও কোথাও তখন যথেষ্ট উন্নত সভ্যতা বর্তমান ছিল। অরাজকতার সুযোগে তাদের কারো কারো পক্ষেও এদেশে ঢুকে পড়া অসম্ভব নয়। বুদ্ধের যুগেও কোথাও কোথাও যবন রাজ্যের কথা পাওয়া যায়। জানিনা বিশেষজ্ঞরা কি বলবেন, তবে আমার ধারণা এই নিরাপত্তাবোধের অভাব থেকে অথর্ববেদ তার ভূতপ্রেত গ্রহশান্তি ইত্যাদি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে এযুগে। মহাভারতে অত ভাগ্যবিপর্যয়ে হাহুতাশের মধ্যে কোন দৈবজ্ঞকে গ্রহশান্তির কোন বিধান দিতে দেখিনা শুধু ঋগ্বেদের যাগযজ্ঞ ছাড়া!

পরবর্তীকালের রচনা থেকে রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় দেশের অবস্থার খানিকটা আভাষ দিতে গিয়ে বলেছেন—Between 650-325 B. C. in Northern India, we find instances of princes working as trader with a caravan, as a potter, florist, and a cook in succession, as an archer on hire, or as a menial servant. Kshatriyas of the Śakya and Koliy clans were working in the fields of their bhojakas, amachhas and uparājās, and quarreling for priority of right to irrigate. Brāhmanas taking to trade and even working as archers. যে জাতিভেদের কোনো নৈসর্গিক ভিত্তি নেই তা এইভাবেই ভাঙল। এরপর odd jobs-এর একটা তালিকাও আছে—...tillage, tending cattle, trade, hunting, carpentry, weaving, policing of caravans, archery, driving carriages, and even snake-charming, and (the Jātakas) hold up a Brāhman peasant as a supremely pious man, and even a Bodhisattva. A deer trapper becoming a bosom friend of a setthi without any barrier between them...there is an instance of a father without reference to his own occupation, asking his son to choose between writing, accounting and money changing.[7]

তবে দক্ষিণাপথে অবস্থাটা অন্যরকম। সেখানে তখন উত্তরাপথের উপর নির্ভর না করে যে বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় আছে তা অনুমান করা যায়। পরবর্তীকালে বরাহমিহিরের বিবরণে দাক্ষিণাত্যের বহু অঞ্চল সম্বন্ধে অবিশ্বাস্য বর্ণনা দেখে স্পষ্ট হয় যে দক্ষিণাপথের ভৌগোলিক বিবরণ অনেকটাই

হারিয়ে গিয়েছিল, বিশেষ করে মাদুরা, রামেশ্বর, কাবেরী নদীর অববাহিকার অঞ্চলগুলি, পশ্চিমঘাটের দক্ষিণাংশের অঞ্চলগুলি, অর্থাৎ সুদূর দক্ষিণের দেশগুলি। দক্ষিণাপথে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার অনুশীলন এই অন্ধকারযুগেও অব্যাহত ছিল। পরবর্তীযুগে তার খবর পাওয়া যায় নানান কাহিনীতে দক্ষিণদেশীয় বিদ্যা, সিংহলী জ্যোতিষ ইত্যাদি কথায়। পরবর্তীকালে এই দক্ষিণদেশীয় বিদ্যাগুলি উত্তরাপথের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমে বোধহয় স্থান পায়নি। বরাহমিহিরের যুগে দাক্ষিণাত্যের উত্তরাংশ শুধু ভালভাবে জানা ছিল।

উত্তরাপথে বৃত্তিভিত্তিক বর্ণবিভেদ ভাঙার যুগে প্রসার ঘটল বৌদ্ধধর্মের, আর বৌদ্ধধর্মের প্রসারের ফলে বিদেশীরা ভারতীয়দের কাছে এল মানুষরূপে, মহাভারতের যুগের মতো দানব (ময়দানব ইত্যাদি), কিরাত, গন্ধর্ব ইত্যাদির মতো নয়। এই যুগটা (খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় কি চতুর্থ শতক থেকে খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতক পর্যন্ত) সাংস্কৃতিক বিনিময়ের যুগ। ভূবিদ্যায় গ্রীসের সমসাময়িক মতবাদের প্রভাব ভারতে এসেছে, কিন্তু ভারতীয় মতবাদের অপসংস্কৃত ব্যাখ্যা গিয়ে উপস্থিত হয়েছে গ্রীসে বা গ্রীক দার্শনিকদের রচনায়। বৃহৎসংহিতায় মাণিক্যের বর্ণনার সবটাই যে এদেশে বার হয়নি তা দেখা গেছে মাণিকবিদ্যার আলোচনা প্রসঙ্গে। আগ্নেয় ভূকম্প তো সম্পূর্ণ বাইরে থেকে আসা। এসেছে শিলাখননের প্রক্রিয়া, বাস্তুবিদ্যার নানান বিষয়। সেখানে গ্রীক রচনা ও তার প্রভাবে প্রভাবান্বিত পরবর্তীকালের রচনায় পাথর, চুম্বক ইত্যাদি সম্বন্ধে নানা কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ আছে, আর বলা হয়েছে তার সবগুলিরই উৎস হলো ভারতবর্ষ।

গ্রন্থের পরিসরের কথা ভেবে দু একটি বলছি। প্রথমে ভাবা হয়েছিল যে এ বিবরণ অ্যারিস্টট্লের, পরে দেখা গেল আবিসেন্নার (Avicenna, 980—1037 A. D)। বর্ণনা আছে ঈগল শিলার—it is stated that the female eagle lays her egg with difficulty; and when the male eagle finds that she cannot produce her eggs, he at once betakes himself to India where the stone is to be found, and returning then with a specimen in his beak, places it beneath its mate, who through its influnce lays its egg ..The Horus Sanitatis states that the Stone is found in the mountains of India between Chirras and saradi. ঠিক তেমনি Camilius Leonardus এর বর্ণনায় আছে মার্গারিটা

মুক্তার উৎস—It was found in the stomach of a mountatin goat, that lived in the mountains of Persia and India, this variety was known as Oriental Bezoar।[22] আর, আরো প্রাচীনকালে চুম্বকশিলায় আকৃষ্ট হয়ে জাহাজের পেরেক খুলে গিয়ে জাহাজ ডুবি হবার যে গল্প, তারও অকুস্থল বলা হয়েছে ভারতবর্ষে।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে স্বল্প তথ্য থেকে সামান্যীকরণ বোধহয় চিরকালের, কারণ মার্কো পোলো, ইবনবতুতা, বার্ণিয়ে, এবং বৃটিশ শাসনের কালে বিভিন্ন সৌখীন পরিব্রাজক ও পর্যটনকারীর লেখায় এ ধরণের ভ্রান্ত উক্তি বারবার চোখে পড়ে।

উত্তরাপথে আবার একটা অবক্ষয়ের যুগ গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর থেকে। অবশ্য গুপ্তসাম্রাজ্যের কাল থেকেই সভ্যতা সঙ্কুচিত হয়ে চলেছে নগরে। যাদের হাতে খনি ও খননবিদ্যা, সেচ, চাসবাস, তারাও কপাল ফিরাতে এসে হাজির হলো শহরাঞ্চলে। আর ও-সব কাজের কলাকৌশলের দায়িত্ব এসে পড়ল শ্রমিকদের উপর, যাদের অধিকাংশই ছিল খনি-অঞ্চলের আদিবাসী, বর্ণে শূদ্র। ব্যাপারটা সেযুগে সম্ভব ছিল কয়লা বা পেট্রোলিয়ামের মতো জ্বালানি আবিষ্কারের অভাবে। কণিষ্কের যুগে বিশাল সাম্রাজ্যে দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রয়োজন অনুভব করা গেলেও জ্বালানির অভাবে পশুশক্তির উপরে উঠে সভ্যতা যন্ত্রশক্তির দিকে এগোন যায়নি।

নাগরিক সভ্যতার আবার নিজস্ব কতকগুলি দাবী আছে। আর সে দাবী মিটাতে গিয়ে এল আলকেমি, তার সঙ্গে চিকিৎসা ও ভেষজবিদ্যার প্রসার, আর তার সঙ্গে সার্জারি। এইসব চাহিদা মেটাতে গিয়ে একদিকে শুরু হলো বিভিন্ন ধাতু নিয়ে এলোপাতাড়ি পরীক্ষা-নিরীক্ষা, আর অন্যদিকে সবচেয়ে বিশুদ্ধ ধাতু নিষ্কাশন প্রক্রিয়া বার করার জন্য গবেষণা। তাই এযুগে ধাতুবিদ্যার অনেক উন্নতি ঘটল। ফলে মণিকবিদ্যায় অনেক নূতন তথ্য সংযোজিত হলো। রসবাচক অসংখ্য গ্রন্থে (যেমন রসরত্নাকর—নাগার্জুন, রসমৃগাঙ্ক—ভোজদেব, রসচন্দ্রোদয়—চন্দ্রসেনা, রসকামধেনু—চুড়ামণি মিশ্র, রসরত্ন-সমুচ্চয়—ভাগভট ইত্যাদি)। এযুগে ধাতু-রসায়নের উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। ভূবিদ্যা বিষয়ক কোনো স্বতন্ত্র গ্রন্থ এসময়ে রচিত হয়ে থাকলেও তা এদেশে আছে কিনা সন্দেহ।

বরাহমিহিরের পর প্রাচীন রচনাগুলির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ প্রথম পাই আলবিরুনির লেখায়।

আলবিরুনি ঃ

আবু রাঘান মুহম্মদ ইবন আহম্মদ আলবিরুনির জন্ম 973 খ্রীস্টাব্দে, মৃত্যু 1050-এর পরে। 1017 খ্রীস্টাব্দের পর তুর্কীর গজনবীশ রাজবংশের সুনজরে পড়েন মধ্যপ্রাচ্যের এই বিজ্ঞানী। পরে ইনি আফগানিস্তানের মধ্য দিয়ে ভারতে আসেন এবং দিল্লীর দরবারে কয়েক বছর কাটান। তাঁর রচনা প্রধানত জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যোতিষ ও ফলিত গণিত বিষয়ে। অক্ষাংশ সূক্ষ্মভাবে নির্ণয় করা ও রত্নের ঘনত্ব নির্ণয় তাঁর প্রধান বিজ্ঞানবিষয়ক কাজ। আবিসেন্না বা ইবন সিনা তাঁর ঠিক আগের যুগের, কিন্তু লক্ষ্য করা যায় যে বিভিন্ন বিষয়ে এই পূর্বসূরীর মতবাদ আলবিরুণিকে কিছুমাত্র প্রভাবিত করেনি।

তাঁর রচনায় বর্তমান প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য দুটি বিষয়—পৌরাণিক কালের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নিরূপণ ও স্বর্ণলঙ্কার অবস্থান স্থির করার চেষ্টা।

পৌরাণিক বিবরণে দেওয়া কোটি কোটি বছরের কল্প মন্বকাল যুগ গতশতাব্দীতে চার্ল্স্ লায়েলকে যেমন দ্বিধায় ফেলেছিল আলবিরুনিকেও ভাবিয়েছিল তেমনি। তবে আলবিরুনি নানাভাবে প্রশ্নটা অনুধাবন করে এটা অবৈজ্ঞানিক বলে নাকচ করে দিয়েছেন।

স্বর্ণলঙ্কা সম্বন্ধে অবশ্য ঠিক এরকম মত প্রকাশ করেননি তিনি। পৌরাণিক বিবরণ অনুযায়ী তিনি স্বর্ণলঙ্কাকে ধরেছেন 0° দ্রাঘিমারেখার উপর, এবং সেই দ্রাঘিমারেখা গেছে মেরুপর্বত, কুরুক্ষেত্র, যমুনা, রোহ্তাক্ ও উজ্জয়িনীর উপর দিয়ে। আলবিরুনি কিন্তু মেরুপর্বতকে সুমেরু (North pole)-এর সঙ্গে মেলাননি। বরং সুমেরুকে বলছেন ধ্রুব (constant), তাই তার ঠিক উপরে যে নক্ষত্র তার নাম ধ্রুবতারা। এই প্রথম পুরাণের সুমেরু আর ভূগোলকের উত্তরমেরু যে এক নয় তা জানা গেল। তাহলে 0° দ্রাঘিমারেখা যে বরাবর একই দ্রাঘিমাকে ধরা হতো তা ভাবারও কোন কারণ নেই। প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ও অশোকের সময়ে নিশ্চয়ই 0° দ্রাঘিমা উজ্জয়িনীর উপর দিয়ে ধরা হতোনা, নিশ্চয়ই ধরা হতো পাটলিপুত্রের উপর দিয়ে। সুতরাং পাটনার উত্তরে মধ্যহিমালয়ের কোন পিরামিডের আকারের শিখরকে (ভূবিদের ভাষায় horn—যেমন আল্পসের ভাষায় Matter horn, কিংবা গোমুখ থেকে যে শিবলিঙ শৃঙ্গ চোখে পড়ে) বলা হতো মেরুপর্বত। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময় যখন 0° দ্রাঘিমা ধরা হলো উজ্জয়িনীর উপর দিয়ে, তখন সুমেরু শিখরকে নিয়ে আসতে হলো আরো পশ্চিমে, সম্ভবত উত্তরপূর্ব কাশ্মীরের কোন শৃঙ্গে।

আলবিরুনি লিখেছেন যে অনেক খুঁজেও নাবিকরা স্বর্ণলঙ্কা উদ্ধার করতে পারেনি। তাঁর ধারণা লঙ্কা কথাটা এসেছে লবঙ্গ থেকে, এবং স্বর্ণলঙ্কা এমন একটা মহাসাগরীয় দ্বীপ, যার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য ছিল লবঙ্গ।[63]

ইয়াকুব ইবন তারিখ নামে আর-এক গ্রন্থকারের উদ্ধৃতি দিয়ে বিরুনি বলেছেন যে উজ্জয়িনীর অক্ষাংশ ছিল $4\frac{3}{8}$ কিংবা $4\frac{2}{5}$ ডিগ্রী। অক্ষাংশের ব্যাপারটাও আমার মনে হয় দ্রাঘিমার মতো। রাজধানীর মধ্য দিয়ে যেমন উত্তর-দক্ষিণ বিস্তৃত 0° দ্রাঘিমা রেখা, তেমনি ধরা হতো পূর্ব-পশ্চিম বিস্তৃত 0° অক্ষরেখা (নিরক্ষরেখা)—লাটসাহেবের গাড়ির কি নাম্বার থাকে! এ অনুমানের পিছনে একটাই মাত্র যুক্তি, আর্যভট্টের (কুসুমপুরের আর্যভট্ট—জন্ম 476 A. D.) আগে পৃথিবী যে গোল এবং পৃথিবীর আহ্নিক গতির জন্য যে সমস্ত আকাশ ঘুরছে আর গ্রহ নক্ষত্র উদয় ও অস্ত যাচ্ছে এ কথা কেউ স্পষ্ট করে বলেননি। বৃত্ত, গোলক সংক্রান্ত ধ্রুবক π এর মান নির্ণয় ও সাইনের (sine) মান নির্ণয়ও প্রথম তিনিই করেন। সুতরাং, মহাবৃত্তের তাৎপর্য হারিয়ে যাওয়ার কালটা মনে হয় লোথাল-সিন্ধুসভ্যতা ও ঋগ্বেদের কালের সন্ধি। 0° দ্রাঘিমারেখা নির্বাচন প্রসঙ্গে বলি, ইওরোপীয় সভ্যতায় প্রথমে আলেকজান্দ্রিয়ার দ্রাঘিমা ধরা হতো 0° দ্রাঘিমা বলে। শ্রীষেণ রচিত রোমক সিদ্ধান্ত (476 A. D র পর) ও পৌলিক সিদ্ধান্তে আলেকজান্দ্রিয়ার নাম দেওয়া আছে রোমকনগর। সুতরাং স্বর্ণলঙ্কা সত্যিই দ্বীপ না দুর্গম বনবেষ্টিত একটা সমৃদ্ধ জনপদ সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে।

মার্কোপোলো ও ইবন বতুতা :

এঁরা দুজনেই মধ্যযুগের অভিযানকারী পরিব্রাজক। মার্কো পোলো (1254—1324 ? A. D) ইতালীয়, আর ইবন বতুতা (1304 ?—1378 ? A.D) আরব, তবে আরবে নয়, আফ্রিকার ট্যানজিয়ার্সে তাঁর জন্ম।

বলা হয় মার্কো পোলো প্রথম স্থলপথে ভেনিস থেকে পিকিঙ আসার রাস্তা ঠিক করেন। বহুবার তিনি কুবলাই খানের দরবারে এসেছেন, কিন্তু সম্রাটের নেকনজরে পড়ে সরকারী কাজের বরাত নিয়ে এক একবার তাঁকে এক এক পথে দেশে ফিরতে হয়েছে। এমনি একবার পারস্যে বসবাসকারী সম্রাটের এক দৌহিত্রের জন্য বাগদত্তা বধূকে পারস্যে পৌছাতে আসছিলেন চীনা নৌবহর নিয়ে। ভারতমহাসাগরে কিংবা বঙ্গোপসাগরের কোথাও ঝড়ে পড়ে নৌকাডুবি

হয়ে ভারতের পূর্বউপকূলে এসে ওঠেন তাঁরা। তারপর স্থলপথে দিল্লী পৌঁছে দিল্লীর দরবারের সঙ্গে যুক্ত পারসিক দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করে পারস্যে পৌঁছান। আর একবার পিকিঙ যাবার পথ বেছেছিলেন গান্ধার কাশ্মীরের মধ্য দিয়ে। ভারতের সঙ্গে পরিচয় এটুকু হলেও যাতায়াতের পথে যেসব কাহিনী তাঁর কানে যেত প্রকৃত বিজ্ঞানীর দৃষ্টি নিয়ে তিনি তা অনুধাবন করার চেষ্টা করেছেন। স্বর্ণলঙ্কার কাহিনী তাঁকেও আকৃষ্ট করেছে। শোনা কথার ভিত্তিতে জায়গাটা কন্যাকুমারীর 10^0 পূর্বে কোথাও বলে তাঁর ধারণা হয়। আজকের মানচিত্রের সঙ্গে মিলাতে বসলে জায়গাটা আন্দামানের কোন দ্বীপ বলে সন্দেহ হয়। গন্ধকে-ঢাকা Barren Island তাহলে স্বর্ণলঙ্কা হতে পারে।

ইবন বতুতা কিন্তু মার্কো পোলোর মতো অনুসন্ধিৎসু নন, যা শুনেছেন যা দেখেছেন তা বর্ননা করে গেছেন শুধু। তবে মার্কোর তুলনায় তাঁর ঘোরাঘুরি অনেক বেশি। দিল্লীর সুলতানের দূত হয়ে তিনি চীনে গেছেন, বিভিন্ন সময়ে সাহারামরু পার হয়েছেন, মালদ্বীপে গেছেন কিন্তু আলবিরুনির মতো যা দেখেছেন সেগুলোর ব্যাখ্যা দেননি। সিন্ধু প্রদেশে ঘোরাঘুরির সময় (1334 A. D) তিনি তরুনা বলে একটি অঞ্চলে (লহরী থেকে সাতমাইল) একটা শহরের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পান। সেখানে নাকি মানুষ ও বিভিন্ন পশুপাখির আধা-নষ্ট হয়ে যাওয়া শিলামূর্তি, বাঁধানো উঠান, শহর ঘিরে প্রাচীরের অবশেষ ইত্যাদি দেখে অবাক হয়ে তাঁর সঙ্গীকে জিজ্ঞেস করতে শোনেন যে প্রায় হাজার বছর আগে প্রকৃতির অভিশাপে শহরের সব প্রাণী পাথরে রূপান্তরিত হয়ে গেছে।[44] যতদূর দেখছি, ঋগ্বেদ ও প্রাচীনতম পৌরাণিক রচনার পর এই প্রথম সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের উল্লেখ। লহরী সম্ভবত লারকানা। পাণিনি, যাস্ক, মেগাস্থিনিস, আরিয়ান, স্ট্রাবো, ফা হিয়েন, হিউয়েন সাঙ কারো বিবরণে কোন হারিয়ে-যাওয়া সভ্যতার উল্লেখ নেই।

রাজ তরঙ্গিনী ঃ

কল্‌হন্‌-এর রাজতরঙ্গিণী হর্ষবর্দ্ধনের পরবর্তী যুগের (A D 596-1151 A.D) উত্তরপশ্চিম ভারতের একমাত্র বিস্তারিত ইতিহাস। রাজতরঙ্গিণীর বিবরণ থেকে দেখা যায় সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমভূমিতে যখন অব্যবস্থার চূড়ান্ত তখন বৈদিক ও বৌদ্ধমতে জ্ঞানবিজ্ঞানের অনুশীলনের রীতি মগধ-কনৌজ থেকে স্থানান্তরিত হয়েছে অপেক্ষাকৃত সুস্থিত অঞ্চল কাশ্মীরে। বাঙলায় আর গুজরাটে যেমন

কান্যকুব্জের ব্রাহ্মণদের নিয়ে আসা হয়েছিল ঠিক তেমনি কাশ্মীররাজের আমন্ত্রণে কনৌজ থেকে ব্রাহ্মণদের একটি শাখা চলে যায় কাশ্মীরে (1-117, 1-343)। তক্ষশিলার স্থান নিয়েছে শ্রীনগর বিশ্ববিদ্যালয়। সুদূর দাক্ষিণাত্য আর বাঙলা থেকে যেসব ছাত্ররা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসত তাদের সম্বন্ধে কৌতুক-জনক বর্ণনা আছে ক্ষেমেন্দ্র-এর (990-1065 A. D) দেশোপদেশ-এ। মুসলমান আক্রমণে উদ্বাস্তু দেশে কীভাবে কাব্য-নাটক ক্ষতিগ্রস্ত হয় A. B. Keith তার আলোচনা করেছেন ক্ষেমেন্দ্রের রচনার কথা বলতে গিয়ে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে ক্ষেমেন্দ্র প্রাচীন পুস্ত ভাষা* থেকে 100,000 শ্লোকে রচিত কথাসরিৎসাগর প্রথম সংস্কৃতে অনুবাদ করেন।

তবে শ্রীনগরে যে আর্যসংস্কৃতির নবযুগ শুরু হলো উত্তরাপথে তার অবক্ষয়ের যুগে, তা কিন্তু বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। তাতার, মঙ্গোল ইত্যাদির আক্রমণে এখান থেকে তা ছড়িয়ে পড়ে মধ্য এশিয়ায়। কুচ-এ পাওয়া বাওয়ার পাণ্ডু-লিপিতে (1890 সালে কর্ণেল বাওয়ার আবিষ্কৃত) উপমহাদেশে হারিয়ে-যাওয়া বহু পূর্বাচার্যের নাম ও তাঁদের কারো কারো রচনার কথা প্রথম জানা যায়। বুদ্ধচরিত প্রণেতা অশ্বঘোষের কোন নাটকের কথা এদেশে জানা ছিলনা। তার প্রথম সন্ধান মিলল মধ্য এশিয়ায় জার্মান প্রত্নবিদ্‌দের আবিষ্কারে। তালিকা বাড়িয়ে লাভ নেই, তবে এসব নিদর্শন থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে এই অন্ধকারযুগে মধ্য এশিয়ার এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল সংস্কৃত ও প্রাকৃতে রচিত বহু পাণ্ডুলিপি। হয়তো এযুগে যে-মধ্যএশিয়া প্রধানত মরু অঞ্চল তা দেড়হাজার বছর আগে বসবাসের এত অযোগ্য ছিলনা।

রাজতরঙ্গিণীতে অমরনাথের বরফে তৈরি শিবলিঙ্গের কথা আছে যা আরো প্রায় চারশো বছর পরে বার্নিয়ে বরফের স্ট্যালাগমাইট বলে বর্ণনা করেছেন। শেষনাগ হ্রদের জল সাদা লক্ষ্য করা হয়েছে। মালবের রাজা ভোজ (অভিষেক 1018 A.D.) বিজ্ঞানের ও শিল্পের বহুশাখায় বিশেষজ্ঞ বলে বিবেচিত হতেন। সম্ভবত রসমৃগাঙ্ক গ্রন্থটি তাঁর রচনা। তিনি তাঁর রাজ্যে 250 বর্গমাইল বিস্তৃত একটি হ্রদ নির্মাণ করেছিলেন কৃত্রিম বাঁধ দিয়ে।

কাশ্মীরের রাজা তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন কৃত্রিম হ্রদ তৈরি করতে। আচ্ছাবলের কাছে কপটেশ্বরে হ্রদটি এখনো আছে (7-190 to 193)[64]

* পিশাচভাষা।

এ পর্যন্ত যেটুকু নিদর্শন পাওয়া গেছে তা থেকে মনে হয় তিব্বত, নেপাল, খোরিস্তান, হুন্জা উপত্যকা, মঙ্গোলিয়া, চীন ইত্যাদি দেশের জনহীন প্রান্তরে হয়তো আজও বহু বিস্মৃত পুঁথি সংরক্ষিত আছে।

এই অন্ধকার যুগটায় উত্তরভারতে বেদ-বেদান্তের কিছু ভাষ্য, তন্ত্রমন্ত্র ও আধ্যাত্মিক রচনা, জ্যোতিষের নামে কিছু লোক-ঠকানো পরাবিদ্যা (কথটা আল বিরুনির), আলকেমি আর গণিতের গ্রন্থ ছাড়া অন্য কোন বিজ্ঞান, বিশেষ করে কৃষি ও ভূবিদ্যা সম্বন্ধীয় কিছু লেখা হয়েছে বলে মনে হয়না। আবুল ফজল-এর আইন-ই-আকবরীতে এই মধ্যবর্তীকালের কোন বিবরণ পাওয়া যায়না। দুজন ফরাসী পর্যটক, তাভার্নিয়ে ও বার্নিয়ে মুঘল রাজদরবারে এসে বেশ কয়েকবছর করে ছিলেন। তাঁদের বিবরণেও শেষ আচার্য বরাহমিহির। এঁরা প্রায় সমসাময়িক।

ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ে :

1656-1668 সাল, এই সময়টা বার্নিয়ে ছিলেন এদেশে। তাঁর বিবরণে দেশের রাজনৈতিক অবস্থা ও সমাজ ব্যবস্থার বর্ণনা বেশি, ভূবিদ্যা বা অন্য কোন বিজ্ঞানের তেমন উল্লেখ নেই। কিন্তু অ্যারিস্টট্‌লের মতবাদে পুষ্ট বার্নিয়ে বাঙলায় গঙ্গার প্রবাহ ও তার অববাহিকায় সেচ ব্যবস্থা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। বলেছেন, মিশর যেমন নীলনদের সন্তান, বাঙলাও তেমনি বলা যায় গঙ্গার সন্তান।[65] শুধু গঙ্গা নীলনদের চেয়ে আকারে (বিস্তারে) অনেক বড়। তাই গঙ্গার মোহনায় নীলের মোহনার দ্বীপের চেয়ে অনেক বড় বড় দ্বীপ। নীলের দ্বীপগুলি গাছপালাহীন, কিন্তু বাঙলায় চারমাসব্যাপী প্রচুর বর্ষণের ফলে গঙ্গার দ্বীপগুলি গাছপালায় ভর্তি। এই বর্ষার জল নিষ্কাশনের জন্য, আবার কোথাও সেচের কাজে লাগানোর জন্য বহু খাল কাটা আছে (পৃঃ 453)। বস্তুত আগের বিবরণে (পৃঃ 442) এত কৃত্রিম খাল দেখে প্রাকৃতিক নদীপথগুলিকেও অনেক সময় তাঁর কাটা-খাল বলে সন্দেহ হয়েছে। মধ্যযুগে বাঙলা অনেকটাই শান্ত, তাই সুপ্রাচীন জলপ্রণালী (aqueduct) নির্মাণবিদ্যা এখানে এসে আরো উন্নত হয়েছে। বোধহয় দাক্ষিণাত্যের অভ্যন্তরে (বর্তমান কর্ণাটকে) ঠিক একই কারণে মধ্যযুগে নির্মিত বহু জলপথ ও বাঁধে বাঁধা কৃত্রিম হ্রদ পাই।

রাজতরঙ্গীণীতে বর্ণিত কাশ্মীরের হ্রদ থেকে উৎপত্তি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে

বার্নিয়ে ব্যাপারটার সম্ভাব্যতা সমর্থন করে বলেছেন থেসালি (Thessaly)রও তো উৎপত্তি এভাবে! তিনি অমরনাথের গুহা, বহু প্রস্রবণ এবং প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য দেখেছেন আর সেগুলির উৎপত্তি সম্বন্ধে নিজের মতামত রেখেছেন। তাঁর বিবরণে কিছু কিছু মূল্যবান মণিকের কথা আছে। বার্নিয়ের বিবরণ থেকে বোঝা যায় যে তাঁর দেখার অনেক আগেই শ্রীনগর বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস হয়েছে, জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রকৃত অনুশীলনও বন্ধ হয়ে গেছে সেখানে।

বার্নিয়ে অবশ্য নানাভাবে মুঘল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে সোনার প্রাচুর্যের কথা বলে গেছেন, কিন্তু সোনা বা অন্য কোন মূল্যবান মণিকের খনির কথা কোথাও নেই।

তাভার্নিয়া :

জাঁ বাতেস্ত তাভার্নিয়া বার্নিয়ের ঠিক পর পরই ভারতে আসেন এবং দিল্লীর দরবারে কিছুকাল থাকেন। তাঁর বিবরণ প্রকাশিত হয় 1676 খ্রীস্টাব্দে। তিনি দাক্ষিণাত্যে কয়েকটি হীরার খনিতে গিয়ে তাদের কর্মপদ্ধতি পরিদর্শন করেন। পরে মীরজুমলার সৈন্যদলের সঙ্গে আসামের মধ্য দিয়ে ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত যান ও ব্রহ্মদেশের শান উপত্যকায় নীলা ও চুণী সংগ্রহ করার পদ্ধতি লক্ষ্য করেন। তাঁর বিবরণে দাক্ষিণাত্যে, মধ্যপ্রদেশে ও বিহারের নানা-জায়গায় হীরকখনির একটা বিস্তারিত তালিকা পাওয়া যায়। মণিক আহরণ পদ্ধতি বলতে শুধু পাওয়া যায় সম্ভাব্য উৎসে মাটি থেকে মণিক বাছার পদ্ধতি। দক্ষিণাত্যের হীরক সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন এসব জায়গায় জমি বালুকাময়, শিলাবহুল এবং কোথাও কোথাও গহন বন। রামল্লকোটা নামে যে স্থানটির প্রতি তাঁর মনোযোগ সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট হয়েছিল সে স্থানটি ওয়াজরা কারুর (Wazra Karur)-এর কাছাকাছি কোনো জায়গা। জঙ্গলের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে মাটির নীচে প্রধানত বেসল্ট কিংবা আল্ট্রাবেসিক শিলা। বলতে গেলে এখানেই প্রথম kimberlite pipe জাতীয় শিলায় হীরকের অস্তিত্বের নজির আছে। অন্যান্য জায়গায় বালুর মধ্যে প্রকীর্ণকে হীরার অস্তিত্বের কথা বলা হয়েছে। পরবর্তীকালে (উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে) ভ্যালেণ্টাইন বল তাভার্নিয়া বর্ণিত স্থানগুলি চেনার চেষ্টা করেছেন। এর মধ্যে কোনো কোনো জায়গা, যেমন বর্তমান বিহারের পালামৌ অঞ্চলে হীরার অস্তিত্বের কথা বলা হয়েছে। বিভিন্ন উৎসের অবস্থান বিচার করে মনে হয় বহুক্ষেত্রেই হীরকের

প্রতিসরাঙ্কের অনুরূপ প্রতিসরাঙ্ক (refractive index) বিশিষ্ট অন্য কোনো মণিক হীরক বলে বিবেচিত হয়েছে মুঘল যুগেও।

ভ্যালেন্টাইন বল ঃ

গত শতাব্দীতে ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার প্রথমযুগে ওল্ডহাম যখন সমীক্ষার ডিরেক্টার, তখন ভ্যালেন্টাইন বল এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন। ভারতীয় ভূবিদ্যার উপর প্রথম গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের রচয়িতা তিনি। উপমহাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে তিনি ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার সঙ্গে ভারতীয় ভূবিদ্যার বহুকাল ধরে চলে-আসা পদ্ধতিগুলি পুনরুদ্ধারের জন্য বহু চেষ্টা করেন। মধ্যপ্রদেশের পান্নায় ভূগর্ভস্থ হীরার খনি তখনো চালু ছিল। তাঁর আঁকা পেনসিল-স্কেচ থেকে মধ্যযুগে ভূগর্ভস্থ খনিতে কীভাবে কাজ হতো তা অনুমান করা যায়। সুবনসিঁড়ি নদীতে সোনা আহরণ পদ্ধতি তিনিই বার করেন। খাসি পাহাড়ে বর্ষার ঢল নামার খাতগুলি সামান্য সংস্কার করে বিভিন্ন বেঞ্চ-এ কীভাবে লোহার আকরিক সংগ্রহ করা হতো তার বর্ণনা ও স্কেচ রেখে গেছেন বল। দুঃখের বিষয়, বল-সাহেবের উপমহাদেশ সম্বন্ধে সব রচনার কোনো তালিকা কোথাও নেই, রচনাগুলি তো নেইই। কোনো গবেষক এ সম্বন্ধে আগ্রহী হয়ে বৃটিশ মিউজিয়াম, রয়াল সোসাইটি, এসিয়াটিক সোসাইটি ও ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার গ্রন্থাগার ইত্যাদিতে অনুসন্ধান করলে বৃটিশ শাসনের ঠিক আগে প্রযুক্তিগত ভূবিদ্যা সম্বন্ধে অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হবে।

উত্তর ব্রহ্মদেশে চুণী আহরণের যেসব পদ্ধতি গত শতাব্দীতেও চালু ছিল, তার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় তাঁর লেখায়। তিনটি পদ্ধতিতে প্রকীর্ণক থেকে চুণী সমাহরণ (concentrate) করা হতো।

1. টুইনলোন—নদীর উপত্যকায় চুণীবাহী নুড়িস্তর পর্যন্ত খাড়া গর্ত (shaft) খোঁড়া হতো। গর্তের দেওয়াল ধসা বন্ধ করার জন্য তার দেওয়ালে ঠেস দেওয়া হতো সেগুন গাছের গুঁড়ির। যতটা সম্ভব চেষ্টা করা হতো যাতে গর্তগুলিতে জল চুঁইয়ে এসে না জমে। সুবিধা থাকলে আশেপাশে কোথাও জলপ্রণালী (aqueduct) কেটে ভূজল অন্যদিকে সঞ্চারিত করা হতো। তবু খনিতে দিনের কাজ শুরু হতো বালতি বালতি জল তুলে। তারপর তোলাহতো চুণীবাহক নুড়ি। সেও ঐ বালতির সাহায্যে। পাড়াগাঁয়ে যেমন একটি বড় বাঁশ একটি কিলকরূপ (pivot-like) খুঁটির উপর রেখে কুয়ো থেকে জল তোলা

হয়, ঠিক সেইভাবেই নুড়ি তোলা হতো খনি থেকে। তারপর বাঁশের তৈরি চ্যাপ্টা ডালায় ভালো করে ধুয়ে তা থেকে চোখে দেখে বেছে নেওয়া হতো চুণীর টুকরোগুলো। এই ধরনের ভূগর্ভস্থ খনিকে বলা হতো টুইনলোন।

2. মিউডুইন—পাহাড়ের ঢাল-এ যেখানে বহুদূর থেকে জলপ্রণালী কেটে তোড়ে জল সঞ্চালন করা যায়, সেখানে এই পদ্ধতিতে রত্ন সংগৃহীত হতো। পদ্ধতি আর চুণীর উৎস, দুটোকেই এক নামে অভিহিত করা হতো। কাদা বালু ইত্যাদি ধুয়ে বেড়িয়ে যেত, পড়ে থাকত বড় বড় নুড়ি। সেগুলি সংগ্রহ করে তা থেকে সংগ্রহ করা হতো চুণীর দানা। নিশ্চয়ই নুড়িগুলি ভাঙার কোনো বিশেষ পদ্ধতি ছিল, কিন্তু সেসম্বন্ধে কোনো উল্লেখ নেই বল-এর বিবরণে। তবে হাইড্রলিক মাইনিঙ যে প্রচলিত ছিল তা বোঝা যায়।

3. লুডউইন—এগুলি হলো চুনাপাথরে গুহা আর ফাটল। এসব গুহা আর ফাটলের মেঝেতে চুনাপাথর ভূজল ও বৃষ্টির জলে দ্রবীভূত হয়ে অনেক সময় চুণী আল্গা হয়ে জমত। প্রকৃতপক্ষে এগুলি ঠিক খনি নয়।

রাজতরঙ্গিণী সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে যে যে কারণ অনুমান করা হয়েছিল, সম্ভবত সেইসব কারণেই উপমহাদেশ থেকে খনি-প্রযুক্তির অনুশীলন এসে উপস্থিত হয়েছিল ব্রহ্মদেশে, কিন্তু চাহিদার পরিমাণ না বাড়ায় উৎপাদন খুব একটা বাড়াবার দরকার হয়নি। আর সেজন্য এসব প্রযুক্তির পরিশীলনের ফলে উন্নততর প্রযুক্তির উদ্ভব হয়নি। মুঘল আমলে যদি ইওরোপের মতো এদেশে শিল্পবিপ্লব ঘটত, তবে এই প্রাচীন প্রযুক্তিগুলি থেকে নূতন প্রযুক্তি আসত। কিন্তু তার বদলে বৃটিশ আমলে অন্য ধারার প্রযুক্তি এসে প্রাচীন প্রযুক্তিকে উৎখাত করল, আর তাই এদেশী প্রযুক্তিগুলিও ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হলো।

পরিশিষ্ট—ক

গিরীন্দ্রশেখর বসু পৌরাণিক রাজাদের বংশ পারম্পর্য বিস্তারিত আলোচনা করেছেন ও সারণী দিয়েছেন। তিনি ইক্ষাকু বংশকেই প্রমাণ (standard) ধরেছেন, কারণ ইক্ষাকুর রাজাদের ইতিহাস অক্ষুন্নভাবে পাওয়া যায় খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত। যেহেতু বৈবস্বত থেকে শুরু করে এই পরম্পরা অক্ষুণ্ণ, তাই বৈবস্বতকে datum line, বা ক্রমিক সংখ্যা 0 ধরে হিসাব করা হয়েছে। এই বৈবস্বতের আগেও আরো 86টি প্রজন্মের উল্লেখ আছে। নিচে দেওয়া সারণী বসুর দেওয়া বিশদ সারণী ও আলোচনা থেকে সঙ্কলিত হলো শুধু প্রাসঙ্গিকভাবে যেসব রাজাদের উল্লেখ করা হয়েছে তাদের নাম দিয়ে। এ থেকে পরিচিত রাজাদের সমসাময়িকতা লক্ষ্য করা যাবে।

লক্ষ্য করা যেতে পারে যে 181-183 পর্যায়ের ব্যবধান 30 বছর। বৃহদ্বল এবং বৃহৎক্ষণ (ইক্ষাকু) একই কালে পাওয়া যাচ্ছে। ইংলণ্ডের রাজবংশের দিকে তাকালে ব্যাপারটা বোঝা যাবে। সেখানে 1937-38এ একই সঙ্গে অষ্টম এডওয়ার্ড আর ষষ্ঠ জর্জের নাম।

আনুমানিক কাল বার হয়েছে পরিক্ষিতের জন্ম থেকে নন্দাভিষেকের ব্যবধান ধরে।

ক্রমিক সংখ্যা	পর্যায় সংখ্যা	আনুমানিক কাল	ইক্ষাকু বংশ	পুরু বংশ	বৃহদ্রথ বংশ	যদু বংশ
0	87	3814 B.C.	বৈবস্বত			
6	93	3702 ,,	বিশ্বগন্ধ	পুরু		
18	105	3477 ,,	যুবনাশ্ব	মতিনার		
19	106	3458 ,,	মান্ধাতা	ত্রসু		
30	117	3169 ,,	হরিশ্চন্দ্র			
38	125	2958 ,,	সগর			

ক্রামক সংখ্যা	পর্যায় সংখ্যা	আনুমানিক কাল	ইক্ষাকু বংশ	পুরু বংশ	বৃহদ্রথ বংশ	যদু বংশ
39	126	2927 „	অসমঞ্জস			
40	127	2896 „	অংশুমান			
41	128	2864 „	দিলীপ			
42	129	2833 „	ভগীরথ			
61	148	2225 „	রঘু	সুশান্তি		বিদর্ভ ক্রথ রোমপাদ
62	149	2192 „	অজ	পুরুজানু		কুন্তি
63	150	2158 „	দশরথ	চক্ষু		বৃষ্ণি
64	151	2124 „	রাম	হর্যশ্ব		
65	152	2100 „	কুশ	মুদ্গল		দশার্হ
79	164	1817 „	উক্থ	কুরু	কুরু	অনবরত
93	178	1487 „	অমর্ষ	শান্তনু	জরাসন্ধ	আহুক
94	179	1463 „	মহস্বান্	বিচিত্রবীর্য	সহদেব	দেবক
95	180	1440 „	বিশ্রুতবান্	পাণ্ডু	সোমাধি	দেবকী
96	181	1416 „	বৃহদ্বল	অর্জুন	শ্রুতশ্রবা	কৃষ্ণ
97	182	1416 „	বৃহৎক্ষণ	অভিমন্যু	অযুতায়ু	প্রদ্যুম্ন
98	183	1386 „	গুরুক্ষেপ	পরিক্ষিৎ	নিরামিত্র	
99	184	1356 „	বৎস	জন্মেজয়	সুক্ষত্র	

পরিশিষ্ট—খ

বহুকাল ধরে উপমহাদেশে বিভিন্ন ধরনের শিলা ইমারতী শিলা (building stone) রূপে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। নিচে বিভিন্ন শিলায় তৈরি বিখ্যাত ইমারতগুলির একটা তালিকা দেওয়া গেল।

১। মর্মর (Marble): সৌন্দর্যের দিক দিয়ে সর্বাধিক খ্যাতি রাজস্থানের যোধপুর জেলার ম্যাকৃরাণা অঞ্চলের মর্মরের। এই শিলায় তাজমহল ও ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, উত্তরভারতের বহু মন্দির, আগ্রা কেল্লার দেওয়ানি খাস ও দেওয়ানি আম, মোতি মসজিদ তৈরি। এছাড়াও মেঝের টালি (mosaic tiles) রূপে এর ব্যবহার মুঘল যুগ থেকে। বৈচিত্র্য আনার জন্য টালি ও দেওয়ালের মর্মরে লতাপাতা, কিংবা আরবী বয়ান খোদাই করে তা ভরাট করা হতো জ্যাস্পার, জেড্ কিংবা ল্যাপিস ল্যাজুলি দিয়ে। কালো মর্মর (black marble) দিয়ে তাজের অনুকরণে যমুনার অপর পারে সমাধিসৌধ করার পরিকল্পনা ছিল শাহজাহানের।

২। সবুজ মর্মর (green calc-granulite)-প্রধানত ব্যবহৃত হয়েছে মূর্তি নির্মাণে। এর উৎস রাজস্থানে ও মধ্যপ্রদেশের নানা জায়গায়। গোয়ার ভাস্কো ডা গামা ও আলবুকার্কের মূর্তি এই ধরনের শিলায় তৈরি।

৩। সোপস্টোন ও ট্যাল্ক্ সিস্ট—ব্যবহৃত হয়েছে কোণার্ক্-এ রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের মূর্তি নির্মাণে।

৪। গ্রানাইট—বিকানীর, যোধপুর এবং মেবারের রাজপ্রাসাদ নির্মাণে ব্যবহৃত হয়েছে। এগুলি গোলাপী, সাদা অথবা ধূসর বর্ণের। উৎস রাজস্থানের বিভিন্ন অঞ্চলে।

৫। বেলেপাথর—শক্ত বিন্ধ্যসজ্জের বেলেপাথর ব্যবহৃত হয়েছে সারনাথের সাঁচী স্তূপে, বারহূতে, ফতেপুরসিক্রীতে, আগ্রাকেল্লা ও লালকেল্লায়,

চুণার ও রোটাস কেল্লায়, দিল্লীর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারিয়েটে, রাষ্ট্রপতিভবনে, কলকাতার আকাশবাণী ভবনে ও কাস্টম্‌স্‌ হাউসে। নরম ল্যাটেরিটিক বেলেপাথর ব্যবহৃত হয়েছে পুরী ও ভুবনেশ্বরের মন্দিরে। সোনালি রঙের দানাদার বেলেপাথর ব্যবহৃত হয়েছে জয়শলমীরের রাজপ্রাসাদ ও কেল্লায়। Golden oolite নামে পরিচিত এই শিলাটি সত্যজিৎ রায়ের সোনার কেল্লার শিলা।

৬। ল্যাটেরাইট—বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, বীরভূম ও বর্ধমানের বেশ ক-টি মন্দির এই শিলায় তৈরি। ভারতের পূর্ব উপকূল বরাবর সাত-আট শতাব্দীর প্রাচীন মন্দির এখনো আছে। পশ্চিমঘাট পর্বতমালাতেও ল্যাটেরাইট আছে। শিবাজীর দুর্গ বলে যে দুর্গগুলি পরিচিত তার অধিকাংশই তৈরি এই ল্যাটেরাইটে। গোয়ার আগুয়াডা কেল্লা স্থানীয় ল্যাটেরাইটে নির্মিত।

৭। ট্র্যাকাইট—এটি একটি মিহিদানার আগ্নেয়শিলা। বম্বের কাছে সাল্‌সেটি দ্বীপ এর প্রধান উৎস। বম্বের গেটওয়ে অব ইণ্ডিয়ার পুরোটাই ট্র্যাকাইটে তৈরি।

৮। খোণ্ডালাইট—এটি একটি রূপান্তরিত শিলা। কোণার্কের মন্দিরের প্রধান অংশ এই শিলায় তৈরি। এটি ব্যবহৃত হয়েছে পুরীর মন্দিরেও।

৯। চার্ণকাইট—এটি একটি তত্ত্বীয়—সমস্যামূলক শিলা। এতে আগ্নেয় ও রূপান্তরিত, দু'ধরণের শিলারই গুণগুলি বর্তমান। কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা জব চার্ণকের সমাধিবেদিতে এটি ব্যবহৃত হয়েছিল বলে শিলাটার নাম দেওয়া হয় চার্ণকাইট। মহাবলীপুরমের প্যাগোডা, মাদুরা ও রামেশ্বরমের মন্দির এই শিলায় তৈরি।

১০। বেসল্ট—দাক্ষিণাত্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বেসল্টের উদ্ভেদ। ইলোরা, এলিফ্যাণ্টা ইত্যাদি গুহামন্দিরগুলি এই বেসল্ট শিলায় খোদিত।

ইমারতী শিলা ছাড়াও দরজার কাঠামো তৈরিতে শিলার ব্যবহার ছিল। গ্রানাইট ও গ্রানাইট গ্নাইস শিলা প্রধানত ব্যবহৃত হয়েছে

এজন্য। ঘরে ব্র্যাকেট, দেওয়ালে গাঁথা তাক, আলনা ইত্যাদি তৈরি হতো সোপস্টোনে।

ঘরের ছাদ ছাইতে ব্যবহৃত হতো হাল্কা অথচ শক্ত পাথর, যা সহজে পাতলা টুকরোয় ভাঙা যায়। ফিলাইট ও শ্লেট এখনো প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয় হিমাচল প্রদেশে, উত্তরপ্রদেশের উত্তরাঞ্চলে উত্তরকাশী, চামৌলি, গাড়োয়াল ও আলমোড়া জেলায়।

হিমাচল প্রদেশে ও উপহিমালয় অঞ্চলে সবচেয়ে সস্তার ইমারতীশিলা এই ফিলাইট ও শ্লেট। কাদায় এসব শিলার টুকরো গেঁথে দেওয়াল তোলা হয়। ছাদ তৈরী হয় কাঠের কাঠামোর উপর শিলার টুকরো বসিয়ে। ভারতের আরো অনেক জায়গায় যেখানেই এই শিলা দুটি আছে সেখানেই সাধারণ মানুষের ঘরবাড়ী তৈরি করতে এই শিলার ব্যবহার। কাছাকাছি এসব শিলা থাকতেও সিন্ধু অববাহিকায় প্রধানত ইটের ব্যবহার এযুগের মানুষকে বিস্মিত করে।

পরিশিষ্ট—গ

ভ্যালেন্টাইন বল তাভার্নিয়ার বিবরণ অনুযায়ী হীরকের উৎসগুলি খুঁজে বার করার চেষ্টা করেন। তাঁর নির্ধারিত উৎসগুলি এখানে দেওয়া হলো।

মাদ্রাজ প্রদেশ

কাডাপা জেলা

চেনার (পেনার নদীর তীরবর্তী)—14°34´ উঃ, 78°51´30´´ পূঃ।

কোণ্ডাপেট্টা (বা কামপর্তি)—চেনারের বিপরীত দিকে।

গণ্ডিকোট (?)—বিভিন্ন লেখকের বর্ণনায়—14°49´ উঃ, 78°20´30´´ পূঃ।

গুরাপুর (?)—চেনারের নিকটবর্তী—চেনা যায়নি।

গুলাগুণ্টা—জাম্মালমাড়ুগুর নিকটবর্তী—14°51´ই: উঃ, 78°26´ পূঃ।

লাণ্ডুর (?)—চেনা যায়নি।

ওব্‌লাম্পুলি—14°34´ উঃ, 78°26´ পূঃ।

পিঙ্কেন্দাপাড়ু—চেনা যায়নি।

বেলারি জেলা

গুঞ্জিগোণ্টা—ভাজ্‌রা কারুর—এর 2 মাইল দক্ষিণে।

গুটিদ্রুগ্—15°7´ উঃ, 77°42´ পূঃ।

ভাজ্‌রা কারুর—15°2´ উঃ, 77°27´ পূঃ।

কার্নুল জেলা

বঙ্গনপল্লে—15°18´ উঃ, 78°16´ পূঃ, কার্নুল শহরের 37 মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে।

বান্নুর—গুড়িপণ্ড্‌-এর কাছাকাছি, নান্দি কোট্‌কূড়-এ।

বাসোয়ারপুর—নাল্লামালাই পাহাড়ে, প্রকীর্ণক, 15°25´ উঃ, 78°43´30´´ পূঃ।

বায়ানপল্লে—15°32´ উঃ, 78°14´15´´ পূঃ, কার্নুল 24 মাইল দক্ষিণ-দক্ষিণ পূর্বে।

কুমরোলি—নান্দিয়াল তালুক।

দেওমিডু—15°49′30″ উঃ, 78°11′ পূঃ, তুঙ্গভদ্রার বামতীরে।

দেবনুর—15°44′ উঃ, 78°19′ পূঃ, নান্দিকোট কুর্ তালুকে বুন্দুর নদীর উভয়তীরে।

ধোন—15°23′30″ উঃ, 77°56′ পূঃ।

গুরানকোণ্ডা—15°32′ উঃ, 78°14′15″ পূঃ, কার্নুলের 24 মাইল দদ পূর্বে, শিলাদেহে উৎস।

গুড়িপণ্ড্—দেবানুরের 2 মাইল পশ্চিমে নান্দিকোট্কুর তালুকে।

হাসানাপুর—চেনা যায়নি।

জোরাপুর—সেচের প্রণালীতে নুড়ির মধ্যে 44 ক্যারাটের হীরক পাওয়া গিয়েছিল।

কান্নামুদাকালু—15°42′ উঃ, 78°14′30″ পূঃ।

লাজাপোলেউর—15° 45′ 30″ উঃ, 78′ 4′ পূঃ, কার্নুলের 7 মাইল দদ পশ্চিমে।

মুদ্দাভরম্—15°9′30″ উঃ, 78°30′ পূঃ, রামালকোটার 7 মাইল পূর্ব-দক্ষিণ-পূর্বে।

মুণিমাডুগু—15°15′ উঃ, 78°2′10″ উঃ।

মুরাভানকোণ্ডা—16°1′ উঃ, 78°19′ পূঃ, কৃষ্ণা নদীর উপর।

ওম্ভাকল (বা ভোরাইকল)—15°41′ উঃ, 78°14′ পূঃ, কার্নুলের 14 মাইল দক্ষিণ পূর্বে।

পঞ্চলিঙ্গল—তুঙ্গভদ্রার বাম তীরে।

পেণ্ডাকাল্লু—রামুলকোটার 5 মাইল দক্ষিণ পূর্বে।

পোলুর—15°31′30″ উঃ, 78°19′ পূঃ, নান্দিয়ালের 4 মাইল উত্তরপশ্চিমে।

রামলকোটা—15°34′ উঃ, 78°3′15″ পূঃ, পললে ও শিলাদেহে।

সৈতাকোটা—তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণতীরে।

তাম্ব্রাপাড়—15°51′ উঃ, 78°71′ পূঃ, তুঙ্গভদ্রার বামতীরে।

টিমাপুরম্—15°32′30″ উঃ, 78°6′30″ পূঃ, রামালকোটার 6 মাইল পূর্ব-দক্ষিণ পূর্বে, শিলাদেহে।

ইয়েম্বিয়া—15°32′ উঃ, 78°14′15″ পূঃ, কার্নুলের 24 মাইল পূদ পূর্বে।

কৃষ্ণা ও গোদাবরী জেলা

আট্‌কুর—16°38′ উঃ, 80°23′30″ পূঃ।

বারথেনিপাডু—16°38′ উঃ, 80°23′30″ পূঃ।

ভদ্রাচলম্‌—গোদাবরীতারে।

কোদাভাটাকুল্লু—16°40′ উঃ, 80°23′30″ পূঃ।

কোল্লুর—16°42′30″ উঃ, 80°5′ পূঃ, কৃষ্ণানদীর দক্ষিণ তীরে।

মাদাগালু—পালনাদ তালুকে।

মলন্দরম্‌—16°25′3″ উঃ, 79°30′ পূঃ।

মুনালুর (বা মুগালুর)—16°38′ উঃ, 80°23′20″ পূঃ।

উস্তাপুল্লি—16°40′ উঃ, 80°23′30″ পূঃ।

পর্তিয়াল—16°39′ উঃ, 80°27′ পূঃ।

মধ্যপ্রদেশ

সম্বলপুর জেলা—মহানদীর উপর সম্বলপুর শহর।

চন্দা জেলা—আইন-ই-আকবরীর বেইরাগড়।

বঙ্গদেশ

লোহারডগা জেলা

শাঁখ নদী—ব্রাহ্মনী নদীর উপনদী।

পেনা—কোয়েল নদীর উপর।

এছাড়া আছে বুন্দেখণ্ড্‌-এ, পান্না, ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশে সিমলা।

বল-সাহেবের সময়ের মাদ্রাজ প্রদেশ এখনকার তামিলনাদ, অন্ধ্র ও কর্ণাটকের অন্তর্গত, বঙ্গদেশ এখনকার বিহার, পশ্চিমবঙ্গ আর বাঙলাদেশ নিয়ে, মধ্যপ্রদেশ এযুগের মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রের কিছুটা নিয়ে। এই তালিকায় পান্নার অন্তর্গত হীরকের উৎস খুব একটা প্রাধান্য পায়নি। শিলাপরীক্ষায় ভাজ্‌রা কারুরের কালো ক্ষারীয় শিলাকে হীরক ধারণের উপযুক্ত কিম্বারলাইট শিলার অনুরূপ বলে চেনা গেছে। অন্য অঞ্চলগুলিতে অনুরূপ শিলা অন্বেষণ করা যেতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জী

বিষ্ণুপুরাণ, বায়ুপুরাণ, মনুসংহিতা, শারদসংহিতা ইত্যাদি গ্রন্থগুলির কোনো বিশেষ সংস্করণে তথ্যানুসন্ধান সীমাবদ্ধ রাখা যায়নি। প্রয়োজনের সময় কখনো মূল সংস্কৃতে, অথবা হিন্দি, বাঙলা ও ইংরাজি ভাষ্যসহ বিভিন্ন সংস্করণ পাওয়া গেছে। তাই সেইসব গ্রন্থগুলির অধ্যায় ও শ্লোকের সংখ্যা আলোচনার সময় দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য যেসব রচনার উল্লেখ আছে বর্তমান আলোচনায় সেগুলির তালিকা নিচে দেওয়া হলো।

1. Woodford, A. O., 1965, Historical Geology ; W. H. Freeman and Co., San Francisco.
2. Butzer, K. W., 1977, Environment, Culture and Human Evolution ; Am. Scientist, 65, p. 572-584.
3. বন্দ্যোপাধ্যায় রাখালদাস, 1923, বাঙলার ইতিহাস, কলকাতা।
4. Bowen, D, Q., 1978, Quaternary Geology ; Pergamon Press, London.
5. Rankama, K., 1967, The Geologic systems ; The Quarernary, Vol. 1 & 2 ; Interscience Publishers. London.
6. সুর অতুলচন্দ্র, 1980, সিন্ধুসভ্যতার স্বরূপ ও অবদান, জিজ্ঞাসা, কলকাতা।
7. Mookerji, R. K., 1936, Hindu Civilization from the earliest time to the establishment of the Maurya Empire ; Longmans, Green & Co., London.
8. Piggot., S., 1946, Prehistoric India ; Penguin Books Ltd., Middlesex.
9. Wheeler, M., 1962, History of India (Suppl. Volume), Indus Civilization ; Cambridge Univ. Press

10. Mookerji, R. K., 1963, Hindu Civilization, pt. 1.; Bharatiya Vidya Bhavan.

11. ঘোষ প্রফুল্লচন্দ্র, 1956, প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস ; সিগনেট প্রেস, কলকাতা।

12. Bhargava, O. N., 1963, Indian Minerals, Vol. 17.

13. Bhattacharya, S., 1972, A Dictionary of Indian History ; Calcutta University, Calcutta.

14. Mc Crindle. J. W., 1888, Ancient India as described by Megasthenes ; Education society, Bombay.

15. Ball, V., 1881, Manual of Geology, Vol. I., Economic Geology ; Govt. of India, Calcutta.

16. Gansser, A., 1964, Geology of the Himalayas ; Interscience, London.

17. Rápson, E. J., 1953, Cambridge History of India, Vol. I., Ancient India ; S. Chand & Co., Delhi.

18. Kosambi, D., 1956, An Introduction to the study of Indian History ; Popular Book Depot, Bombay.

19. Shamsastry, R., Kautilya Arthasastra ; Mysore Printing and Publication House, Mysore (1960).

20. Joshi, P. P., 1948, Varahamihira, Vikram Volume ; Ujjain.

21. Law, B. C., 1968, Historical Geography of Ancient India ; Societe Asiatique de Paris.

22. Adams, F. D., 1954, Birth and development of Geological Sciences ; Dover Publications, New York (1954).

23. The Vrihatsamhita by Varahamihira with Commentary by Bhattotpala (Sanskrit)—ed., Dvivedi, S., 1895 ; E. J. Lazarus & Co., Baneras.

24. Chatterjee, S. K., 1968, India and Ethiopia from the Seventh Century B. C., The Asiatic Society Monograph Series, Vol. XV, Calcutta.

25. Nowsherani, A. R., 1977, Al-Biruni's contribution to Natural Sciences ; Studies in History of Medicine, Vol. I., No. 3.

26. Ray, P., 1956, History of Chemistry in Ancient and Mediaval India ; Indian Chemical Society, Calcutta.

27. The Ain-i-Akbari by Abu L-Fazl Allami, ed. & tr., Bolchman, H., 1927, Asiatic Society of Bengal, Calcutta.

28. Tavernier Jean Baptiste, 1676, Travels in India, ed & tr., V. Ball, 1889 ; Macmillan and Co., London.

29. Brown Coggin, J., & Dey, A. K, 1955, India's Mineral Wealth ; Oxford University Press, Calcutta.

30. Henderson, E. P., 1978, 'Meteorites' in Mc Graw Hills Encyclopedia of Geological Sciences.

31. The Note Books of Leonardo da Vinci, tr. Edward MacCurdy ; Modern Library, New York (1957).

32. সরকার সুধীরচন্দ্র, 1982, পৌরাণিক অভিধান ; এম. সি. সরকার, কলকাতা।

33. Shakley, M., 1977, Rocks and Man ; George Allen and Unwin, London.

34. Brown, P., Indian Architecture, Vol. I. ; D. B. Taraporevala & Co. (P) Ltd., Bombay (1956)

35. Wilson, H. H., 1946, Rig-Veda Samhita, Vol. I.; Bangalore.

36. Dumas, M., 1969, A History of Technology and Invention, tr. E. B. Henessy, Vol. I., The Tulsi Shah Enterprises, Bombay.

37. Majumdar, R. C., 1952, The History and Culture of the Indian People, Vol. I. ; George Allen and Unwin Ltd., London.

38. Acharyya, P. K., 1933. Architecture of Mansara ; Oxford University Press, Calcutta.

39. Basu, N. K., 1932, Canons of Orissan Architecture ; R. Chatterjee, Calcutta.

40. Biswas, A. K., 1970, History of Hydrology ; North Holland Publishing Co.. London.

41. ঋগ্বেদ সংহিতা, পরিতোষ ঠাকুর সম্পাদিত ; হরফ, কলকাতা।

42. Kosambi, D., 1956, An Introduction to the Study of Indian History ; Popular Book Depot, Bombay.

43. Lahiri, D., 1970, Dynamic Geology in Prehistoric India and Vedic Literature ; Ind. Jour. His. Sc., Vol. 5., No. 1., p. 188-196.

44. Marshall, J., 1931, Mohenjo-Daro and Indus Civilization, Vol. I. ; Arthur Probsthan, London.

45. Mackay, R. C., 1948, Early Indus Civilization ; Luzac & Co., London.

46. Marshall, J., 1951, Taxila, Vol. I. ; Cambridge University Press.

47. বসু গিরীন্দ্রশেখর, 1934, পুরাণ প্রবেশ ; এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স, কলকাতা।

48. Lyell, C., 1875, Principles of Geology, Vol. I. ; James Murray, London.

49. কপিলাশ্রমী পাতঞ্জল যোগদর্শন, সম্পাদনা শ্রীমদ্ ধর্মমেঘ আরণ্য ও যজ্ঞেশ্বর ঘোষ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (1938)।

50. ভাবপ্রকাশ।

51. তত্রাস্থর।

52. Cohen, J. M., and Hannah, S. A., 1971, Coagulation and Flocculation, p. 66-122, in *Water Quality and Treatment*, American Water Works Assocn., Inc., New York.

53. Prasad, E. A. V., 1980. Groundwater in Varahamihira's Brihat Samhita, Tirupati.

54. সিংহ লক্ষ্মীশ্বর, 1975, বৃক্ষরোপণ উৎসব ও 61টি বৃক্ষের পরিচয়, কলকাতা।

55. রামায়ণ, অনুবাদক হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য (1869-84), ভারবি, কলকাতা (1975)

56. Digha Nikaya, ed., Davids, T. W. R., and Carpenter, G. E., 3 Vols., translated as Dialogues of Buddha by Davids, T. W. R., Oxford, 1899-1921.

57. Marshak, A., 1960, The World in Space, Dell, New York.

58. Tripathy, M. P., Development of Geographic knowledge in Ancient India 1969 ; Bharatiya Vidya Prakashani, Varanasi.

59. থাপর রোমিলা, ভারতবর্ষের ইতিহাস : অনুবাদিকা কৃষ্ণা গুপ্ত ; ওরিয়েন্ট লঙম্যান, কলকাতা (1985)।

60. Satapath Brahman, tr. Eggeling, 5., S. B. E., Oxford, 1892-1900.

61. Thibaut, G., Mathematics in the making in Ancient India. ed. D. P. Chattopadhyaya ; K. P. Bagchi, Calcutta.

62. Edwardes, M , 1969, Everyday Life in Early India ; B. T. Batsford Ltd., London.

63. Albiruni's India, ed., and N,. Edwin Sachau, Kegan Paul, Trench, Trübner & Co. Ltd., London, 1910.

64. Kalhan's Rajtarangini, tr. R. S. Pandit, Sahitya Akademi, New Delhi, Original Edition, 1935.

65. Bernier, F., Travels in Moghul Empire, tr. Irving Brock, ed., Constable A.. 1891.

শব্দপঞ্জি

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	লাইন	যা আছে	যা হবে
15	19	আন্তর্হিমযুগ	আন্তর্হিমযুগ
16	18	চিহ্নিত করা ষাবে	চিহ্নিত করা যাবে
25	21	যে অংশ	যে অংশ
37	4	(যেমন সোনা)।[72]	(যেমন সোনা)।[27]
	20	যেটি বর্তমান পালামৌ	যেটি বর্তমান পালামৌ
38	11	ততদিনে যাযাবর	ততদিনে যাযাবর
54	18	শুকিয়ে চাল মাড়াইয়ের	শুকিয়ে ধান মাড়াইয়ের
55	5	তাই অভিষানটি	তাই অভিযানটি
	25	ভরাট করা হতো। নীল রঙের···	ভরাট করা হতো নীল রঙের···
58	14	পৃষ্ঠা 91-92	পৃষ্ঠা 91-92
61	পাদটীকা লাইন 3	মহাবৃেত্ত	মহাবৃত্ত
88	23	(···হাওড়ার মতো নয়),	(···হাওড়ার মতো) নয়,
90	24	(=480 ft)	(=450 ft)
94	8	দ্বিতীয় অধ্যায়ে	প্রথম অধ্যায়ে
	শেষ লাইন	হিমালরে পাদদেশে	হিমালয়ের পাদদেশে
97	25	ষারা ধেকে গিয়েছিল	যারা থেকে গিয়েছিল
99	পাদটীকা	Nationol Service	National Service
101	22	(transtitional)	(transitional)
105	11	খ্রীস্টপূর্ব	খ্রীষ্টপূর্ব
108	3	ব্রাক্ষণ	ব্রাহ্মণ
112	23	উজ্জয়িনীর	উজ্জয়িনীর
113	5	উর্জ্জয়িনী	উজ্জয়িনী
113	7	দ্রাঘিমারেথা	দ্রাঘিমারেখা

পৃষ্ঠা	লাইন	যা আছে	যা হবে
114	3	গান্ধার	কান্দাহার
115	1	ব্রাক্ষণদের	ব্রাহ্মণদের
	2	"	"
118	19	তিনটি পদ্ধিতিতে	তিনটি পদ্ধতিতে
128	1	শারদসংহিতা	নারদসংহিতা
"	5 নং গ্রন্থ	The Quarernary	The Quaternary

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ প্রকাশিত
বিজ্ঞান পুস্তিকা

১। সমুদ্র পরিচয়/প্রসাদ সেনগুপ্ত/৮·০০
২। পেশাগত ব্যাধি/শ্রীকুমার রায়/৭.০০
৩। আমাদের দৃষ্টিতে গণিত/প্রদীপকুমার মজুমদার/৭·০০
৪। শক্তি : বিভিন্ন উৎস/অমিতাভ রায়/৭·০০
৫। ঘরে করো শিল্প গড়ো/তিলক বন্দ্যোপাধ্যায়/১১·০০
৬। বয়ঃসন্ধি/বাসুদেব দত্ত চৌধুরী/৯·০০
৭। ভূতাত্ত্বিকের চোখে বিশ্বপ্রকৃতি/সংকর্ষণ রায়/৮·০০
৮। রোগ ও তার প্রতিষেধ/সুখময় ভট্টাচার্য/৬·০০
৯। পশুপাখীর আচার ব্যবহার/জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়/৮·০০
১০। ময়লা জল পরিশোধন ও পুনর্ব্যবহার/ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ, ৬·০০
১১। গ্রাম পুনর্গঠনে প্রযুক্তি/দুর্গা বসু/১০·০০
১২। একশো তিনটি মৌলিক পদার্থ/কানাইলাল মুখোপাধ্যায়/১০·০০
১৩। পরিবর্তী প্রবাহ/ডঃসমীরকুমার ঘোষ/৭·০০
১৪। বাস্তব সংখ্যা ও সংহীততত্ত্ব/প্রদীপকুমার মজুমদার/১০·০০
১৫। অতিশৈত্যের কথা/দিলীপকুমার চক্রবর্তী/৭·০০
১৬। এফিড বা জাবপোকা/মনোজরঞ্জন ঘোষ/১২·০০
১৭। সয়াবীন/দ্বিজেন গুহবক্সী/৯ ০০
১৮। জৈবসার ও কৃষিবিজ্ঞানে জীবাণুর অবদান/শ্যামল বণিক/১২·০০
১৯। পাতালের ঐশ্বর্য/সংকর্ষণ রায়/১০·০০
২০। নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র/সুশীল ঘোষ/১২·০০
২১। আমাদের জীবনে পাখী/সুধীন সেনগুপ্ত/১৪ ০০
২২। জিওল মাছ/শচীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়/১২·০০
২৩। আবহাওয়া ও আমরা/অপরাজিত বসু/১০·০০

এগারো টাকা